কোপাই নদীর মেয়ে

(উপন্যাস)

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্"

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, বি. এল

স্বত্বাধিকারী ঃ

প্রেমবিকাশ ঘোষ
৫৫বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৬

প্রকাশক ঃ

মনোতোষ ঘোষ
৫৫বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর ঃ

দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, জগবন্ধু মোদক রোড,
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

সেফালী-বসু মল্লিক

*

পরিবেশক ঃ

শ্রীহরিদাস ঘোষ
৪০।১, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫ ।

বাঁধাই ঃ

ইউনাইটেড বুক বাইণ্ডার
২৯, গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৫

প্রথম মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৬৬

মূল্য—পাঁচ টাকা

স্বর্গত পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত হইল।

লেখকের নিবেদন

কী লিখিব আর কী না লিখিব এই ভাবিয়া লেখনী হাতে লইয়া মনের কথা প্রকাশ করিবার সুসাধ্য শক্তি আমার নাই; তাই এই বিরহ-মিলন-বিয়োগ-বিচ্ছেদ-করুণ-মধুর-তিক্ত রসসংস্পৃষ্ট উপন্যাসখানির মধ্যে অনেক কিছু আজগুবি বস্তুর ও ভুতুড়ে কাহিনীর অলীক রোমাঞ্চের সন্ধান পাইতে পারেন; এবং তাহাতে পাঠকবর্গ বিচলিত ও রুষ্ট হইলে লেখনীর উপরই দোষারোপ করা সমীচীন হইবে আশা করি, কেননা লেখক স্বপ্নবিলাসী। অবশ্য দেখা যায়, লেখক প্রায় সময়ই তাহার নিজের জীবনালেখ্যটিকেই আঁকিয়া যান। আবার এটিও লক্ষ্য করা যায় সময় সময় তাহাকে দস্তুরমতো অভিনয় করিয়াও যাইতে হয়; তখন লেখক আর লেখক নয়, তখন তিনি একজন অভিনেতা, তাই তাঁর রচনার মধ্য দিয়া অনেক সময় উন্মাদগ্রস্তের উন্মত্ততা প্রকট হইয়া উঠে; তাই এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা উন্মাদের মতো অনেক কিছু তত্ত্বের ফাঁনুস তৈয়ারী করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; জানি না কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটাই বা পরিত্যজ্য।

কোপাই নদীর মেয়ে

এক

সিউড়ি হইতে বাসটা ছাড়িল বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায়। চলিয়াছে বক্রেশ্বরের পথে। সূর্যগ্রহণ আর চূড়ামণিযোগ উভয়ের একত্র সংযোগ ঠিক একই দিনে; তাই পুণ্যসঞ্চয়ীদের ভিড়ের চাপে বাসখানা যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে বলিলেই হয়। বিনা-টিকিটে নয় মাইলের মাসুল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী পিছু মাত্র এক টাকা,—এমন একটা কিছু বেশী ভাড়া নয় কেন না প্রয়োজনের তাগিদে অন্যায্যও ন্যায্য হইয়া দাঁড়ায়। তা ছাড়া যাত্রীদের সংখ্যা ও বড় একটা কম নয়। তারপর আর একটা কথা এই, যাত্রীদের তরফ হইতে এই ভাড়ার হার লইয়া কোন দিন কেহই সরকারের নিকট আপত্তিও জানায় নাই। সুতরাং, ব্যাপারটা বহুদিন হইতেই ঐ-ভাবেই বিনা প্রতিবাদেই চলিয়া আসিতেছে।

ভিড়ের চাপ বুঝিয়া পুষ্কর প্রথম সুযোগেই ড্রাইভারের ঠিক পাশেই একটা ফার্ষ্ট ক্লাসের সিট দখল করিয়া বসিয়া আছে।

হু হু শব্দে বাস ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে থামিতেছে আবার চলিতেছে, যেন থামিবারও বিরাম নাই, চলিবারও বিরাম নাই। কোথাও যাত্রী উঠিতেছে, কোথাও বা নামিতেছে। কেহ বা যাইতেছে একাকী আবার কেহ বা সপরিবারে, অথবা সবান্ধবে উঠিতেছে নামিতেছে; এই আরোহণ অবতরণের যেন নিবৃত্তি নাই। মানুষও চলিয়াছে, পশুও চলিয়াছে,—সে এক বিচিত্র ব্যাপার; একে ত মানুষের দাঁড়াইবার স্থান নাই তার উপর আবার ছাগল ও ভেড়ার উৎপাত। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কেননা করিলে কেইবা কাহার কথা শুনে। শুধু তাহাই নয় প্রতিবাদ না করিয়া করিয়া অন্যায় ও অবিচারকে হাসিমুখে নির্জীবের মতো, অমানুষের মত, সহ্য করিয়া যাইবার বা প্রশ্রয় দিবার সেই হীন প্রবৃত্তিটা জাতির মজ্জায় মজ্জায় শোণিতে শোণিতে এমনইভাবে জড়িত হইয়া আছে যে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সে

শক্তিটুকু যাত্রীদের মধ্যে কাহারও নাই। তাই পরস্পরের সুখ-সুবিধার প্রতি সচেতন হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার বা সমষ্টিগত ভাবে চিন্তা করিবার সে আগ্রহ বা স্পৃহাটুকুও নাই। এক দিকে আরোহিগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপর দিকে যান-স্বত্বাধিকারীর অর্থলোলুপতা।

তবুও ঘোর আপত্তি উঠিল, তর্ক বাধিল ; এমন কী কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ডাক্টরের সহিত দুই-একজন নির্ভীক যাত্রীর কথা কাটাকাটিও চলিল। কিন্তু তাহাতে ফল হইল কী ? ছাই ! ছাগলের ম্যা ম্যা চীৎকারে বাসসুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

পুষ্কর সব কিছু শুনিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

পুষ্করের সর্বাঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে ; এমন রোমাঞ্চকর পরিক্রমা আজ তাহার জীবনে এই প্রথম। প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণকায় সরীসৃপের মতো পিচমোড়া আঁকা-বাঁকা সরণী অতিক্রম করিয়া বাস ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের দুই দিকের সে দৃশ্যসম্ভার কী মধুর কী মনোরম কী চিত্তাকর্ষক, যেদিকে চক্ষু যায় সে দিকেই যেন মনটা ছুটিয়া যায়,—নিবিড় অরণ্য, অনন্ত আকাশ, হিল্লোলিত বাতাস, উত্তাপমধুর রৌদ্র ছায়ার আনন্দোচ্ছ্বাস, দূরে বহুদূরে কোথাও সন্নিবিশিষ্ট শালবন, কোথাও সারিবদ্ধ আম্রকানন, কোথাও অসংখ্য ঝুরিনামা মহাস্থবির ধ্যানগম্ভীর বটবৃক্ষের প্রশান্ত কুঞ্জছায়া, কোথাও বা শিরীষ তেঁতুলের অগভীর কানন, কোথাও বা ইক্ষুবনের সীমান্ত বেষ্টন করিয়া শুভ্রকিরীট শরবন, রাঙামাটির তৃণহীন তরুবিরল অনন্তবিস্তৃত দীর্ণ বিদীর্ণ প্রান্তরাথাও ব, কো অলসচেতন উচ্চশির তালবন, কোথায় বা আনমিত বেনুকুঞ্জের কোল ঘেঁসিয়া শস্যভারে শুইয়া পড়া ধানের ক্ষেত, কোথাও সুদূর বনানীর বুকে নিভৃত পল্লীর শ্যামচ্ছায়া। কোথাও মাটির রঙ গৈরিক, কোথাও বা পাংশুল, কোনটার বা মূর্তি কঠিন, কোনটার বা কোমল, কোনটার বা রুক্ষমধুর।

কখনো বা ছত্রভঙ্গ হইয়া কখনো বা দলে দলে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা চলিয়াছে সেই মহাপীঠস্থানে অবগাহনের উদ্দেশে পুণ্য সঞ্চয়ের অভিলাষে। মুখে তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহের হাসি। যুবক যুবতীর দল কেহ বা যায় পদব্রজে কেহ বা যায় সাইকেল রিক্সায়। তরুণ ও প্রবীনের মধ্যে কেহ কেহ আবার যায় দ্বিচক্রযান চালাইয়া ; দূর দূর বহুদূর গ্রাম হইতে যাহারা আসিতেছে তাহারা চলিয়াছে ছই-দেওয়া গো-যানে আরোহণ করিয়া।

বাস চলিয়াছে কখনো মন্থরগতিতে কখনো বা দুরন্ত বেগে। অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পুরুষের পিছনের মহিলাদিগের বসিবার সিট হইতে যে বারো তের বছর বয়সের ছেলেটি কিছুক্ষণ পূর্বে বিপুল আবেগের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, ঐ দ্যাখরে দিদি, ঐ দ্যাখ ঐ যে দেখা যায় জঙ্গলটা ঠিক যেন ছিনপাইয়ের জঙ্গলটার মতো ; ঐ দ্যাখ দিদি শালবন, ঐ দ্যাখ কতকগুলা বক কেমন উড়ে যায় ; সেই ছেলেটি আবার গভীর উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল, ঐ দ্যাখ দিদি, ঐ যে দেখা যায় তাঁতীপাড়া, আমরা এসে গেছি। দিদি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল তুই দেখছি এখানকার সব কিছুই জানিস সজল।

সজল হাসিয়া বলিল, তা জানবো না কেন, আমি ত দু'বার এসেছি এখানে।

—হ্যাঁ তাও ত বটে তুই এদিকে এর আগে এসেছিলি। মন্দির আর কত দূর রে ?

—এইত এসে গেছি। বেশী দূর নয় আর একটু গেলে, বাসটা বাঁ দিকে ঘুরবে এবার......ঐ দ্যাখ দিদি ওটা হল স্কুলের ছেলেদের বোর্ডিং, বলিয়া টিনের ছাদ দেওয়া ইটের দেওয়াল গাঁথা একটা বাড়ীর দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিল, খুব বড় স্কুল। তাঁতীপাড়া হাইস্কুল, বুঝলি দিদি।

—বাবা, তুই এ সব এত জানিস্।

—আমি যে দুবার এদিকে এসেছি বল্লুম।

দেখিতে দেখিতে কতকটা কাঁচাপথ অতিক্রম করিয়া, ধূলা উড়াইতে উড়াইতে বাসটা একটা প্রাচীন অশ্বত্থগাছের নিচে আসিয়া থামিয়া গেল। অদূরে বক্রেশ্বরের মন্দির।

সজল তড়াক করিয়া নামিয়া পড়িয়া তাহার ডান হাতটা দিদির দিকে বাড়াইয়া হাসিয়া বলিল, আয় দিদি, আয় তুই আমার হাত ধরে নাম। তুই মোটা আছিস্‌রে দিদি, তুই আমার হাত ধর, দেখিস্ পড়ে যাসনি যেন। আয় দিদি আয়।

দিদি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, থাম দুষ্ট ছেলে আহা আমি আবার মোটা কোনখানটায় ? থাক আর ধরতে হবে না যা সর্।

না না তুই পারবি না দিদি পাদানিটা একটু উঁচু। আয় আয় আমার হাত ধর। ধর এই নে, ধর না, ধর্।

যা যা সর্ দুষ্ট ছেলে। এই ছাখ নেমে পড়লুম, বলিতে বলিতে দিদি অতি সহজেই নামিয়া পড়িল।

পুষ্কর আগেই নামিয়াছে। নামিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু আগাইয়া গিয়া প্রথম সম্ভাষণের সূত্রপাত করিয়া কিছু বলিয়া আলাপ করিতে ইতস্তত করিতেছে—সে যে অত্যন্ত লাজুক—অথচ একই অফিসে দুইজনে বলিতে গেলে প্রায় আজ চার বছর ধরিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু করিলে কী হইবে উভয়ের মধ্যে ইতিপূর্বে একটি দিনের জন্যও আলাপ পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। তাই এ সঙ্কোচ।

এমন সময় মেয়েটিই নিজে অগ্রসর হইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, কী খবর হঠাৎ এদিকে ?

—বেড়াতে এসেছি।

এই কী প্রথম নাকি এ দিকে ?

—হ্যাঁ এই প্রথম এলাম। তা আপনি ?

—আমিও ওই একই উদ্দেশ্যে।

—আপনার দেশ বুঝি এদিকে ?

—কি করে বুঝলেন ?

—কথার টান থেকে।

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেচেন। এদিকে কী যাতায়াত আছে বুঝি ?

—খুব বেশী নয় মাঝে মাঝে এসে থাকি।

—তা এবার কী তীর্থ করতে এলেন নাকি ?

—তীর্থদর্শনে এসেছি। আপনি ?

এদিকে সজল অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার আর এতটুকুও সময় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সব আলাপ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে না। দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, কী রে দিদি যাবি না ? চল্ ওদিকে যে সবাই চলে গেল। ঐ ছাখ কত লোক এগিয়ে যাচ্ছে। চল্ চল্ দিদি এগিয়ে যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণকলি সস্নেহে ডান হাতের আঙুলগুলি ভাইয়ের মাথার চুলের মধ্য

দিয়া চালাইতে চালাইতে বলিল, এই যে যাচ্ছি, দাঁড়া একটু, দাঁড়া এনার সঙ্গে কথা বলছি, যাচ্চি, চল না যাচ্চি।

সজলএর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া পুষ্কর বলিল, ও তাইত তোমার দেরী হয়ে যাচ্চে না, আচ্ছা চল চল ভাই এগিয়ে যাই বলিয়া কৃষ্ণকলির মুখের প্রতি তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এটি বুঝি ছোটো ভাই ?

এইবার সজল লজ্জায় পড়িয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। কৃষ্ণকলি পূর্বের ন্যায় তাহার মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, হ্যাঁ এটি আমার ছোটভাই। সজল, প্রণাম কর এনাকে।

সজল টিপ করিয়া তাহাকে একটা প্রণাম করিয়া দিদির ডান হাতের আঙুলগুলি দুই মুঠোর মধ্যে করিয়া লইয়া একটা মৃদু ঝাঁকানি দিয়া মিট মিট করিয়া হাসিয়া বলিল, এবার চল দিদি।

পুষ্কর এইবার সজলকে কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাকে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন ক্লাশে পড় ?

—ক্লাস IX হল এবার।

বাঃ বাঃ class IX হল, বেশ ভাল ছেলে ত, সুন্দর !

সজল লজ্জা পাইয়া একটু জড়সড় হইয়া বলিল, আপনার সুটকেশটা আমার হাতে দিন আমি নিয়ে যাব।

—আরে না না না তুমি কী নেবে ছি, তুমি ছেলে মানুষ তা হয় না, কতটা পথ আর হাঁটতে হবে বল ত, খুব বেশী দূর কী ?

—না না এসে গেছি, দিন না ওটা আমার হাতে। বলিয়া একরকম জোর করিয়াই পুষ্করের হাত হইতে ছোটো সুটকেশটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাঁটিয়া চলিল।

কিছুটা পথ হাঁটিয়া আসিলে সজল বলিয়া উঠিল; এইবার কিন্তু জুতো খুলতে হবে দিদি।

—কেন রে ?

—সামনেই যে নদী।

—নদী ? কোন নদী রে ?

—বক্রেশ্বর।

ক্ষুদ্র নদীটি। নাম তার বক্রেশ্বর। স্বচ্ছতোয়া, ক্ষীণাঙ্গী, খরস্রোতা।

উদ্গতযৌবনা তন্বী তরুণীর লীলায়িত দেহ ভঙ্গিমায় কুলুকুলু ধ্বনি করিয়া চল-চঞ্চল বালুকণা ও কঙ্কর.উপলের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া হেলিয়া দুলিয়া ছন্দ মধুর গতিতে আপন মনে বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও ইহার কলেবর সঙ্কীর্ণ, কোথাও বা প্রশস্ত. কোথাও বা সুবিস্তৃত; কোথাও বা ইহার মূর্তি ভাঙ্গনধরা, কোথাও বা বিস্তীর্ণ বালুচরে বিলীয়মান, কোথাও বা মরুরুক্ষ, কোথাও বা আবার স্নিগ্ধ ধারায় সংক্ষুব্ধ। সজলের বাঁ হাতে সুটকেশ ডান হাতটা সে পুষ্করের দিকে বাড়াইয়া বলিল, আপনি নোতুন মানুষ ঠিক করে পা ফেলতে পারবেন না পাথরের ওপর, জলের মধ্যে পা পড়ে যাবে আসুন, ধরুন ধরুন আমার হাতখানা ধরুন। দিদি সুটকেশটা একটু ধরত, বলিয়া দিদির হাতে সেটা ধরাইয়া দিয়া চোখ দিয়া কয়েকটা ছোট ছোট শিলাখণ্ড দেখাইয়া বলিল ঐ পাথর গুলোর ওপর আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে চলে আসুন। ডান পাটা আগে ফেলুন, ধরুন, আমার হাতটা ধরুন এবার, পাটা ফেলুন, ধরুন না আসুন চলে আসুন, চলে আসুন।

পুষ্কর তাহার ডান হাতখানা আলগার উপর ধরিয়া পর পর কয়েকটি ছোটো ছোটো উপলের উপর পা রাখিয়া রাখিয়া নদী পার হইয়া গেল।

তারপরে ক্রমশই তাহারা একটা কাঁচাপথ ধরিয়া হাঁটিয়া চলিল। সঙ্কীর্ণ পথ। দুই ধার দিয়া কেবল অগণিত মিষ্টান্নের বিপণি আর মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যশালা। পণ্যশালা বলিতে টিনের ছাউনি দেওয়া স্বল্পায়তন কক্ষ বিশেষ। নানাবিধ সামগ্রীর আমদানী লাগিয়াছে সেখানে,—ঘরকন্নার খুঁটিনাটি জিনিস, যেমন হাতা খুন্তি বেড়ী চাটু ডলনা উনুন, শিলনোড়া হইতে সুরু করিয়া ছেলে ভুলাবার চুষিকাঠি, খেলনা পুতুল, তরুণ তরুণীদের জন্য সাবান তেল স্নো, পাউডার ও তাপস তাপসীদের জন্য রুদ্রাক্ষের ও তুলসীর মালা ঘুনসী এবং নানা বর্ণের খণ্ড খণ্ড শ্রীখণ্ড সম্ভার।

অসংখ্য মোক্ষার্থী ও মোক্ষার্থিনীর ভিড়, কোথাও বা সেটা তরল কোথাও বা জমজমায়েত।

ভিড় দেখিয়া পুষ্করের চক্ষু স্থির, তাহার আর অগ্রসর হইবার ইচ্ছা হইতেছে না। কৃষ্ণকলির দিকে চাহিয়া বলিল, বেজায় ভিড় বাবা এগোনো যায় না।—কতক্ষণ থাকবেন এখানে? কৃষ্ণকলি হাসিয়া বলিল ও তীর্থদর্শনে এসেছেন এটুকু কষ্ট ত করতেই হবে। কী হয়েছে চলুন, কোনো অসুবিধে নেই।

পুষ্কর বলিল, কিন্তু এত লোকের ভিড় আমার সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি করে দেখে শুনে ফিরে যাব। সজল হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ভিড় আছে ত কী হয়েছে, আসুন আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন কোন কষ্ট হবে না। চলুন আগে কুণ্ডগুলো সব দেখে নিন, তারপর মন্দির দেখবেন। বলিয়া বেশ উত্তমের সহিত সে হাঁটিয়া চলিল।

পুষ্কর চুপ করিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে তাহারা একটা ছোট কুণ্ডের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। ভিড়টা সেখানে খুবই তরল। সজল কুণ্ডটাকে দেখাইয়া পুষ্করকে বলিল, এটার নাম অগ্নিকুণ্ড বুঝলেন, জলটা এর ভীষণ গরম প্রায় ১৮০ ডিগ্রী টেমপারেচার। দেখুন না একবার ছুঁয়ে—দেখবেন ?

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, অসম্ভব, হতে পারে না তা কি বলচ ?

—বিশ্বাস না হয় একবার হাত দিয়ে দেখুন না ?

—না ভাই দরকার নেই। চল অন্য দিকে যাই।

কৃষ্ণকলি বলিল, এত কষ্ট করে এলেন অথচ ফিরে যাবার জন্যে এত তাড়াহুড়ো করচেন্। বীরভূমের বৈশিষ্টই হল তার মেলা, আর মেলা মানেই লোকের ভিড়, এ'ত হবেই।

পুষ্কর বলিল, কিন্তু এত ভিড় আমার সহ্য হয় না।

—আজ যে যোগের দিন, সূর্য্যগ্রহণ আর চূড়ামণি যোগ একই দিনে, মহাপুণ্যদিন সুতরাং ভিড় ত হবেই।

—দেখছি ত তাই। কিন্তু এ জানলে মেলাটা বাদ দিয়েই আসতুম।

কৃষ্ণকলি স্মিতমুখে বলিল, তাহলে আজকের দিনে আপনার সঙ্গে এই যে এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে দেখা হওয়া ওটা বোধ হয় শুধু নেপথ্যেই নীরব হয়ে থাকত। সবই অলক্ষ্য চক্রের ব্যাপার। মানুষের নিজের কোনো কিছু করবার ক্ষমতা নেই। থাক, চলুন মন্দিরের দিকটা একবার ঘুরে আসি, বলিয়া সে দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কুণ্ডগুলি দেখিয়া লইয়া এবং মন্দিরের আশ পাশ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা পুনরায় জনতা অতিক্রম করিয়া একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই প্রকাণ্ড একটা জলাশয়। নাম তার পাপহরাগঙ্গা সজল গঙ্গার অপর তীরের দিকে তর্জ্জনীটা হেলাইয়া বলিল, চলুন শ্মশান

দেখে আসি—দেখবেন কত মড়ার খুলি আর মড়ার মাথা পড়ে আছে। ঐ দেখুন জটালী বাবার আশ্রম।

—না না শ্মশান দেখে কী হবে বরং অন্য দিকে চল।

সজল বলিল, তাহলে চলুন ছোটো মন্দিরটা দেখে আসবেন সেখানে তেমন ভিড় হয় না, বলিয়া সে ক্রমশ সে দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সত্যাই ছোট মন্দিরটার ভিতর জনতার চাপ অত্যন্ত লঘু। তিনজনে গিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। একটা স্বল্পোচ্চ শিলাখণ্ডের উপর ধাতুনির্ম্মিত হ্রস্বাকৃতি এক মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি। মূর্তিটির ঠিক নিম্নভাগে বক্রাকার ক্ষুদ্রপরিমিতির জলপূর্ণ এক শিলাগহ্বর।

সজল পুষ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, শুনেছি এইখানে নাকি দেবীর ভ্রূ পড়েছিল, সত্যি? জলের মধ্যে ডান হাতটা চুবিয়ে দেখলে সত্যিই নাকি বোঝা যায় দেবীর ভ্রূ রয়েছে।—দেখুন না একবার হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে।

পুষ্কর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হ্যাঁ আমিও তাই শুনেছি, বলিয়া কৃষ্ণকলির মুখের দিকে তাকাইয়া পরিহাসচ্ছলে বলিল, কী বলেন সত্যিই কী ভ্রূ হাতে ঠেকবে নাকি? দেখবো একবার হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে?

কৃষ্ণকলি বলিল, তা দিয়েই দেখুন না একবার নিশ্চয় ঠেকবে হাতে। সবই ত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার ব্যাপার। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি। বলিয়া সজলের হাত হইতে সুটকেশটা নিজের ডান হাতে করিয়া লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পুষ্কর বাহিরে আসিয়া বলিল, চল সজল এবার তাহলে ফেরা যাক আর কিছু দেখার নেই। থাকলেও এ ভিড় ঠেলে আর যেতে ইচ্ছে নেই।

কৃষ্ণকলি বলিল, তাহলে চলুন ফেরা যাক, বাস ছাড়বার সময়ও হয়ে এসেছে।—তা আপনি এখন ফিরছেন কোথায়?

—সোজা সিউড়ি যাবো।

কৃষ্ণকলি জিজ্ঞাসা করিল, সিউড়ি কোথায় উঠেছেন? বিছানাপত্তর সব কোথায়?

—এক হোটেলে উঠেচি, বিছানাপত্তর সব সেখানেই।

—আজই কী কোলকাতা ফিরছেন?

—হ্যাঁ আজ রাতের গাড়ীতেই ফিরব বলে মনে করছি।

—কেন আজকের দিনটা থেকে গেলে হয় না? চলুন, আজ আমার মামার বাড়ী থেকে যাবেন। মামার বাড়ী বেশী দূর নয়, সিউড়ির কাছেই। যখন এলেন এদিকে তখন তিলপাড়া বাঁধটা দেখে যান।

বাঁধের নাম শুনিয়া পুষ্করের মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল, বলিল, বাঁধটা বুঝি সিউড়ি টাউন থেকে খুব কাছে?

উত্তরে সজল বলিয়া উঠিল, খুব কাছে খুব কাছে—দুমাইলের ভেতর। চলুন, দেখে যাবেন। ময়ূরাক্ষী নদী দেখে যাবেন, কী সুন্দর নদী!—এত কাছে যখন বলছেন তখন দেখে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু কেন আর মিছি মিছি আর একজনের উপর উপদ্রব করা।

কৃষ্ণকলি বলিল, না না কিছু উপদ্রব নয়, মামা এতে খুব খুশিই হবেন। চলুন এগিয়ে যাই বাস ছাড়বার সময় হয়ে এল, তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠতে হবে তা না হলে সামনের দিকে সিট পাওয়া যাবে না।—সজল তুই ওনার সঙ্গে ওঠ্। বলিয়া পুষ্করের সুটকেশটা হাতে লইয়া সে বাসে উঠিয়া পড়িল।

পুষ্করকে সঙ্গে লইয়া সজল ড্রাইভারের পাশের সিটএ গিয়া বসিল।

দুই

বেশ পরিপাটি রূপে সাজান গোছান পরিচ্ছন্ন একটা ঘরে পুষ্করকে বসাইয়া কৃষ্ণকলি গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে একটু কালো চেহারার একটি মেয়ে আসিয়া একটা ট্রেতে করিয়া চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম ও কিছু খাবার একটা প্লেটে করিয়া সাজাইয়া লইয়া একটা টিপয়ের উপর সেটা রাখিয়া দিয়া ফিক করিয়া একটু হাসিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অপূর্ব্ব! কী সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ চেহারাটি! সর্বাঙ্গ ভরিয়া নবোন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণ ইঙ্গিত। পরনে একখানা খদ্দরের গৈরিক রঙের সাড়ী। মাথায় একরাশ কাল কেশ, কুণ্ডলীকৃত কবরী বেষ্টন করিয়া শুভ্র বনফুলের মালা।

অল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণকলি আসিয়া বলিল, আসুন হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন, বলিয়া একটা কাপের মধ্যে চায়ের লিকার ঢালিতে ঢালিতে জিজ্ঞাসা

করিল, রাতে মুরগীর মাংস আর দুটি ভাতের ব্যবস্থা করচি চলবে ত ?

পুষ্কর সলজ্জকণ্ঠে বলিল, আঃ অত সবের কী দরকার ছিল সামান্য দুটি ডাল ভাত হলেই হত, শুধু শুধু হাঙ্গাম করতে গেলেন কেন ?

—না হাঙ্গামের কিছু নয়—ঐ যে মেয়েটিকে দেখলেন না ওই সব ব্যবস্থা করচে।

—ও, ও বুঝি খুব ভাল রাঁধতে পারে ?

—ঐ আর কী আমাদের রুচির মতো করে রাঁধতে পারে তাই বলে কী আপনাদের মতো বাবুদের রুচির মতো করে রাঁধতে পারবে ?—নিন দেখুন ত খেয়ে চায়ের লিকারটা বোধ হয় একটু ষ্ট্রঙ্গ হয়েছে।

পুষ্কর এক চুমুক খাইয়া বলিল, না ঠিক আছে, ভাল চা হয়েছে, বলিয়া একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মেয়েটির কাপড়-চোপড় সব খদ্দরের দেখচি ? কে ইনি ?

কৃষ্ণকলি হাসিয়া বলিল, ও যে গ্রামসেবিকা। ও গ্রামসেবিকার কাজ নিয়েচে।

পুষ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, সে কী গ্রামসেবিকা ! বাঃ ভাল কাজ নিয়েচে ত। বেশ সুন্দর মানিয়েচে কিন্তু কাপড়টিতে।

কৃষ্ণকলি বলিল, সাঁওতালদের মেয়ে ওকে আমি একাজে নামিয়েছি।—ওর নামটি ও ভারী সুন্দর—রামী। পুষ্কর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, বা বেশ নামটি রেখেছেন ত। সাঁওতালদের মেয়ে !

কৃষ্ণকলি হাসিয়া বলিল, শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন না ? তা হবার কথা বটে।

পুষ্কর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণকলির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, আশ্চর্য চেহারা দেখে, বা কথা শুনে ত মনে হয় না যে ও সাঁওতালদের মেয়ে।

—ধরা খুবই শক্ত।—বড় দুঃখী মেয়েটি। ওর পাঁচ বছর বয়সের সময় থেকে আমাদেরই কাছে মানুষ হয় ও। বাড়ী ওর রামপুরহাট মা-বাপ কেউ নেই। এক বুড়ী পিসির কাছে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ হয় তারপর আমার মামা ওকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন, কিছু কিছু লেখা পড়াও সেখান। তারপর বছর দশেক বয়সের সময় আমি ওকে আমার সঙ্গে কোলকাতায় নিয়ে যাই—মিসন হোষ্টেলে। বছর পাঁচেক ও আমার কাছে থাকে।

সেখানে থাকতে থাকতেই ওর কথাবার্ত্তা, স্বভাব, এমন কী চেহারাটাও পাল্টে যায়।—কৈ চা-টা জুড়িয়ে গেল যে, খেয়ে নিন. ইস লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি।

ইত্যবসরে রামী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিন। জুড়িয়ে গেল যে খাবারগুলা। লজ্জা করবেন না। সকাল থেকে পেটে ত কিছু পড়ে নাই সবগুলা খেয়ে ফেলান, ফেলবেন না।

—অতগুলো লুচি খাব কী করে, এসো সকলে মিলে ভাগ করে খাই।

—হুঁ ঠিক বলচ, বলিয়া রামী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সজল বলিয়া উঠিল, ভারী ত ওই কথনা লুচি হ্যাঁ খেয়ে ফেলুন। আবার সেই রাত্তিরে ত খাবেন। নিন নিন তাড়াতাড়ি শেষ করুন, চারটের আগেই তিলপাড়া বাঁধ দেখতে যাবো।—দিদি তুই এবার যা খেয়ে নিগে যা আমি ওনাকে খাওয়াচ্চি।

রামী বলিল, হ্যাঁ সব খেয়ে ফেলতে হবে তা না হলে সুটকেশ আটকে রেখে দেবো, যেতে দোবো না—তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিন ভালো দেখে একটা গান শোনাবো, বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া ছুট করিয়া পলাইয়া গেল।

পুষ্কর একেবারে স্তম্ভিত। বেশ মেয়েটি ত!

তিন

প্রায় হাজার ফুট দীর্ঘ ও চল্লিশ ফুট প্রশস্ত একটা লৌহময় সেতু। ইহারই নীচ দিয়া ক্ষীণতোয়া ময়ূরাক্ষী নদী তার স্বচ্ছন্দ গতি হারাইয়া বিপুলায়তন কতকগুলি লৌহযবনিকার উপর আছাড় খাইয়া খাইয়া কখনো বা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আবার কখনো কখনো বা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। স্রোতস্বিনীর সে কী অস্ফুট ক্রন্দন, সে কী রুদ্ধ-বেদনার করুণ আর্ত্তনাদ! আজ সে শৃঙ্খলিত। কতকগুলি যন্ত্ররাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে তাহার সকল ঐশ্বর্য্য যেন লুপ্তপ্রায়, তার সকল অহঙ্কার আজ চূর্ণ। আজ সে যেন এক ঐশ্বর্যশালিনী যৌবনচঞ্চলা স্রস্তবসনা লাঞ্ছিতা তরুণীর ন্যায় গুইয়া গুইয়া কাতরধ্বনি করিতেছে। সেতুর পশ্চিম দিকে ইহার ব্যবচ্ছিন্ন ধারাটি যেন এক ধীরগামিনী কৃশাঙ্গীর ন্যায় হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বঙ্কিম গতিতে বালুচরের রুক্ষমধুর বুক চিরিয়া

চিরিয়া কোন্ মহামিলনের পথে চলিয়াছে। পূর্ব্ব দিকের অবরুদ্ধ জলরাশির উভয় দিক হইতে দুইটি বাঁধ উঠিয়াছে। সেই বাঁধ দুইটির দেহ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক দিয়া দুইটি খাল কাটিয়া বাহির করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খাল দুইটি আবার ক্রমশই সঙ্কীর্ণতর হইয়া গিয়া বিভিন্ন শাখায় পরিণত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। খালের দুই তীর ধরিয়া বরাবর মাটির ঢিবি উঠীয়াছে; যেখানেই ঢিবি সেখানেই সারিবদ্ধ বাবলার অফুরন্ত সমাবেশ। এই ঢিবি কত জনপদ. কত গ্রাম, কত প্রান্তর কত ধানের ক্ষেত, কত উপবন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব কি বিচিত্র তাহাদের শোভা,—চোখ জুড়াইয়া যায়। এই বাঁধের নাম তিলপাড়া ব্যারেজ।

ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে তিন জনে গিয়া উত্তর ভাগের ব্যারেজটার দেহসংলগ্ন ছোট একটি পুষ্পিত উদ্যানের পাশে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া অপূর্ব্ব আনন্দে লৌহপ্রাচীর নিয়ন্ত্রিত সংক্ষুব্ধ জলরাশির রুদ্ধ বেদনার ক্ষুব্ধধ্বনি শুনিতে লাগিল। পুষ্করের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার চোখের সম্মুখে হুড্রু জলপ্রপাতের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল,—যেন সেই জলপ্রপাতের কল্লোলের মতো এই কল্লোলটাও তাহার কানের কাছে সেই মধুরভঙ্গীতে জাগিয়া উঠিতেছে।

গভীর আবেগের সহিত পুষ্কর বলিয়া উঠিল, হুড্রু falls দেখেছেন, জোনা falls ?

কৃষ্ণকলি বলিল, দেখেছি। চমৎকার লাগে দেখতে। অদ্ভুত!

—আমি দু'দুবার দেখেছি।—সজল তুমি কখনো falls দেখেছো? রাঁচি গেছো কখনো?

সজল ভ্রমণ কাহিনীতে পড়িয়াছে কিন্তু স্বচক্ষে কখনো সে কোনো জলপ্রপাত দেখে নাই অবশ্য জলপ্রপাত কাহাকে বলে তাহা শুধু সে ভূগোলেই পড়িয়াছে। তাই এই প্রসঙ্গটা শুনিবামাত্রই তাহার মনটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। হঠাৎ দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিয়া বলিয়া উঠিল, দিদি তুই আমায় কিছুই দেখালিনে দিদি। এবার তুই আমায় falls দেখাতে নিয়ে যাবি, হ্যাঁ দিদি? যাবি দিদি? তুইত এবার ছুটি নিয়েছিস, চল্ নারে যাই, এবারে আমায় রাঁচি নিয়ে চল্। আমি কত কী জিনিস

দেখিনি, তুই আমায় কিছুই দেখালিনি।

—যাবো যাবো এবার ঠিক নিয়ে যাবো। বলিয়া, বিমুগ্ধদৃষ্টিতে সেই ফেনায়মান জলরাশির দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণকলি বলিয়া উঠিল, সত্যি কি সুন্দর চমৎকার জিনিস হয়েছে বলুন ত, শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সত্যি ভারী সুন্দর জিনিষ হয়েচে; যেন অনাদি কালের সৃষ্টির আনন্দ এদের প্রতিটি জলকনার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে। অদ্ভুত! আবার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে দেখুন unique achievement কংগ্রেস সরকারের। সত্যি কল্পনাও করতে পারা যায় না। যে না চোখে দেখেছে সে কখনো ভাবতেও পারবে না এমন জিনিস হতে পারে বলে।

কৃষ্ণকলি প্রশান্ত আবেগের সহিত বলিল, অবাক হয়ে যেতে হয় দেখে যে ছ'লক্ষ একর জমিতে অতিরিক্ত ফসল ফলিয়ে তুলচে এই ময়ূরাক্ষী নদী। কি সুন্দর Irrigation এর ব্যবস্থা হয়েছে। এই খালগুলো আজ চাষীদের কী ভাবে যে উপকারে আসছে ভাবতেও পারা যায় না। যে জমিগুলোতে আগে কোনদিন জলের অভাবে চাষ হত না আজ সেগুলোতে সোনা ফলচে। অথচ দেখুন এত করেও কংগ্রেস সরকারের সুনাম নেই। এমনই দেশ আমাদের এখনো লোকে বলে কংগ্রেস কিছুই করেনি, ছাই করেচে।

পুষ্কর ললিল, দেশের লোকের স্বভাবই এই। নিজের চোখে না দেখে নিজের কানে না শুনে শুধু কংগ্রেস সরকারকে গালাগালি দেওয়া কতকগুলো লোকের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই Government যা করেছে তা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ কিছুই করবে না অথচ কংগ্রেস সরকারকে গালাগালি দিয়ে মনের ঝাল মেটাবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন genius। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছো সজল?

হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেচি দেখেচি। ওরে বাবা প্রকাণ্ড বড় চেহারা, চোখে মোটা কাচের চশমা।

—কোথায় দেখলে তাঁকে?

—ঐ যে গেল বছর উনি যখন তিলপাড়া বাঁধ দেখতে এসেছিলেন সেই সময় ওনাকে দেখেচি। জানেন ত আমরা সব কংগ্রেস ভক্ত।

পুষ্কর শুনিয়া তাহার পিঠের উপর মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, আচ্ছা! তাই নাকি? বেশ বেশ। সত্যি তোমার কথাগুলো শুনে খুব ভাল লাগল,

খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন থেকেই তুমি কংগ্রেসকে ভাল বাসতে শিখেছ। তা হলে বড় হলে তুমি একজন বড় কংগ্রেস-নেতা হতে পারবে নিশ্চয়। কার কাছ থেকে শিখলে কংগ্রেসকে ভাল বাসতে ?

—কেন দিদির কাছ থেকে।

কৃষ্ণকলি তাহার কথার সমর্থনে বলিল, আমরা বরাবরই কংগ্রেসভক্ত। এই প্রতিষ্ঠানকে যারা ভাল বাসে না তারা নিজের দেশকে ভাল বাসতে পারে না বলে মনে হয়।

—সত্যি কথাই বলেছেন, আমারও সেই ধারণা। আমার মতে যারা কংগ্রেসকে গালাগালি দেয় তারা দেশের মঙ্গলকামনা করে না। আশ্চর্য এত সুন্দর করে দেশকে গড়ে তুলেছে তবুও নিন্দুকেরা বলে কিছুই করেনি, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ করচে।

—ওসব ধার করা বুদ্ধির কথা বুঝতেই পারা যায়। উগ্রপন্থীদের কথা সব। চলুন পরে আলোচনা করা যাবে এ বিষয়ে এখন ফেরা যাক্। একটু পরেই সূর্য ডুবে আসবে। সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফিরতে হবে। চলুন ফেরার পথে ডাক বাংলো, সারকিট হাউস দেখে যাবেন Irrigation colonyর ভেতর দিয়েও বেড়িয়ে আসবেন। বলিতে বলিতে ছোট সিঁড়িটা দিয়া রাস্তার উপরে উঠিয়া আসিয়া কৃষ্ণকলি ছ'খানা সাইকেল রিক্সার অনুসন্ধানে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেলিতে লাগিল।

পুষ্কর সজলএর হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিল, কৈ এখনো ত বেশ বেলা আছে, চলুন না হেঁটে হেঁটে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। কত সময় আর লাগতে পারে, তিন কোয়ার্টার কী বড় জোর এক ঘণ্টা, কী বলেন ?

কৃষ্ণকলি একটু হাসিয়া বলিল, আপনার idea নেই অনেক সময় লাগবে শীতের বেলা বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া ডাক বাংলোটাও ত দেখে যাবেন ?

এমন সময় ছ'খানা খালি রিক্সাগাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। একটাতে কৃষ্ণকলি উঠিয়া বসিল, অপরটাতে সজলকে সঙ্গে লইয়া পুষ্কর উঠিল।

কালো মসৃণ পিচের পাতমোড়া প্রশস্ত একটা পথ ধরিয়া মৃদু মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ ঘড়ঘড় শব্দ করিতে করিতে রিক্সাগাড়ী একটা বেশ স্বচ্ছন্দ গতি ধরিয়া

চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া তাহারা যখন ডাক বাংলোর সম্মুখে পৌছিল তখন বেলা বেশ পড়িয়া গেছে। অস্তরবির ম্লান আলো তখন গাছের মাথার উপর যেন লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে; আর অল্প ক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধরণীর শান্ত দেহের উপর ধীরে ধীরে লুটিয়া পড়িবে।

কৃষ্ণকলি প্রথমে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহারা দু'জনে পরে নামিল। তার পরে তিন জনে ক্রমশ ডাক বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিল। ডাকবাংলো, সার্‌কিট হাউস তারপর কতকটা ফাঁকা মাঠ তারপর মাঠের দক্ষিণ কোণের খ্রীষ্টান ধর্ম্মমন্দির অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা যখন 'ইরিগেসন্' কলোনীর আরক্তিম পথটার উপর আসিয়া পড়িল তখন সূর্য প্রায় অস্তমিত। এদিকে অতর্কিতে নিঃশব্দে হিমও পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অদূরের হ্রস্বাকার প্রান্তরটা ফাঁকা হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রান্তরটা অতিক্রম করিয়া ক্রমশ চলিতে চলিতে তাহারা যখন একটা ছোট জংলাগাছের নীচে আসিয়া পৌছিয়াছে ঠিক সেই সময়ে মেরুন রঙের ফারকোট গায় একটি যৌবন চঞ্চলা তরুণী দূর হইতে তাহাদের দেখিতে পাইয়া ক্রমশই সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই হয়। খুব পরিচিত মুখ না হইলে এমন কী পঞ্চাশ ষাট গজ দূরের মানুষকেও অল্পায়াসেই প্রথম নজরে চিনিয়া লওয়া একটু কঠিণ। তরুণীটি অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ একটা নামগোত্রহীন গাছের নীচে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

পুষ্কর দূর হইতে মেয়েটিকে অল্প অল্প চিনিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আপন মনে একটু হাসিয়া উঠিয়া কৃষ্ণকলিকে বলিল, মেয়েটি যেন আমার চেনা-চেনা বলে মনে হচ্চে। কৃষ্ণকলি হাস্যমুখে বলিল, তাই নাকি? তাহলে যান আলাপ করে আসুন, আমরা ততক্ষণ church-টার দিকে এগোতে থাকি।

—না না তাই কী হয়, আপনারাও আসুন।—এসো সজল। কৃষ্ণকলি বলিল, না না আমরা এগোচ্ছি, আসুন, আপনি দেখা করে আসুন। বলিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত লাজুক সে।

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, এলে পারতেন। তাহলে মনে কিছু করবেন না আসছি, বলিয়া সে আগাইয়া গেল।

হঠাৎ বহু দিনের পর এমনি এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে এমন একটি নির্জন জায়গায় পুষ্করদাকে দেখিয়া পঞ্চমী ক্ষণ কালের জন্য বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া গেল। সমস্ত মুখখানা তাহার সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যেও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লিপস্টিকলিপ্ত ওষ্ঠাধরে একটা হাসির রেখা টানিয়া বলিল, আরে পুষ্করদা' যে! সে কী হঠাৎ এমন সময় সিউড়ির এই কলোনীতে, কী ব্যাপার?

—বেড়াতে এসেচি! তা তুমি এখানে?

—সেজদা যে বদলি হয়ে এসেছে। কেন তুমি জান না?

—কী করে জানব বল।

—সে কী সেজদা' তোমায় জানায় নি?

—না ত। কদ্দিন এসেছে এখানে?

—প্রায় বছর খানেক হল।

—সেজদা কোথায় বাড়ীতে আছে এখন?

—না, বিশ্বভারতী গেছে।

—কেন সেখানে কী?

—আমার ছোট বোন মল্লারকে তোমার মনে আছে?

—খুব আছে। কেন সে কী আজকাল বিশ্বভারতীতে পড়চে নাকি?

—হ্যাঁ ওকে ওখানে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েচে। চল, এসো, বাড়ীতে এসো, বসবে চল। পুষ্কর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, দাদা নেই যাবো কার কাছে?

—কেন বৌদি আছে ত। চল চা-টা খেয়ে যাবে।

—সঙ্গে লোক আছে।

—থাকলেই বা তাতে কী হয়েছে। চল ওনাদেরও ডেকে নিয়ে আসি। সঙ্গে ওরা কে?

—পরে বলচি। তা তোমার খবর কী বল, বহুদিন পরে দেখা।

—এস না বাড়ীতে চল, বসে বসে সব কথা বলচি।

পুষ্করের খুব যে একটা ইচ্ছা আছে এমন নয়। তা'ছাড়া সঙ্গে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের ঐ শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ঐ শীতের মধ্যে কী করিয়াই বা অমন ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া যায়, বলিল, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অন্ধকারও

বাড়চে, অনেক দূরে যেতে হবে, সঙ্গে আবার torchটাও আনি নি। আজ থাক, পঞ্চমী।

—আমার torch আছে নিয়ে যেয়ো, বলিয়া অকস্মাৎ তাহার ডান হাতের মুঠোটা মৃদুভাবে নিজের দু হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া বলিল, না না পুষ্করদা' তা হয় না, অনেক দিনের পর দেখা। আজ তোমায় কিছুতেই ছাড়চি না যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

পুষ্কর একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেল। মৃদু ঝাঁকানিতে চট্ করিয়া হাতখানা মুক্ত করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, ছিঃ কী যে কর পঞ্চমী, তুমি এখনো সেই ছেলেমানুষটিই রয়ে গেছো, এতটুকুও লজ্জা নেই তোমার। কী ভাবলে বলত মেয়েটি তোমার কাণ্ড দেখে?

—ভাবল ত ভারী বয়েই গেল। তোমার হাত ধরে টানবার মতো সে অধিকারটা আমার আছে। তুমি বরাবরই সেই লাজুক ছেলেটিই রয়ে গেলে। চল চল আর দেরী কর না, চল বাড়ীতে গিয়ে বসবে চল।

—না না তা হয় না, কী মনে করবে বল ত মেয়েটি।

—করুক্ গে। আচ্ছা, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।

—কিন্তু ওরা আসবে কী? আচ্ছা ডেকে দেখো। বলিয়া, সে নিজেই ডাকিয়া আনিতে গেল। পঞ্চমীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কৃষ্ণকলি একেই অত্যন্ত লাজুক তাহার উপর এই অপরিচিতা মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে সে যেন আরও লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। তাই আমন্ত্রণ পাইয়া সে সলজ্জকণ্ঠে বলিল, আবার আমাদের কেন, আমরা এগুই উনি পরে আসবেন। সারাদিন উনি খাননি কিছু তাড়াতাড়ি গিয়ে ওনার খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিগে, বলিয়া পুষ্করের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আমরা আসি বুঝলেন, আপনি যান ওনার সঙ্গে ঘুরে আসুন—না না আপনি hesitate করবেন না কিছু। ভাল কথা, আসবার সময় একটা টর্চ থাকলে সঙ্গে করে আসবেন।

পঞ্চমী দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দু'দুটো টর্চ আছে, তাছাড়া খানিকটা পথ ত আমিই এগিয়ে দিয়ে যাবো। আপনিও আসুন না দিদি, লজ্জা করচেন কেন? আসুন, আসুন চা-টা খেয়ে যাবেন এ। এক রকম নিজেদের বাড়ী

বল্লেই হয়—এসো খোকা এসো, বলিয়া সজলকে স্নেহভরে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ও তাইত তোমার আবার গায়ে ত তেমন গরম জামা নেই, ঠেলে শীতও পড়েছে বটে। অবশ্য বেশীক্ষণ আটকাবোনা।—বাড়ীটা ত বেশী দূর নয় চলুন না আসুন, ঐ যে ঐ একতালা বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছেন ঐ বাড়ীটা, বলিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটা উঠাইয়া বাড়ীটা দেখাইয়া দিল।

কৃষ্ণকলি বলিল, না না আমরা আসি, আপনি ওনাকে নিয়ে যান।

পুষ্কর কৃষ্ণকলির দিকে তাকাইয়া বলিল, আসুন না একটু বসে যাই। এদের বাড়ী যেতে সঙ্কোচ করবার কিছু নেই। এর সেজদা আমার most intimate friend, ছোট বেলা থেকেই আমরা দু জনে বলতে গেলে একই সঙ্গে মানুষ হয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—এর নাম পঞ্চমী গাঙ্গুলী। অবশ্য এনার নাম জেনে তোমার লাভ নেই, আমরা একই অফিসে কাজ করি।—চলুন, এসো সজল ঘুরে আসি।

কৃষ্ণকলি বলিল, না না দেরী হয়ে যাবে। আপনার ত সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। বুঝতেই ত পারচেন আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারি না। বলিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া ঠিক সেই ভঙ্গীতেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

পঞ্চমী বুঝিল আর অনুরোধ করা নিষ্প্রয়োজন তাই সেও বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তারপর সৌজন্য দেখাইয়া নিরতিশয় বিনয়ের সহিত মৃদুস্বরে বলিল, মাপ করবেন অভদ্রতা, এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলাম ওনাকে।

—ছি ছি কী বলেন; অনেক দিনের পর দেখা না যাওয়াটাই ত অন্যায়। না না আমি এতটুকু কিছু মনে করিনি। বলিয়া, কৃষ্ণকলি সজলকে সঙ্গে লইয়া বিদায় লইল।

তখনো অতিক্রান্ত সন্ধ্যার অন্ধকার ঠিক তেমন নিবিড়ভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে নাই। পথ শূন্য, প্রান্তর শূন্য, আকাশের তারা তখনোও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না। দূরে বড় ঝাউগাছটা প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে যেন অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুটা পথ চলিয়া আসিয়া পঞ্চমী একটা উচ্ছল হাসির সঙ্গে বলিল, আচ্ছা পুষ্করদা' বলত কোনোদিন কী কখনো ভাবতে পেরেছিলে ঠিক এমনি এক সন্ধ্যায় সিউড়ির এই নির্জ্জন প্রান্তরবীথির

ঘনায়মান অন্ধকারের মুঠোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দু জনে ঠিক এমন রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্তে দেখা হবে।

—বাবা, এত কবিত্ব করতে শিখলে কোথিকে? কী, এখানে বসে বসে বুঝি শুধু কাব্য করচ আর খাচ্চ-দাচ্চ? ভাল, ভাল। শান্তি নিকেতনের হাওয়া লেগেছে বুঝি? ওখানকার ঝরে-পড়া শুকনো গাছের পাতাগুলোও যেন হাসে, কাঁদে, কাব্য করে, ছেলে মেয়েদের কথা ত বাদই দিলুম। তোমারও দেখছি সেই রোগ ঢুকেচে।

—এ জীবনটাই ত একটা কাব্য। তাছাড়া সকাল থেকে ঘরে বসে বসে এক নাগাড়ে আর বই পড়তেও ভাল লাগে না। একটা চাকরীর চেষ্টা করলেও পারতুম ছাই। দাও না গো একটা চাকরি দেখে হ্যাঁ গো পুষ্করদা'?

—তুমি ত এম. এ. পাশ করেছো না?

—বাঃ সে ত প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

—কিসে?

—Economics-এ। বলিয়াই, পরমুহূর্ত্তে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ মেয়েটি কে গো? একই office-এ চাকরি করে, তাই নাকি? বাবাঃ, মোটা ধুম্‌সি, কি বিচ্ছিরি চেহারা।

—কিন্তু অনেক গুণ আছে, ব্যবহারটিও অতি চমৎকার। কাজও করতে পারে সুন্দর। তা হঠাৎ এ কথাটা উঠচে কিসে?

—সামান্য তিনটি কথা কিন্তু তাহা যেন পঞ্চমীর হৃদয় তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় গিয়া বিদ্ধ করিল। মনে মনে ভাবিল, কথাটা না বলিলেই যেন ভাল ছিল। তাই নিজেকে যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত করিয়া লইয়া সহাস্য কণ্ঠে বলিল, না এমনি বল্লুম; চেহারাটা সত্যিই একটু মোটা ত তাই নজরে এল।—তা-হঠাৎ এ সময় এখানে?

পুষ্কর অল্প একটু হাসিয়া বলিল, সে একটা ছোট্ট anecdote.

পঞ্চমী অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, বেশ তাহলে শোনাও না একটু শুনি।

—শোনাচ্ছি, কিন্তু কতদূর আর যেতে হবে?

—এই ত এসে গেছি, বলিয়া পঞ্চমী ছোটো একটা একতলা বাড়ীর সুমুখে আসিয়া দরজার মুখে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ডাকিয়া উঠিল, বৌদি বৌদি,

শীগগির শীগগির দরজা খোলো, দরজা খোলো শীগগির। কে এসেছে দেখো।

বৌদি লুচি ভাজিতেছিলেন। জলন্ত কড়াটা ঝপ করিয়া উনুনের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া তিনি যেমন আলুথালু বেশে ছিলেন ঠিক তেমন ভাবেই হইয়া আসিয়া খুন্তিটা ভুলক্রমে হাতের মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

পুষ্করের এই আকস্মিক আবির্ভাবে যদিচ তিনি রীতিমতোই বিপুল ভাবে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন তবুও বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ না করিয়া, এমন কি মাথার অবগুণ্ঠনটি পর্যন্ত তুলিয়া না লইয়া এবং একই সঙ্গে খুন্তিসুদ্ধই হাতটা তুলিয়া সাদর অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, আরে পুষ্করবাবু যে, আসুন আসুন বসুন। বহু দিন পরে দেখলুম। কী ব্যাপার কোনো কিছু খবর না দিয়েই দয়া করে এসে যে পায়ের ধুলো দিলেন? কেমন আছেন ভাল ত?

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, ভাল আছি। কিন্তু এ একেবারে accidental, আধ ঘণ্টা আগেও ভাবতে পারি নি দিদি যে, আজকের এই সন্ধ্যায় ঠিক এমন জায়গাতে আপনাদের দুজনের সঙ্গে দেখা হবে।

—তা হঠাৎ কোন্ উপলক্ষ্যে এ দিকে এসে পড়লেন?

পুষ্কর পঞ্চমীর দিকে মুখটা একটিবার ঘুরাইয়া লইয়া পুনরায় বৌদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, এসেছিলাম বক্রেশ্বরের মন্দির দেখতে। তা হঠাৎ ঘটনা চক্রে এমনই একটা ঘটনা ঘটে গেল যা কোনো দিন চিন্তাও করিনি, —বাসের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে শুধু এক পলকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হল। অবশ্য তাকে দেখে আসচি আজ প্রায় চার বছরেরও ওপর ধরে, একই অফিসে বলতে গেলে একই ঘরে বসে কাজ করে আসছি। আশ্চর্য এই কটি বছরের মধ্যে মেয়েটি একটা দিনের জন্যও মুখ খুলল না অথচ এই মহাপীঠস্থানে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ডেকে আলাপ করল। এইভাবে অতি সংক্ষেপে অথচ পুরাপুরিভাবে সমস্ত ঘটনাটি পুষ্কর বিবৃত করিয়া গেল।

শুনিয়া বৌদি পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, বাঃ বাঃ এ দেখছি full of romance। মন্দ কী ভালই ত। তাই বুঝি ওনার ওখানে উঠেছেন?

—ঠিক উঠি নি দিদি, বলতে গেলে এক রকম নেমতন্ন করেই নিয়ে এল।

পঞ্চমী ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, তা বাগ্দী পাড়ায় কেন? ছি ম্যা গো, বাবাঃ!

পুষ্কর নিতান্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে বলিল, তা কী করে বলবো বল, তা ত জানি না।

বৌদি পঞ্চমীর কথাটা ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, কথাটা অবশ্য ও ঠিকই বলেচে কেননা সহরের ঐ দিকটাতে বাউরি আর বাগ্দী ছাড়া অন্য কোন জাত বড় একটা থাকে না। বলিয়া, বৌদি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চমী পুনরায় একটু শ্লেষ দিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার একটা রুচি নেই পুষ্করদা ছিঃ।

—কেন? তার মানে?

—তা ছাড়া আবার কী,—যেমন রূপ তেমন হাবভাব, নিশ্চয়ই বাউরি বাগ্দীদের মেয়ে হবে তা না হলে ও সব পল্লীতে অন্য কোনো জাতের লোক ত বড় একটা থাকে না। লোকে দেখলে কী বলবে বল ত। আবার এক কথায় নেমতন্নও accept করে বসলে। রাতও কাটাচ্চ। ছিঃ ম্যা গো!

কথাগুলি পুষ্করের মনের উপর যেন এতটুকুও রেখাপাত করিল না, বরং রুচিবিকৃতির প্রসঙ্গটা তাহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়াই মনে হইল, বলিল, নেমতন্ন accept করে এমন কী অন্যায়টা করেচি। তা হলে দেখচি তুমি যে রকম বলচ এক সঙ্গে বসে কাজ করাও চলে না।

—না সে কথা বলি নি।

—তবে কী বলচ বল। আলাপটা এই একটা দিনের ঠিকই কিন্তু পরিচয়টা ত চার বছরের, জানিও সে বাউরির মেয়ে। তা ছাড়া অমন আন্তরিকতার সঙ্গে আমন্ত্রণ করার পরেও যদি তার বাড়ীতে না যেতাম সেটা কী ভাল দেখাত? তুমি যে ভাবে এখন ভাবছ সেও হয়ত তখন ঠিক সেই ভাবেই ভাবত,—নিশ্চয়ই মনে করত বোধ হয় ঐ কারণেই এড়িয়ে গেল।

—না একথা তুমি ভুল বলচ পুষ্করদা, তুমি ত আগে থেকে জানতে না যে সে কোথায় থাকে। তা ছাড়া আমি যে ভাবে ভাবচি সে ভাবে সে কখনই ভাবতে পারে না।

—না পঞ্চমী তা নয়। সোজা কথাটা বলতে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাইচ যে, আমি জেনেশুনেও এতটা বাড়াবাড়ি করলাম কেন।

পঞ্চমী খোঁচার আঘাতটা তীব্রতর করিয়া নির্লজ্জের মতো দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ যা ধারণা করেছ ঠিক তাই। কাজটা কী ভাল হয়েছে তোমার ? ছিঃ ছিঃ।

পুষ্করের মুখের উপর একটা প্রশান্ত সুগভীর স্থৈর্য্যের ছায়া প্রতিভাত হইয়া উঠিল, বলিল 'ত্যাখো পঞ্চমী তোমার কথাগুলোর মধ্যে এতটুকুও যুক্তি নেই।

—নিশ্চয় আছে।

পুষ্কর একটু হাসিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, এদিকে ত দেখচি এম. এ. পাশ করেচ, অথচ এসব কী বলচ ? আবার নোতুন করে বিদ্যাসাগর আর স্বামীজীর জীবনী পাঠ কর। এই কী তোমার শিক্ষা ?

—ওসব বাজে কথা ছাড়ো এখন।

—বাজে কথা নয়, কাজের কথা বলচি, মনটা এতো অনুদার কেন ? যেখানে এতোটা আন্তরিকতা সেখানে নিজের মূল্য বাড়িয়ে লাভ কী ?

পঞ্চমী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এসব লাভ-লোকসানের কথা নয় পুষ্করদা' এখানে রুচির কথাটাই বড় কথা। তোমার যে একটু সুরুচিজ্ঞান আছে সেটাও তোমার তাকে indirectly বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—ছিঃ।

বিষয়টাকে অত্যন্ত লঘুজ্ঞানে অবজ্ঞাত করিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া পুষ্কর বলিল, তোমার মাথায় ভূত চেপেছে পঞ্চমী, তাই যত সব বাজে কথা বলচ ; সারা রাত শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখো একটি বার, তাহলে বুঝতে পারবে যা বলতে চাইচ তার মধ্য এতটুকুও যুক্তি নেই। এত সুন্দর ব্যবহার মেয়েটির যে charmed হয়ে যেতে হয়। চল না, যাবে একবার আমার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে ? একটি বার আলাপ করে দেখলে বুঝতে পারবে মানুষের বাইরেটাই তার সব নয়। প্রত্যেক মানুষেরই প্রতি মুহূর্তের জন্য, যতদিন সে বেঁচে থাকবে এ পৃথিবীতে, নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখবার, সংস্কৃত করবার প্রয়োজন আছে। ভেবে দেখো একবার যে কথাগুলো বল্লাম।

পঞ্চমী সহসা গম্ভীরকণ্ঠে বিকৃতমুখভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল থাক আর ফিলসফি আওড়াতে হবে না। ছি ছি বলতেও লজ্জা করে না, মা গো শুনতেও ঘেন্না করে—দুয়্ দুয়্ বামুনের ছেলে তোমার গলায় দড়ি। মানুষ চেনবার আমার প্রয়োজন নেই।

পুষ্কর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, চট করে একেবারে বিচলিত হয়ে ওঠো কেন পঞ্চমী? নিজেকে এভাবে অকিঞ্চন করে ফেলছ কেন? এস না, আলাপ করতে দোষ কী? নয় তার বাড়ীতে জলস্পর্শ নাইই করলে।

—এ্যা আমার ভারি বয়েই গেছে। হাজার হলেও এখনো পর্যন্ত বামুনের মেয়ে। যখন জাতধর্ম্ম সব একেবারে যাবে তখন দেখা যাবে।

এমন সময়ে বৌদি আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁর ডান হাতে একটা কাঁসার থালায় খান কতক লুচি, খানিকটা বাঁধাকপির তরকারী, কতকটা আলু ভাজা, গুটি চারেক পাটি সাপটা পিঠা, এবং বাঁ হাতে একটা জলপূর্ণ কাচের গ্লাস। ছোট টেবিলের অভাবে জলখাবারের থালাটি ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া বৌদি বলিলেন, আসুন হাতটা একটু ধুয়ে নিন, বলিয়া গ্লাসটা তাহার হাতের কাছে বাড়াইয়া ধরিলেন।

—ওরে বাবা! সর্বনাশ অতগুলো লুচি! করেছেন কী দিদি? আমি কী রাক্ষস নাকি!

বৌদি হাসিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, আহা ভারি ত এই কখানা লুচি আর ঐ চারটে পিঠে,—এ এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেলা যায়। নিন হাত ধুয়ে নিন, আর কথা বলতে হবে না—যাও ত ঠাকুরঝি দেখে এসো ত চা-টা বোধ হয় এতক্ষণে ভিজে গেছে, নিয়ে এসো ত বলিয়া, বৌদি একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া ড্রেসিং টেবিলের ডান দিকে বসিয়া পড়িলেন।

পুষ্কর অনেক বিনয় করিয়া বলিল, এইত তিনটে নাগাদ এক পেট খেয়ে বেরিয়েছি আবার এতগুলো খাই কী করে বলুন ত। আমি চার খানার বেশী কিছুতেই খেতে পারব না, মাপ করবেন।

—বাজে কথা বলতে হবে না, ভাল ছেলেটির মতো আরম্ভ করুন ত এখন। কবে ফিরছেন?

—আজই ত চলে যেতাম নেহাৎ আটকা পড়ে গেলাম। কাল সকালে উঠে চলে যাবো।

—একেবারে কী direct কোলকাতা যাবেন না অন্ত আরও কোথাও যাবেন ?

—যাবার ইচ্ছে ছিল ত হেতমপুর তা আর হয়ে উঠলো কৈ।

—কী রকম লাগল এ দেশ ?

—মন্দ না। বেশ সুন্দর জায়গা। এখানে আসবার আগে অনেকে অনেক রকম ভয় দেখিয়েছিল, বল্লে রাতারাতি malignant malaria হয়ে মারা যাবে। যত সব বাজে কথা।

—সত্যিই বাজে কথা, আজকাল বীরভূমে আর malaria নেই।

—ডাঃ রায় বাঙলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সত্যি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

বৌদি সে কথার কোনও সমর্থন না করিয়া প্রসঙ্গান্তর তুলিয়া বলিলেন, তা কাল সকালে দুটি মাংসভাত খেয়ে গেলেই ত হত। অনেক দিনের পর এলেন, বিয়ের সময় তখন আপনার সঙ্গে আমার আর সে ভাবে পরিচয়ও হয়নি। ওর দাদা শুনলে আমাদের ওপর ভীষণ রাগ করবে, বলবে তোমরা নিশ্চয়ই তাকে সে ভাবে যত্ন করনি, খেতে-টেতে বল নি। আমাদের দোষ ধরবে সুতরাং আপনি খেয়ে যাবেন কাল সকালে। না খেয়ে গেলে মনে বড় দুঃখ পাবো কিন্তু।

—না দিদি অসম্ভব। আমি লিখে জানিয়ে দোবো দেবকুমারকে। তাকে বলবো আপনারা যথেষ্ট আদর যত্ন করেছিলেন এবং খেয়ে যেতে বলে-ছিলেন কিন্তু আমি স্বইচ্ছায় চলে এসেছিলাম।

বৌদি তবুও অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় পঞ্চমী আসিয়া চায়ের কাপটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, আমি সব কথা দালান থেকে শুনেছি, ওসব চলবে-টলবে না পুষ্করদা', কাল সকালে খেয়ে যেতেই হবে, ছাড়চি না। নোংরা বস্তিতে গিয়ে রাত কাটাতে পারবে আর যত কাজ পড়ল সব আমাদের এখানে দুটি মাংস ভাত খেয়ে যেতে। দোবো না যেতে, কোনো কথা শুনবো না।

—শোনো পঞ্চমী ও মেয়েটির কথা আলাদা। তার অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলুম না। অবশ্য তার সঙ্গে দেখা না হয়ে যদি আগেই তোমার সঙ্গে দেখাটা হয়ে যেত তা হলে ঐ একই অবস্থা হত,—সে ক্ষেত্রে

তোমাদের আমন্ত্রণ কোন মতেই উপেক্ষা করতে পারতুম না। বলিয়া, চা'র কাপটা মুখে তুলিয়া এক চুমুক খাইয়াই মুখটা কেমন কেমন করিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল।

বৌদি স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী চা'য় বোধ হয় মিষ্টি হয় নি নিশ্চয়?

পুষ্কর কেবল একটু হাসিল।

পঞ্চমী বিষম লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বড় একটা চামচে করিয়া চিনি আনিয়া কাপের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া চাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, সত্যি একেবারেই ভুলে গেছলাম, ইস্। ছাখো ত এবার মিষ্টি হল কিনা?

পুষ্কর আবার এক চুমুক খাইয়া বলিল, হয়েছে। ওদের বাড়ীর চা-টাও খুব সুন্দর হয়েছিল। মেয়েটি ভারী সুন্দর চা করতে পারে।

পঞ্চমী রীতিমতো আহত হইয়া অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, ও ভাবে ঘুরিয়ে না বলে সোজাসুজি বল্লেই হত আমাদের চা'টা ভাল হয় নি। লজ্জা হচ্ছে বুঝি বলতে?

—বাঃ খারাপ ত হয়নি, লজ্জা হবে কেন। না না সত্যি চা'য়ের flavourটা ভারী সুন্দর হয়েছে। তা এসো তুমিও লাগো আমার সঙ্গে তা না হলে অতগুলো শেষ করব কী করে?

—থাক ঢের হয়েছে, আর লজ্জা করতে হবে না, খেয়ে নাও তো এখন। শোনো এক কাজ কর, কালকের দিনটা এখানে থেকে পরশু চলে যাও। চল মাসানজোর Dam দেখে আসবে, ওটা নিশ্চয়ই দেখা হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে বৌদিও বলিয়া উঠিলেন, ভালই ত হয় চলুন না কাল সকালেই চলে যাওয়া যাবে। তিলপাড়া ব্যারেজ দেখলেন অথচ মাসানজোর Dam দেখবেন না, তা হলে যা কিছু দেখলেন সে সবই যে অসম্পূর্ণ হয়ে রইল।

পুষ্কর বলিল, তা যা বলেছেন কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের first five-year plan এর achievement চোখে দেখে আসা উচিত। যাবার ত খুব ইচ্ছেও কিন্তু পরশু ত আমাকে অফিসে join করতেই হবে।

পঞ্চমী যেন একটু শাসনের সুরেই বলিয়া উঠিল, হ্যা কামাই হলো ত ভারী বয়েই গেল এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না তাতে। কাল তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। বলিয়াই, পুষ্কর যে চেয়ারটিতে বসিয়াছিল তারই

হাতার উপর রাখা পুষ্করের আলোয়ানখানা স্মুট করিয়া টানিয়া লইয়া বুকের মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল ।—কেমন জব্দ ! খালি গায়ে যেতে হবে এবার ।

পঞ্চমীর কাণ্ড দেখিয়া পুষ্কর স্থির হইয়া বসিয়া হাসিতে লাগিল। কাপেতে তখনো পর্যন্ত খানিকটা চা অবশিষ্ট রহিয়াছে ; সেটুকু ঘন ঘন চুমুকে শেষ করিয়া লইয়া পুষ্কর নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলিল, কী গো পঞ্চমী তাহলে কী খালি গায়েই বিদায় দিচ্ছ নাকি ?

বৌদি একটা স্নিগ্ধ তুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, না না তাই কী হয়, এর বদলী আর একখানা পাবেন অবশ্য ।

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, দিদি আপনিও তো কম রসিক নন দেখচি। তার মানে আমাকে না খাইয়ে আপনারা ছাড়বেন না আর কী। কিন্তু আমার ত জাত চলে গেছে ।

পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, যাগগে, আমরা শুদ্ধ করে নেবো। কাল এসো তারপর দেখা যাবে। সেজদাও বোধ হয় সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে এসে পড়তে পারে। কেমন জব্দ ত।

—তা জব্দ করবেই বটে। বেশ এবার যেতে দাও। অনেক সময় হয়ে গেল।

বৌদি বলিলেন, তা আর এমন কী দেরী হয়েছে, আর একটু সময় নয় বসেই যান না। পুষ্কর বলিল, দেরী হয়ে গেলে তারা কত চিন্তায় পড়বে বলুন ত ? একেবারে নোতুন লোক ভাববে হয়ত নিশ্চয় কোনো বিপদ আপদ হয়েছে পথে। আধ ঘণ্টা বলে দেড় ঘণ্টা বাদে গেলে দেখায়ও ত খারাপ।

পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, কিছু খারাপ দেখাবে না ; তুমি থামত পুষ্করদা'। —কালত আসছিই তবে আর কেন আটকাচ্চ।

বৌদি বলিলেন একাটি আছি আমরা, নয় আরও কিছু সময় কাটিয়েই গেলেন কী আর হবে এমন।

বেশ থেকে যাবো নয় আরও কিছু সময়। তাহলে যখন থাকতেই হচ্চে তখন তোমার ঐ favourite গানটা একবার গেয়ে শোনাও পঞ্চমী।

পঞ্চমী মৃদুহাস্যে বলিল, আমারটা ত বহুবারই শুনেচো আজ বৌদির একটা গান শোনো। বৌদি আমার চেয়ে ভাল গাইতে পারে।

—তাই নাকি ? জানতুম না ত। তাহলে একটা গেয়ে শোনান দিদি।

বৌদি অত্যন্ত সপ্রতিভ। গান শুনাইতে তাঁর এতটুকুও লজ্জা আসে না বরং কোনো লোককে গান গাহিয়া শুনাইতে পারিলে তিনি খুবই উৎসাহিত বোধ করিয়া থাকেন এবং মনে মনে যথেষ্ট আনন্দও অনুভব করিয়া থাকেন তবুও বিলক্ষণ বিনয় করিয়া বলিলেন, গাইচি কিন্তু আপনার ভাল লাগবে কিনা জানিনা। কি গান শুনবেন ? অতুলপ্রসাদের একটা শুনবেন নাকি ? "আর কতকাল থাকব বসে" অবশ্য বহু পুরনো গান।

—না না রবীন্দ্র-সঙ্গীতই ভাল। ঐ গানটা জানেন নাকি ?

—কোনটা ?

—"শুধু তোমার বাণী নয় গো………"

—ও ঐ গানটা, আচ্ছা। কিন্তু কী রকম লাগবে আপনার বলতে পারি না।

—গান না দিদি, গেয়ে যান, আরম্ভ করুন, শুনি। ভাল লাগবে কী না লাগবে আগে থেকে আন্দাজ করচেন কী করে আপনি ?

বৌদি একটু হাসিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া ঘরের একদিকে পাতা বড় খাটটার উপর উঠিয়া বসিয়া হারমোনিয়ম যোগে গান ধরিল,

শুধু তোমার বাণী নয় গো,
হে বন্ধু, হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিও।

গান শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমী একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বলত পুষ্করদা' আমার থেকে বৌদির গলা ভাল কিনা ?

—নিশ্চয়ই অতি সুন্দর গলা ওনার।—বেশ গেয়েচেন দিদি, বেশ গেয়েচেন। সত্যি চমৎকার গান আপনি। যাই বল পঞ্চমী ওনার গলাটা কিন্তু তোমার থেকে ভাল।

ভাল বলেই ত শুনতে বল্লুম। কোলকাতার খুব ভাল ভাল সঙ্গীতের আসরে বৌদি আগে অনেক গান গেয়েছে।

পুষ্কর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিল, সত্যি, গলা বটে, আসরে বসে

গাইবার মতো গলা। তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সে ভাবে গাইতেই জানে না অনেকে।

বৌদি এইবার খাটের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া পুষ্করের ডান হাতের কাছে নিজের ডান হাতটা পাতিয়া বলিয়া উঠিলেন, শুধু কথায় পেট ভরে না, দেখি পাঁচটা টাকা দিন ত।

পুষ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল, টাকা!

—হ্যাঁ টাকা চাইচি, দিননা দরকার আছে।

—না, সত্যি ঠাট্টা করচেন।

—না ঠাট্টা করচি না। seriously চাইচি, না সত্যি, দিনত পাঁচটা টাকা।

—না না আপনি ঠাট্টা করচেন।

পঞ্চমী মিটি মিটি করিয়া হাসিয়া বলিল, না না তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করচে না বৌদি। টাকা পাঁচটা দাও আগে তারপর বুঝতে পারবে কেন চাইচেন উনি। পুষ্কর বিগতবুদ্ধি হইয়া মনিব্যাগ থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করিয়া লইয়া পঞ্চমীর হাতে দিয়া দিল।

টাকাটা বৌদির হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়া পুষ্করের মুখের দিকে চাহিয়া পঞ্চমী বলিল, উগ্রপন্থী party fund-এ আপনার নামে এই টাকাটা donation হিসাবে ধরে নেওয়া হবে।

পুষ্কর একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ব্যাপারটা এক বর্ণও সে উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিল না। শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বৌদির বৈদগ্ধ-মধুর স্মিতহাস্যলিপ্ত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তারপর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, খুব লোক ত যা হ'ক। বাবা! আপনার আবার এই রোগ আছে জানতুম না ত! উগ্রপন্থী হয়েছেন, তা'দের হয়ে আবার অনামে টাকা তুলচেন।

বৌদি মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা আছে বৈকি। এ রোগ ত আজকের দিনে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক যুবতীদের মধ্যে আছে। এ রোগ যার নেই তার চিন্তাশক্তিও নেই।

—মাপ করবেন। না দিদি আমার এ রোগটা নেই। না না আমি উগ্রপন্থী নই। না দিদি দেখুন, আমার নামটা কিন্তু আপনাদের কোন

কাগজপত্রে রাখবেন না। সর্ব্বনাশ! আমার চাকরিটা খাবেন না, দোহাই আপনার দিদি! সত্যি এ জানলে আমি কিছুতেই টাকাটা দিতুম না।

পঞ্চমী মিট্ মিট্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তা এতেই যদি চাকরী যায় ত যাক। কংগ্রেসকে সাপোর্ট করে ছাই হবে। তোমার আর কী তুমি ত দিব্যি মোটা মাইনের চাকরি করচ, পরের দুঃখ বুঝবে কী করে?

—তাইত বেশ মজার কথাই বলচ যাহ'ক।

বৌদি অভয় দান করিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, ভয় নেই আপনার নাম কোথাও থাকবে না, কেউ জানতেও পারবে না। কিন্তু প্রত্যেক মাসেই আপনাকে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে যেতে হবে party fund-এ।

—না দিদি, আমি কোন পার্টিতেই নেই। সুতরাং আমাকে কোনো দলেই ভুক্ত করবার চেষ্টা করবেন না। দিদি আপনার অনেক সাহস দেখচি। দিব্যি ভাল মানুষটি পেয়েচেন দেবকুমারকে।

—ও রকম ভাল মানুষে প্রয়োজন নেই। সে ত পুরো congress supporter তা ত জানিই।

পুষ্করের নিকট সমস্ত জিনিসটা কেমন যেন একটা অনধিগম্য রহস্য-ব্যূহের ন্যায় মনে হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল তা'ইত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এতদূর মনান্তর থাকা সত্ত্বেও ইহারা যে কেমন করিয়া সুখের পারিবারিক জীবন যাপন করিয়া যাইতেছে সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই প্রসঙ্গটা সম্পর্কে আর কথা না বাড়াইয়া বলিল, যাক্ আপনারা আছেন ভাল দিদি! অবশ্য আপনারা আপনাদের উগ্রবাদ নিয়েই থাকুন কিন্তু দোহাই আমাকে আর আপনাদের দলে টানবার চেষ্টা করবেন না। আচ্ছা, আজ উঠি তাহলে, আর আটকাবেন না দিদি! অনেক রাত হয়ে গেল, বলিয়া হাতঘড়িটার দিকে একটিবার তাকাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ, চললুম আর নয় ইস্, প্রায় দুটি ঘণ্টা সময় কেটে গেল; ছি ছি তাইত কী ভাবচে তারা, অত্যন্ত অন্যায় হয়ে যাচ্চে।

বৌদি বলিলেন, সত্যি রাত হয়ে গেছে বটে, না আর আটকাবো না, আপনাকে। তবে মনে রাখবেন আমার কথাটা, 'বন্ধনমুক্তি' কাগজখানা মাঝে মাঝে পড়বেন। বলিয়া দু'আনা মূল্যের ষোলখানা এবং চার আনা মূল্যের বারো খানা লাল অক্ষরে ছাপা রসিদ পুষ্করের হাতের কাছে ধরিয়া লইয়া বলিলেন, রেখে দিন এগুলো।

—কুচিয়ে ফেলে দিন, আমার দরকার নেই রসিদের। আমার 'জনসেবক'ই ভাল। তা হলে আসি এখন পঞ্চমী, বলিয়া দরজার চৌকাঠ পার হইয়া আসিয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া পুনরায় বলিল, torch টা দিতে ভুল না পঞ্চমী।

—এই নাও টর্চ, কালকে যেন আবার আসতে ভুল না। চল, আমরা ততক্ষণ এগিয়ে যাই ; বৌদি ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে পরে আসচে।—উঃ বেশ ঠাণ্ডা পড়েচে ত, ঘরের মধ্যে বসে থেকে কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

—তা' শীতের সময় শীত পড়বে বৈ কি। ফার কোটটা পরে এলে না কেন? ঐ কোটটাতে ভারী সুন্দর মানায় কিন্তু তোমায়!

—আহা যে না বিচ্ছিরি চেহারা, মানায় না হাতী। ঠাট্টা করচ পুষ্করদা' না? বুঝতে পেরেচি।

—ছি ঠাট্টা করব কেন, সত্যিই ভাল মানায় তোমায় ঐ কোটটাতে,—তোমার চেহারাটা কত smart, একটা ছন্দ আছে বলতে গেলে—যাও, নিয়ে এসো ঐ কোটটা।

—না এখন আর বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছে করচে না। চল, এগিয়ে যাই বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

কথা বল্লে শোন না কেন পঞ্চমী—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে।—বাঃ দেখো দেখো কী সুন্দর দেখাচ্চে প্রকৃতিকে—যেন নীরব এক তপস্বিনী বৃদ্ধার মতো শীত মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

—আমিও ঠিক ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি কেড়ে নিলে আমার মুখ থেকে।

—ভালইত হোলো প্রকৃতিকে উপলব্ধি করলুম দু'জনে একই অনুভূতি দিয়ে। উঃ, ক্রমশই শীতটা বাড়চে দেখচি। সত্যি পঞ্চমী এত কথার পরও আমার কথায় এতটুকুও বিশ্বাস হল না, আলোয়ানখানা আটকে রেখে দিলে, অথচ বদলী একখানা দিলেও না। আমার কী শীত করে না?

—এইত নাও না। সত্যি, এখন বুঝচি অন্যায় হয়ে গেছে বটে চাদরটা ফিরিয়ে দিলেই হত। যাক্‌গে আমার এই scurfটা গলার চার পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে নাও।

শুনিয়া পুষ্কর হাসিয়া বাঁচে না। পকেট হইতে সাদা একখানা বড় রুমাল বাহির করিয়া লইয়া সেটিকে মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দুই কানের উপর দিয়া টানিয়া জড়াইয়া লইয়া চিবুকের নীচে দিয়া বেশ টান-টান করিয়া বাঁধিয়া দিল। বলিল, ঠিক আছে, আর কিচ্ছুর দরকার হবে না।

—না না ছি ওটা খুলে ফেল, বিচ্ছিরি দেখাচ্চে, যেন বকাটে ছেলেদের মতো।

—এই নাও scurf টা দিয়ে গলাটা, মাথাটা বেশ করে জড়িয়ে নাও।

—কি যে অরসিকের মতো কথা বল পঞ্চমী,—লোকে দেখলে কী বলবে বলত, আর তারাই বা কী ভাববে।

—ভাবল ত ভারী বয়েই গেল। তাছাড়া রাত্তিরে আবার লোক কোথায়? শোনো এদিকে এস। ঐ ঝাউগাছটার নীচে চল, বলিতে বলিতে নিজের দেহ হইতে স্কার্ফটা উন্মোচন করিয়া লইয়া ও গলার হারের লকেট হইতে সবচেয়ে বড় সেফটিপিনটা এবং সোনার চুড়ি হইতে আরও একটি ছোট সেফটিপিন লইয়া সেদুটিকে দাঁতের সঙ্গে কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়া চাপা ঠোঁটে বলিল, আমার কাছে সরে এসো, বলিয়াই তাহাকে ইতস্ততঃ করিবার সুযোগ না দিয়াই কাছে টানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ করিয়া scurf টা তাহার কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া গলার সঙ্গে জড়াইয়া দিয়া দুই মুখ এক করিয়া লইয়া তাহার আড়ষ্ট দেহের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বড় সেফটিপিনটা আঁটিয়া দিতে লাগিল।

পুষ্কর স্বপ্নাবিষ্টের মতো পঞ্চমীর অস্পষ্ট মুখচ্ছবির প্রতি তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন কী মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

বৌদি দূর হইতে পঞ্চমীর কাণ্ড দেখিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন। তখনোও পর্য্যন্ত ছোটো সেফটিপিনটা আটকানো হয় নাই, একটু বিলম্ব হইতেছে, কেননা আঁধারের মধ্যে সহজে আঙুলগুলি খেলাইয়া কলটায় টীপ দিতে পঞ্চমীর কিছুটা অসুবিধা হইতেছে। অবশ্য টর্চটা জ্বালিয়া লইলেই হইত কিন্তু পঞ্চমী জ্বালাইতে দিল না,—ছি! পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে যে। এমন সময় উত্তর দিকের পথটা ধরিয়া একখানা রিক্সাগাড়ী তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে একটা যায়গায় আসিয়া সহসা থামিয়া গেল।

কৃষ্ণকলি ও সজল দূর হইতে অনুমানে অস্পষ্ট আলোকে পুষ্করকে দেখিতে

পাইয়া আনন্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের উৎকণ্ঠা এক মুহূর্তেই দূর হইয়া গেল,—তাহারা যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। রিক্সাগাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া কৃষ্ণকলি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল,—এক পাও অগ্রসর হইল না।

এদিকে তাহাদের দেখিবামাত্র পুষ্কর একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহটা যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গিয়া নিজের এই অশিষ্টকর অবাঞ্ছনীয় বিলম্বের দরুন ক্ষমা চাইয়া বলিল, ইস্ অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে, ছি ছি এতটা দেরী কখনই হওয়া উচিত হয় নি, মাপ করবেন, সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে!

কৃষ্ণকলি অবিচলিত, শান্ত। তাহার মুখের উপর একটা সরল স্নিগ্ধ হাসির ছায়া প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, না না ও কী বলচেন, মাপ করবো আবার কী। আমাদের ভীষণ ভাবনা হয়েছিল, কি জানি একেবারে অজানা অচেনা যায়গা যদি কিছু বিপদ আপদ হয়ে থাকে পথে। সত্যি আপনাকে দেখতে পেয়ে মনে শান্তি পেলুম আমরা।

সহসা সজল বলিয়া উঠিল, বুঝলেন দিদির ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছল। কৃষ্ণকলি যেন লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। ঝপ করিয়া সজলের পিঠের উপর একটা মৃদু করাঘাত দিয়া বলিয়া উঠিল, দুর্ দুষ্ট ছেলে, বাজে কথা বলচিস্।

পঞ্চমী যদিও একটু দূরেই দাঁড়াইয়াছিল তবুও সজলের কথাগুলি তাহার কানে গেল,—এ যেন একটা অলক্ষ্য হাত তাহার মনের উপর দিয়া হলাহলের একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, আহা দরদী আমার রে, একেবারে সোহাগে ফেটে পড়লেন, এক দিনেই এই! হুঁ ঢঙ দেখলে বাঁচি না।

ইতিমধ্যে বৌদি আগাইয়া আসিয়া সহৃদয় কণ্ঠে বলিলেন, অস্বাভাবিক কিছু নয়, দুশ্চিন্তা হবারই ত কথা—কিন্তু একি এভাবে চলে এলেন কেন দিদি! গায়ে কোনো রকম গরম চাদর নেই। ভাইটিকে সঙ্গে এনেছেন ও বেচারারও গায়ে শুধু একটা গরম সার্ট—দস্তুর মতো শীত পড়েচে।

শুনিয়া সজল বলিয়া উঠিল, না না আমার একটুও শীত করচে না।—আসুন পুষ্করবাবু এই রিক্সাতেই উঠুন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, দিদি আর একটা রিক্সা নিয়ে নেবে।

পুষ্কর গভীর উদ্বেগের সহিত বলিল, উঠছি, কিন্তু তুমি এ কি করেচ, ঠাণ্ডা লেগে শেষে যে তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে! বলিয়া নিজের গলা হইতে scarfটা খুলিয়া লইয়া সজলের কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, তুমি এই গরম চাদরটা গায়ে দিয়ে নাও, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েচে।—দিন তো দিদি, সেফটিপিন দিয়ে বেশ করে এটা আটকে দিন ওর গলার সঙ্গে।

সজল ঘোর আপত্তি জানাইল; কৃষ্ণকলিও বলিয়া উঠিল, না না ও কি করচেন আপনি, কিছু দরকার নেই, ওর এতটুকুও ঠাণ্ডা লাগবে না।

এদিকে পুষ্করের কাণ্ড দেখিয়া বৌদি একেবারে হাঁ হইয়া গেলেন। পুষ্করের সে অনুরোধ ত যেন তিনি মোটেই রাখিলেন না বরং একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, গায়ে ওর তবু যা হক একটা কিছু গরম জামা রয়েছে, শুধু শুধু ওটা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন কেন? তাছাড়া রিক্সায় উঠলে পর ত আর ঠাণ্ডা লাগবে না, ওটা আপনার গায়েই থাক।

পুষ্কর বলিল, না না তাই কী হয়, ছেলেমানুষ শীতে কাঁপচে, ওর দরকার বেশী।

পঞ্চমী মুখখানা বিকৃত করিয়া দূর হইতে ঈষৎ গর্জন করিয়া উঠিল, থাক্ দরকার নেই গায়ে দেবার! বৌদি ওটা নিয়ে এসো ত, দাও ত ওটা আমার হাতে; এসব বাড়াবাড়ি দেখতে ইচ্ছে করে না।

কথাটা শুনিয়া সজল নিজেই বৌদির হাতে সেটি আগাইয়া দিল।

কৃষ্ণকলি এই অতি ক্ষুদ্র অথচ তীব্র তিক্ততা-কঠিন ঘটনাটিকে শুধু একটা নির্মল শান্ত মধুর হাসির আবরণে গূঢ় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দিদি আপনি ঠিকই বলেচেন; তাছাড়া এরা পাড়াগাঁর ছেলে একটুতেই এদের ঠাণ্ডা লাগে না, এরা এত শীত কাতুরে নয়। উনি শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ে পড়েচেন।

বৌদি এবং পঞ্চমীর এইরূপ রূঢ় ও হৃদয়হীন নির্লজ্জ আচরণে পুষ্কর একেবারে থ হইয়া গেল! মুখ দিয়া তাহার কোনো কথাই বাহির হইল না। ধীরে ধীরে হাঁটিয়া গিয়া যেমন সে রিক্সায় উঠিয়া বসিতে যাইবে সেই সময়ে কৃষ্ণকলি একটু হাসিয়া বলিল, সত্যি ঠাণ্ডাটা বেশ জোরই পড়েচে; খালি গায়ে নাই বা এলেন পুষ্করবাবু। আজকের রাতটা বরং এঁদের এখানেই থেকে যান; আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা কেটে গেছে। বলিয়া, বৌদির, মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দিদি, ওনাকে নিয়ে যান সঙ্গে করে, আমরা এতটুকুও কিছু মনে

করব না, কোনো লজ্জা নেই। ওনার ফিরে যেতে কেমন কেমন ঠেকচে বলিয়াই, কৃষ্ণকলি একটা পা রিক্সার উপর উঠাইয়া দিয়াই চড়িয়া বসিবার জন্য উদ্যত হইল।

দারুন হিমের মধ্যেও পুষ্করের সর্ব শরীর ঘর্মসিক্ত হইয়া উঠিল। লজ্জাবনত মুখে ঠিক একটা দারুপুত্তলের ন্যায় সে স্থির হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পদতলের কঠিন মৃত্তিকা যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া ধ্বসিয়া যাইতেছে।

এদিকে পঞ্চমী হঠাৎ আবার ক্রুদ্ধ সর্পিনীর ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকলির কথাগুলি শুনিবামাত্র ক্রোধে তাহার সর্ব শরীর জ্বলিয়া আগুন হইয়া উঠিল; রীতিমতো একটা খোঁচা দিয়া, গলাটা ভারী করিয়া, বৌদিকে ডাকিয়া বলিল, চলে এসো, চলে এসো বৌদি, ওসব ঢঙের কথা, অভিমানের কথা, বলিয়া, কুটিল ভ্রূভঙ্গিমায় পুষ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রূঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এভাবে অজাত কুজাতকে দিয়ে অপমান করাবার কোনো অধিকার নেই তোমার পুষ্করদা! না না দরকার নেই, দরকার নেই তোমার এ বাড়ীতে আসবার। দাঁড়াও, তোমার আলোয়ান আমি এনে দিচ্চি—বৌদি! চাবিটা দাও ত, দাও ত চাবিটা, বলিয়া চাবিটা হাতে লইয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে রিক্সাগাড়ী কেবলমাত্র সেইই দু'টি আরোহীকে লইয়াই আবার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল।

এ যেন গিরিদেহ দীর্ণ হইয়া গেল! যে রুদ্ধ বেদনার সকরুণ জলোচ্ছ্বাস অন্তরের নিভৃত গিরিগুহায় রহিয়া রহিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল তাহা যেন সহসা পরিপূর্ণ বেগে দীর্ণবিদীর্ণ হইয়া সহস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িল—কৃষ্ণকলির দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল নামিয়া আসিল! হিমাচ্ছন্ন স্তব্ধ গভীর রাত্রির আকাশের প্রতিটি নীরব নক্ষত্রের চক্ষু ছাপাইয়াও যেন সে অশ্রু বিগলিত ধারায় ঝরিতে লাগিল।

সজল সকরুণকণ্ঠে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, কী হ'ল রে দিদি, তুই কাঁদচিস্ কেন রে দিদি?

কৃষ্ণকলি অঞ্চলের প্রান্তভাগ দিয়া তাহাকে বেশ ভাল করিয়া জড়াইয়া

লইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না না কাঁদি নি। তোর বড্ড শীত করচে, না রে?

—না না এখন আর শীত করচে না। আচ্ছা দিদি, পুষ্করবাবু ত এলেন না! আহা, ওনার আশার জিনিসগুলো সব পড়ে রইল; ইস্! চপগুলো সব ফেলা যাবে—এত কষ্ট করে তৈরী করলি দিদি আহা রে!

কৃষ্ণকলি চুপ করিয়া রহিল। কী উত্তরই বা সে দিবে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাল সকাল বেলা যখন আসবে তখন ফের তৈরী করে খাওয়াবো।

—হ্যাঁ দিদি তাই করিস্। বেচারা খেতে পেলো না আহা রে। বুঝলি দিদি, আজ রাতে উনি আমায় Robin Hoodএর গল্প বলে শোনাবেন বলেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাহারা বাড়ী পৌঁছিয়া গেল।

পাঁচ

পরের দিন বেলা আটটার পর পুষ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ কৃষ্ণকলির মুখের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া কথা বলিতে তাহার আর সে-মুখ নাই। লজ্জায় তার সমস্ত মুখখানা যেন রক্তাভ হইয়া উঠিল; কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে। বিগত রজনীর সেই জঘন্য লজ্জাকর ঘটনাটার আনুপূর্বিক ইতিহাসটার নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিণতির কথাটা চিন্তা করিতে গেলে মাথাটা যেন তাহার আপনা হইতেই হেঁট হইয়া আসে! তাই কোনো কথা না তুলিয়া সে শুধু অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে কৃষ্ণকলিও গত রাত্রের সে ব্যাপারটার একবর্ণও উত্থাপন না করিয়া স্মিতমুখে বলিল, বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? একটু চা করে নিয়ে আসি।

—বস্‌চি বস্‌চি। এসো সজল এসো। চল চা খেয়ে বেড়াতে যাবো।

—কোথায় যাবেন?

—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। চল গ্রামের ভেতোর দিয়ে বেড়িয়ে আসি।

কৃষ্ণকলি বলিল, তাহলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করচি।

—করুন। আজ রাতের ট্রেনে ফিরব।

—তাহলে ত ভালই, ভাল করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে।—এই নিন্ ধরুন।

—এ কি? সিগারেট কেন? আমার ত আছে।

—তা থাক, ওটা পকেটে রেখে দিন। এটা থেকেই ধরান। কাল রাতের জন্য আনিয়েছিলুম, Gold Flake—এটাই ত খান, না?

—হাঁ। কিন্তু কী দরকার ছিল মিছিমিছি?—বাঃ ভারী সুন্দর গাইচে ত, রামী বুঝি?

—হ্যাঁ রামী। দাঁড়ান ডাকিয়ে আনি ওকে।—সজল, যা ত ওকে ডেকে নিয়ে আয় ত।

সজল ছুটিয়া গিয়া রামীকে ডাকিয়া আনিল।

হঠাৎ পুষ্করকে দেখিয়া প্রথমে সে যেন লজ্জায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সপ্রতিভ করিয়া লইয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কৃষ্ণকলি বলিল, তোর গান শুনবেন বলচেন। একটা ভাল দেখে গান গেয়ে শোনা ওনাকে।

রামী ঠাট্টাচ্ছলে কহিল, কাল রাতে আমার সব খাবার নষ্ট হয়ে গেল, না, আমি গান শোনাব না।

পুষ্কর একটু লজ্জায় পড়িল। হাসিয়া বলিল, কাল খাইনি, আজ খাব।

কৃষ্ণকলি বলিল, আজ খুব ভাল করে রেঁধে খাওয়াবি ওনাকে বুঝলি রামী; আজ রাতের গাড়ীতে যাবেন উনি।

রামী পরিহাসচ্ছলে বলিল, আজ পিড়িং শাক, কলাইএর ডাল, বড়ি পোস্ত, আর মাছের টক দিয়ে ভাত খাওয়াব। বলিয়া, সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পুষ্কর বলিল, বেশ ত, যা দেবে তাই খাব। এখন গান কর শুনি।

রামী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া, সান-বাঁধান রোয়াকের এক কোণে

যে একখানা পুরাতন গালিচা পাতা ছিল তার উপর গিয়া বসিয়া পড়িয়া গান ধরিল,

কণ্টক গাড়ি' কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি'
গাগরি-বারি ঢারি' করি' পিছল
চলত হি অঙ্গুলি চাপি' ॥

পুষ্কর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ চমৎকার! অদ্ভুত গাইচে ত! এমন গান কে শেখালে ওকে?

কৃষ্ণকলি বলিল, বাড়িয়ে বলা নয়, সত্যিই ভাল গায় ও। সে রকম সুযোগ পেলে হয়ত ও একদিন নামকরা Radio-artiste হতে পারে।

—তা পারবে বলে আমার ধারণা। কিন্তু কে শেখালে ওকে এমন সুন্দর করে গাইতে?

—শ্রীখণ্ড থেকে এক বড় বৈষ্ণব গায়ক এসেছিলেন। মামার বিশেষ বন্ধু। তিনিই যা কিছু শিখিয়েচেন ওকে। খুব সুন্দর আথর দিয়ে গাইতে পারে ও। প্রথমে, অবশ্য কোলকাতায় আমার এক বন্ধুর কাছে বছর দুয়েক থেকে শেখে; তার পর নিজে নিজে চর্চ্চা করে।

—তাই নাকি? আথর দিয়ে গাওয়া কিন্তু একটু কঠিন।

কৃষ্ণকলি বলিল, "বন্দে মাতরম্" গানটাও ভাল গাইতে পারে। তাছাড়া গ্রামসেবিকা হিসাবেও ওর অনেক গুণ আছে। যাক আসি, পরে আবার কথা হবে, এখন খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিগে যাই। বলিয়া, রামীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণকলি চলিয়া গেল।

বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত। ট্রেন ধরিবার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বিছানা ইত্যাদি সব কিছুই বাঁধাবাঁধি সাজান-গোছান এক রকম শেষ হইয়া গেছে।

কৃষ্ণকলি আসিয়া বলিল, সুটকেশটা একবার খুলুন ত, এই শিশিগুলো ওতে ভরে দবো।

—ওগুলোতে কী আছে?

—মোরব্বা, আর আছে কতকগুলো লবাত (গোলাকার পাটালি),

অনেক কিছু তরীতরকারীর, এমন কী হরত্যকির পর্যন্ত, মোরব্বা আছে। খেয়ে দেখবেন। বলিয়া সজলকে কাছে ডাকিয়া বলিল, প্রণাম কর এনাকে। দেখাদেখি স্বামীও তাহাকে প্রণাম করিবার জন্য আগাইয়া গেল।

পুষ্কর বাধা দিল,—আরে না না কোনো দরকার নেই, একবার ত হয়েছে আবার কেন সজল ?

সজল শুনিল না, শ্রদ্ধাবনত হইয়া পুষ্করের পায়ে হাত ঠেকাইয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, আবার আসবেন কিন্তু আমাদের দেশে। আচ্ছা, আমাদের দেশ কী রকম লাগল আপনার ?

—অতি সুন্দর লাগল।

কৃষ্ণকলি বলিল, সিউড়ি সহরটা আমার বেশ ভাল লাগে। ছোট বেলায় আমি মামার বাড়ীতেই মানুষ। অবশ্য লেখাপড়া শিখেছি কোল-কাতায় খৃষ্টান মিশন স্কুলে থেকেই। যাক্ সে সব কথা। আপনার খুব কষ্ট হল বোধহয়, দুটো দিন ?

—না না কিছু না। সুন্দর লাগল আপনাদের এই দেশটা। সবচেয়ে আনন্দ হল এই ময়ূরাক্ষী নদী আর তিলপাড়া বাঁধ দেখে, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কী সুন্দর করে গড়ে তুলেচে এই দেশটাকে। একদিকে সহরের সুখসুবিধে, অন্যদিকে আবার গ্রামের পরিবেশ, অদ্ভুত হয়েচে!—আবার আসবো তোমাদের দেশে, বুঝলে সজল। তা তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে দিলে না ত ?

—ঠিক বলেচেন, ঠিক বলেচেন। হাঁ দিদি, ওনাকে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে দিলি না ত ?

কৃষ্ণকলি একটা কাগজের টুকরায় তাহাদের নিজ গ্রামের ঠিকানা লিখিয়া পুষ্করের হাতে দিয়া বলিল, বোলপুর হয়ে বাসে চলে আসবেন, তাহলে সুবিধে হবে। জয়দেব, খাগরা পেরিয়ে সাল নদীর ব্রীজ পার হয়ে এসে নামবেন। নেমে, পশ্চিম দিক ধরে কিছুটা পথ হেঁটে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা আম-তেঁতুলের বাগান দেখতে পাবেন। ওর কাছেই কেঁদুলে বা কেঁদ্‌লো গ্রাম পাবেন, সেখানে যাকেই আমার বাবার নাম জিজ্ঞেস করবেন, সেইই আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেবে। আসবার আগে চিঠি দিয়ে জানিয়ে এলে ভাল হবে।

পুষ্কর সযত্নে কাগজের টুকরাটা মণিব্যাগের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই চিঠি দিয়েই আসব। আচ্ছা, আসি তাহলে।—আসি সজল, বলিয়া রিক্সায় উঠিয়া পড়িল।

ছয়

প্রায় দিন পনর পরের কথা। শীতের প্রভাত।

কৃষ্ণকলি রান্নাঘরের দাওয়ার উপর বসিয়া সজলের জন্য একটা পশমের গেঞ্জী বুনিতেছিল।

সজল আসিয়া বলিল, দিদি আজ বেড়াতে যাবি নি? চল দিদি আজ নদীর ধারে বেড়াতে যাই।

—হ্যাঁ, আজ নদীর ধারেই বেড়াতে যাব। সেই মসজিদটার কাছে যে বড় কয়েদগাছটা আছে আজ ওরই নীচে ব'সে ব'সে বুনতে থাকব।

—তুই ত বুনতে থাকবি দিদি, আর আমি কী করব তাহলে?

—তুই বসে বসে পড়বি।

—কী বই পড়ব বল্?

—স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী।

—কেন গান্ধীজীর? বিনোবাজীর?

—এটা শেষ করে।

—আচ্ছা তাহলে ঐ বইটাই নিয়ে যাই।

—হ্যাঁ নিয়ে নে। কটা বাজে, দেখত?

সজল ঝাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার পড়িবার ঘরে টেবিলের উপর রাখা ছোটো ঘড়িটা দেখিয়া আসিয়া বলিল, আটটা প্রায়।

—চল তাহলে বেরিয়ে পড়ি, বলিয়া, বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুটা পথ নদীর ধার দিয়া দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াই ডাইনে একটা মসজিদ রাখিয়া তাহারা যখন কেরামত আলির খেতের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে হঠাৎ সেই সময়ে তাহাদের বন্ধু বাড়ুজ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

বন্ধু পাশের গ্রামেরই এক যুবক। তার বয়স বেশী নয়—তিরিশের

কিছু ঊর্দ্ধে। বেশ স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ দেহ। প্রিয়দর্শন, পরহিতৈষী, মিত্রলিপ্সু এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবক, সংগঠক, কিন্তু অতিমাত্রায় বিপ্লববাদী। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতিমান ছাত্রও। ফার্ষ্ট ক্লাশএ সম্মানের সহিত এম. এ. পাশ করিবার পর আইন বিদ্যা অধ্যয়নানন্তর কিছুদিন সিউড়ি দেওয়ানী আদালতে যাতায়াত করে। তারপরে আইনব্যবসায় সেরূপ উৎসাহ না পাইয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে—সে আজ প্রায় ছয় সাত বৎসর পূর্বের কথা। কিন্তু রাজনীতি মানেই ত একটা রোগ; এবং এ রোগ যাহাকে একবার আক্রমণ করে সহসা ইহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করা সেই রোগগ্রস্ত মানুষের পক্ষে কতদূর যে দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় তাহা অনুমান করাও কঠিন। বঙ্কুর ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। এখন রাজনীতি করা তাহার কাছে যেন একটা রোগের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হঠাৎ অনেক দিনের পর কৃষ্ণকলিকে দেখিয়া বঙ্কু যেমন অবাক হইয়া গেল তেমন মনে মনে বেশ একটা আনন্দও অনুভব করিতে লাগিল। বড় ভাল লাগিল তাহাকে। হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ওঃ! বহুদিন পরে তোকে দেখলুম, বাবাঃ! আশ্চর্য, চেনবার জো নেই; উঃ কী মোটাই হয়েছিস্, কলি!

কলি হাসিয়া কহিল, মোটা আবার কোনখানটা দেখলে গো বঙ্কুদা', আহা এমন কী মোটা হয়ে গেছি যে একেবারে চেনবার জো নেই!

—না মোটা আবার হস্‌নি। সাত আট বছর আগে যা দেখেছি এখন তার ডবল হয়েছিস্। একবার ওজনটা নিয়ে দেখিস না?

—আহা, কী যে বল বঙ্কুদা'।

—ঠিকই বলি। যাক্, কেমন আছিস্ বল?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

—এইই আছি এক রকম আর কি। কবে এলি?

—এই ত দিন কুড়ি হল এসেছি।

বঙ্কু একটু বিস্ময়ের সহিত কহিল, বলিস কী, প্রায় দু'সপ্তাহ হতে চলল এসেছিস্, অথচ দেখতেই পেলুম না এই ক'দিনের মধ্যে। যাক্, কিছুদিন আছিস্ ত?

—তা আছি। মাস দুয়েক থাকব।

—তাহলে তো দেখা হবে মাঝে মাঝে। ভালই হল। শোন্, তা অনেক দিনের পর আসছিস, দেশের অবস্থা দেখে কী রকম মনে হচ্ছে?

—দেখে ত ভালই মনে হচ্ছে।—তা এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলে? বন্ধু সংক্ষিপ্ত হাসি হাসিয়া বলিল, কাজে ব্যস্ত আছি।

কলি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাজ? তোমার আবার কী কাজ বন্ধুদা'? তুমি ত বি. এল. পাশ করেছ শুনেছিলাম। Practice কর না?

—না। পাশ করার পর বছর দু'য়েক কোর্টে বেরিয়েছিলাম তারপর আর ভাল লাগল না ছেড়ে দিলুম—অতি নোংরা ব্যবসা, মানুষকে হীন করে ফেলে। আইনব্যবসা মানেই মিথ্যার ব্যবসা, চোরামী।

তা যা বলেছ। আমার এক কাকাও ঐ কারণে ও Porfession-এ গেল না। তাহলে আজকাল কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছ?

—সমাজসেবা।

কলি একটু হাসিয়া বলিল, বাবা, খুব বড় কথা বলে ফেল্লে যে। সমাজসেবা তো আজকের দিনে একটা ব্যাপক কথা। কেউবা ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সমাজসেবা করে, কেউবা হাসপাতাল খুলে, কেউবা মিশন প্রতিষ্ঠা করে, আবার কেউবা রাজনীতির সেবার ভেতর দিয়ে সমাজসেবার কাজ করে যেতে চায়। গান্ধীজীর সর্ব্বোদয়-সমাজ গঠন, সেটাও তো একটা সমাজসেবা। তা তোমার সমাজসেবার স্বরূপটা কী?

—এক নিশ্বাসে অনেক কথাই ত বলে গেলি দেখচি। আমার সমাজসেবা সে হল সর্ব্বাঙ্গীন সমাজসেবা। অনেক কথা, এখন আর বেশী কথা বলবার সময় নেই, আর এক সময় হবে। সামনেই জেনারেল ইলেকসন আসছে, জানিস ত? তাই এখন থেকে আস্তে আস্তে কাজ সুরু করবার চেষ্টায় আছি।

কলি পলিটিকস্ করে না তবে পলিটিক্স বুঝিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে অধিগত হইবার জন্য সে আগ্রহটাও তাহার মধ্যে প্রবলভাবে বর্ত্তমান। তাই বন্ধুকে অনুরোধ করিয়া বলিল, দাঁড়াও না একটু বন্ধুদা'। কতদিনের পর দেখা অথচ চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? একটু দাঁড়াও না?

কথাটা যখন তুল্‌লি তখন ব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই রে ভাই। আমি এই

সামনের ইলেকসনে দাঁড়াচ্চি, তাই এখন থেকে তোড়জোড় না করলে পেরে উঠব না। ভীষণ পরিশ্রম করতে হচ্চে, বুঝতেই ত পারচিস্।

—তা তুমি কোন পার্টির টিকিটে দাঁড়াচ্চ ?

বন্ধু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, কোন Party বলে মনে হচ্ছে তোর ?

—তা কী করে বলি, এখনো পর্যন্ত ত তোমার আসল পরিচয়টা পেলুমই না।

—তবুও কোন পার্টি বলে মনে হচ্ছে ?

—কংগ্রেস।

বন্ধু ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, হুঁ, ঠিকই বলেছিস্ বটে। যাক্‌গে এখন চলি, পরে দেখা হবে।

—আঃ, চলে যাবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? কংগ্রেসের ওপর এত রাগ কেন ?

—তুই দেখছি জোর করেই আমায় তর্কে নামাবি, ইচ্ছে নেই, তাছাড়া এখন সময়ও নেই।

—তা হলে কাল সকালে একবার আমাদের বাড়ী এস, বুঝলে।

—সকালে সময় নেই।

—তাহলে সন্ধ্যার সময় এস। বুঝতে পারচি সময় তোমার কম, তবুও একবার আসতে চেষ্টা করো বুঝলে, অনেক দিনের পর দেখা হ'ল।

বন্ধু পরিহাসচ্ছলে বলিল, কেন রে খাওয়াবি নাকি ? না তর্ক ফাঁদবি ?

—সে আর একটা এমন কী কথা নিশ্চয়ই খাওয়াব। তর্ক ফাঁদবো বৈকি।

—না না খাওয়াবার দরকার নেই, দূর্ আমি এমনি বল্লুম। আসব, বলিয়া বন্ধু তাঁতীপাড়ার দিকে চলিয়া গেল।

কেরামত আলের ধারে বসিয়া বসিয়া একখানা বাঁথারি চাঁচিতেছিল, আর মাঝে মাঝে একটা ছোটো হুঁকায় টান্ দিয়া দিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিল। কলির সঙ্গে কথা বলিবার জন্য সে অনেকক্ষণ ধরিয়া উৎসুক হইয়া বসিয়াছিল, শুধু বন্ধুর জন্যই পারে নাই কেননা বন্ধুকে তাহার পছন্দ হয় না। তাই সে চলিয়া গেলে পরে আগাইয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ রে খুকী, কী বলে রে বন্ধুটা ?

—এই সব খবর-টবর নিচ্ছিল, অনেক দিনের পর দেখা কিনা তাই।

—আমি ভাবচি কী তোর কাছে বুঝি বকতিমা ঝাড়চে, মানে আজকাল যাকেই সামনে পাচ্চে তাকেই ও বলচে কিনা তাই—হুঁ, বলিয়া কেরামত নিজের মনে হাসিতে লাগিল।

তাহার ঐ হুঁ, বলিয়া হাসিটুকুর মধ্যে যে কত কথা লুকাইয়া আছে কলি কিন্তু তাহার একবর্ণও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাই তাহার ঐ হাস্যলিপ্ত মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার হাসছ কেন গো কেরামতদা' ? কেন বন্ধুদার কথাগুলো বুঝি তোমার ভাল লাগে না ?

—যত সব ছেলেগুলো। দুদিন দেশ স্বাধীন হতে না হতে সব বড় বড় নেতা বুনে গেছে বাবুরা। হ্যা, সব উগ্রপন্থী সেজে বসে আছে। আমরা জন্ম থেকে কংগ্রেসের নাম শুনে আসচি, কৈ এগুলার নাম ত কখনো শুনি নাই।

কলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ও, বন্ধুদা' বুঝি উগ্রপন্থী আর খুব কথা বলে বেড়ায় তাই বুঝি তুমি হাসছ কেরামতদা ?

বিকৃত মুখভঙ্গীতে কেরামত বলিয়া উঠিল, আর কী বলব বল, ওগুলোর জ্বালায় জ্বালাতন—খালি বলে উগ্রবাদ জিন্দাবাদ। খালি দলে টানবার মতলব, অথচ কাজের নামে ঢু ঢু।

কেরামতদা'র কথাগুলি কলির মনের মধ্যে প্রবল কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল; বড় আনন্দ হইল শুনিয়া। কেরামতদা নামমাত্র-শিক্ষিত ছোটখাট জোতদার হইলেও কংগ্রেসের প্রতি তাহার এই অকৃত্রিম, নির্ম্মল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনুগত্যের স্বীকৃতি লক্ষ্য করিয়া কলি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। ঐ বৃদ্ধের বিচক্ষণতা ও রাজনীতিক অভিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিও তাহার অগাধ শ্রদ্ধা আসিয়া গেল। সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধিকেও সম্মান করি, কেরামতদা'। তোমার কথা শুনে আজ আমার আনন্দ হচ্চে।

কেরামতদা মনে মনে ভারী খুসি হইল কলির কথাগুলি শুনিয়া। সেই খুসির হাসি হাসিয়া বলিল, খালি কংগ্রেসের দোষ দিলে কী হবে বল্! কংগ্রেস সরকার এই পাঁচ-ছ-বছরের মধ্যে যা করেচে তা সব দেখলে চমক লাগে! বলিতে বলিতে ভিতরে ভিতরে হঠাৎ গভীর উত্তেজনা অনুভব করিতে করিতে দুর্দ্দম আবেগের সঙ্গে সে আবার বলিয়া উঠিল, ময়ূরাক্ষীর

বাঁধ দেখেছিস খুকী ? তিলপাড়া বাঁধ দেখেচিস ? চন্দ্রভাগা ? হ্যাঁ খুকী ? কী জিনিষই হয়েছে ! আমি ত একেবারে মুক্ষু নয় রে, না হলে পঞ্চাশ বার কোলকাতা গেছি, বহু লোকের সঙ্গে মিশেচি, বহু জিনিষ দেখেচি। কৈ এমন জিনিস কখনো চোখে পড়ে নাই ! যে জমিগুলাতে কোনো দিন কোনো ফসল হয় নাই আজ সেখানে সোনা ফলচে ! গ্যাখ্ গ্যাখ্ ক্যানালগুলার দিকে তাকিয়ে গ্যাখ। রাস্তাঘাট হঁইচে, এলেকটিক আলো হঁইচে, ম্যালেরিয়া দূর হঁইয়ে গেছে, বুনিয়াদী শিক্ষার স্কুল হল, ঢেঁকী চলচে, চরখা চলচে, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসচে, বোসবে। গ্রামসেবিকারা কাজ করচে। আর কী চাই। জমিদারবংশ ধ্বংস হল, এর পরেও ওরা বলছে কিনা আমাদের ভোট দাও।—কেন, কেন রে বেইমানের জাত তোদের ভোট দিতে যাবো ! হুঁ, আসুক না একবার ভোট চাইতে।

কেরামতদার কথা শুনিয়া কলি হাসিয়া বাঁচে না। ঐ ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের শরীরে যে অত তেজ থাকিতে পারে, এবং সে যে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশে সে হাসিয়া বলিল, ওঃ তুমি দেখচি কেরামতদা কংগ্রেসকে ভীষণ ভালবাসো ! কিন্তু রেগে যাচ্ছ কেন ?

কেরামতদা গর্জ্জিয়া উঠিল, রাগ করবে না ত কী, বলে কী না কংগ্রেস সরকার চোর ! তুই বেটা কোন সাধু রে ? খালি ত চাঁদা তুলে খেয়ে বেড়াস্ আর উগ্রঝণ্ডার দলে ভিড়ে মোড়ল সেজে বসেচিস্।

কলি দেখিল এই বৃদ্ধকে ঠিক এই উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তে কোনোও কিছু যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া বলিতে গেলে বিশেষ কিছুই ফলোদয় হইবে না। কেননা সে তাহার আদর্শের প্রতি এত গভীর ভাবে অনুরক্ত যে, অপর পক্ষের যুক্তিতর্ক তাহার সহ্য হয় না। তাই কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল, তুমি যা বলচ তাও ঠিক, আবার বঙ্কুদা যা বলচে তাও শোনবার কথা ; সুতরাং রাগ ক'রো না কেরামতদা ? যাক ওসব কথা এখন থাক। এখন তোমার নিজের কথা বল শুনি। এবার ফসল পেলে কী রকম বল ?

কেরামতদা একগাল হাসিয়া বলিল, খুব ভাল ফসল পেয়েছি রে খুকী, খুব ভাল পেয়েচি—বিঘেতে দশ মন পেয়েচি। তুই আমার খামার দেখেচিস হ্যাঁ খুকী ? চল দেখিয়ে আনি ?

এখন না পরে দেখে আসবো। রাবেয়াকে আমার কথা ব'লো। শোন কেরামতদা, দলাদলিতে থেকো না।

—মাথা খারাপ! হ্যা, যাদের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া তাদের দলে ভিড়বো ক্ষেপেচিস্ খুকী! চোর যত সব! খালি দল পাকাবে আর চাঁদা তুলে খাবে। যাক কিছু মনে করিস না? বড় বেফাঁস কথা বলে ফেল্লাম।—ঐ পিয়ন আসচে, বোধ করি তোদের চিঠি হবে।

খুবই প্রত্যাশিত চিঠি তাই কলি ও সজল চিঠিখানা পাইয়া একসঙ্গে আনন্দ করিয়া উঠিল। চিঠিখানা কিন্তু সজলেরই নামে, তাই তাহার উল্লাসটা যেন আরও বেশী হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে খামখানা খুলিয়া ফেলিবার জন্য সে খুবই উতলা হইয়া উঠিল। কিন্তু খুলিল না, বলিল, চল্ দিদি! বাড়ী গিয়ে পড়বো।

—কেরামতদা পরে দেখা হবে আবার, আচ্ছা, আসি তা হলে এখন। রাবেয়া ভাল আছে ত? ব'লো ওকে, আসবো এক সময়।

—ভাল আছে। আচ্ছা আসিস এক সময়। বলিয়া, কেরামতদা পুনরায় বাঁখারি লইয়া বসিয়া পড়িল।

ভাই সজল,

তোমাদের ওখান থেকে চলে আসার পর অফিসে কাজের চাপ খুব বেশী পড়ে তাই সময় মতো তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নি। আশা করি তার জন্য কিছু মনে করবে না। হয়ত এতদিন ধরে তোমরা ভেবেছ তোমাদের কথা বোধ হয় আমি ভুলে গেছি, কিন্তু এতটুকুও ভুলি নি। তোমাদের দেশ আমার খুবই ভাল লেগেছে; মাঝে মাঝে মনে হয় দু'চার দিনের জন্য তোমাদের দেশে গিয়ে বেড়িয়ে আসি। ভারী সুন্দর দেশটি। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো কী চমৎকার! এখানে শালবন, ওখানে তালবন, সেখানে আম বাগান। সত্যি কী অপূর্ব দৃশ্য, চোখ জুড়িয়ে যায়। সরু সরু বালিতে ভরা নদীগুলো কূল ছাপিয়ে ওঠা জল নেই, তবুও কী সুন্দর তাদেব চেহারা। নামগুলো তাদের কত মধুর শুনতে—কোপাই, ময়ূরাক্ষী, দারকা,অজয়। আমার খুব ভাল লাগে ঐ নামগুলো। আজ মনে পড়ে বক্রেশ্বর নদীটার কথা। তার সেই শান্ত মূর্তিটা আজও যেন আমার চোখের সামনে ভাসচে। কেমন ছন্দে

ভরা গতি তার ; পাথর কুচি আর মিহিদানার মতো গুড়ি গুড়ি কাঁকরের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে গড়াতে গড়াতে একমনে কত কথা বলতে বলতে চলেছে সে নদী—না মানে কোনো বাধা, না শোনে কারো কথা।

কত বন, উপবন, কত আঁকা-বাকা পথের মধ্যে দিয়ে বাসে চ'ড়ে, পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এসেছি তবুও যেন মনটা বার বার আনচান করে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, যাই চলে যাই ঘুরে আসি তোমাদের গ্রাম থেকে, কিন্তু যা মনে ভাবি তা কাজে করতে পারি না। আমি দিন পনরোর মধ্যেই দু'তিন দিনের জন্য তোমাদের ওখানে নিশ্চয়ই যাবো। দিদিকে ব'ল আমার কথা। তোমাদের রামী কেমন আছে? তার কথা লিখ। সত্যি বেশ মেয়েটী, ভারি সুন্দর নামটি তার। সাঁওতালদের মেয়ে এত হাস্যরস পটু দেখে খুবই আনন্দ হয়েছিল। কেমন সুন্দর কথা বলতে পারে। বড় লাজুক কিন্তু।

দিদিকে ব'লো তাঁর দেওয়া মোরব্বাগুলো রোজই একটু একটু করে খাই! যখনই খাই তখনই তাঁর কথা মনে পড়ে। বেশ জিনিস। লবাতগুলো বেশ লাগলো।

তুমি কখনো কোলকাতা দেখনি, দেখবার তোমার বড় সখ। এবার তোমায় কোলকাতা নিয়ে আসবো। আসবে ত?

খুব লম্বা চিঠি হয়ে গেল আর বেশী লিখব না। আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক স্নেহ নিও।

তোমাদের পুষ্করবাবু

চিঠি পড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সজল দিদিকে জড়াইয়া আবদার করিয়া বলিল, দিদি, দিদি এবার কিন্তু আমি পুষ্করবাবুর সঙ্গে কলকাতায় যাবো. হ্যাঁ বলে দিচ্ছি। যেতে দিবি আমায়, হ্যাঁ দিদি যেতে দিবি ত?

দিদি হাসিয়া বলিল, আগে আসুক তারপর ত। দেখবি হয়ত আসবেই না, লিখবে, সময় হচ্ছে না।

—আচ্ছা যদি আসেন তাহলে যেতে দিবি ত?

—হ্যাঁ দোবো, দোবো, বলিয়া কৃষ্ণকলি চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া নিজেই আবার একবার মনে মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রতিটি অক্ষরের ছবির ভিতর দিয়া পুষ্করের স্নিগ্ধময় মুখের ছবিখানা যেন বার বার তাহার

চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে—কত আনন্দ! কত ভাল লাগে পড়িতে! ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া একখানা কুলো হাতে লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ার উপর গিয়া বসিয়া পড়িয়া চাল ঝাড়িতে লাগিল।

সাত

পরের দিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় কলি বারবাড়ীর একটা ঘরের মেঝের উপর শতরঞ্চী পাতিয়া বসিয়া চরখায় সুত কাটিয়া যাইতেছে, আর মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতেছে,

আগুনের পরশ মণি
ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর
দহন দানে।

সজল পাশের ঘরে পালঙ্কের উপর বসিয়া একখানা পশমী চাদর গায় জড়াইয়া লইয়া সুনীতি চাটুর্য্যের বাঙলা ব্যাকরণ খুলিয়া হেলিয় হেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া অল্প অল্প চীৎকার করিয়া করিয়া ষত্ববিধানের সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছে।

বন্ধুর ঠিক আজ এই সময় আসিবার কথা ছিল। সে আসিয়াও গেছে, কিন্তু সদর দরজার কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল,— সঙ্গীতের ঐ মধুর রাগিনী তাহার হৃদয়বীণার অলক্ষ্য তন্ত্রীটায় সহসা যেন নিঃশব্দে আঘাত দিয়া এক অননুভূত মিড়ের শিহরণ তুলিয়া তাহাকে এক অতীন্দ্রিয় মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন করিরা ফেলিল। নিশ্চলের মতো দরজার মুখে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া সে গভীর ভাববিহ্বলতার সহিত গানটা শুনিয়া যাইতে লাগিল। পাছে লজ্জা পাইয়া গাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এই মনে করিয়া, সে নিজেকে খানিকক্ষণ ঠিক ঐভাবে দরজার পাশে আড়াল করিয়া রাখিল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ চমৎকার! কী অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর! কী মধুর রাগিনী! না, না, ভিতরে সে এখন কিছুতেই ঢুকিবে না,—হয়ত তাহাকে দেখিয়া কতই না সে লজ্জা পাইবে। আবার ভাবিল, আচম্বিতে সোজা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পড়িয়া প্রশস্তি করিয়া বলে, বাঃ সুন্দর গাচ্ছিস, এত

সুন্দর তুই গাইতে পারিস্ কলি? জানতুম না ত। কিন্তু পারিল না—যেমন দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই গান থামিয়া আসিল।

বন্ধু এইবার দরজাটা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া কলির একেবারে সুমুখে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

কলি শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িয়া একটা বাঁশের মোড়া আগাইয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল, একটু আগে আগেই এসেছো বন্ধুদা, যাক ভালই হয়েচে, বসো? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জুতোজোড়া খুলে ভাল করে আরাম করে বসো।

বন্ধু জুতোজোড়া খুলিয়া লইয়া দাওয়ায় উঠিতে সিঁড়িটার এক পাশে রাখিয়া দিয়া মোড়াটা টানিয়া লইয়া বসিল। হঠাৎ চরখাটা বন্ধুর নজরে পড়িতেই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, এ কী ব্যাপার, চরখা?

কলি স্মিতমুখে বলিল, কেন থাকতে নেই?

বন্ধু বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, না তা নয়, হঠাৎ দেখচি কিনা তাই, আগে কোনো দিন ত দেখিনি তোদের বাড়িতে। অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কলি বলিল, তা অবাক হবারই কথা বটে। ভাবচ বুঝি বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি, না? তাইত, এটা আবার কী হল?

—তা ছাড়া আবার কী।

—কেন?

—দেখলেও হাসি পায়, বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত।

—কেন, কী কারণে?

বাড়াবাড়ি নয় ত কী?—মনে হয় আমরা অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি। ও সব গোরুর গাড়ী আর পাল্কীর যুগে চলত, এ যুগে একেবারেই অচল।

কলি স্মিতমুখে বলিল, না, একথা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করা যায় না বন্ধুদা।

—অত্যন্ত অলস নিস্পৃহ মনের পরিচয় দিচ্চিস্। অদ্ভুত, হাসি ও পায় দেখে।

—না এতটুকুও নয। এর পিছনে যে ফিলসফি আছে তা তুমি জান না বড়দা'।

—ওসব ফিলসফি এখন রেখে দে তোর, ওসব শোনা মানে নিজের বুদ্ধির গালে চড় মারা। যাক্, ওকথা তুলেই ভুল করেছি এখন, নিজের কথাই বলা ভাল ছিল। —কী খবর বল ?

—কেন শোনো না নয় একটু ধৈর্য্য ধরে, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। তোমার নিজের কথা ত শুনবই পরে। এই চরখার ফিলসফি সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখো না ক্ষতিটা কী। এত পুরোনো জিনিস, বলতে গেলে মানব সভ্যতার প্রথম অভিজ্ঞান, প্রথম বিস্ময়ের এই যে বস্তুটি একে আজও ভাল লাগে কেন জান ? এর পেছনে যে মস্ত বড় একটা ফিলসফি রয়েচে।

বন্ধু পরিহাসচ্ছলে বলিল, থাক আর ফিলসফির দরকার নেই, অনেক শুনেচি। ওসব কথা থাক এখন—তুলেই ভুল করেচি—অন্য কথা বল শুনি।

"I think of the poor of India everytime I draw a thread on the wheel" বলেছেন গান্ধীজী, জান।

বন্ধু সহসা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, অত্যন্ত পচ-ধরা মন তোর, তোর চিন্তাশক্তিকে এতটা পঙ্গু করে ফেলেছিস তুই জানতুম না। ওসব তিরিশ বছর আগেকার কথা বলচিস। ধনী দরিদ্র সমাজে আমরা রাখব না। যাক্, অন্য কথা বল শুনি।

কলি মৃদুমৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আজকের মতো স্থগিত রইল এ আলোচনা। এখন বল তোমার নিজের কী কথা আছে। —কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল বলত ?

—ওঃ বাবা, সে কী আজকের কথা—বছর দশেক হবে।

—না না অত হবে কী করে ? বছর আষ্টেক হবে—আমার তখন বোধ হয় সেকেণ্ড ইয়ার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেচিস্, হ্যাঁ মনে পড়েচে বটে, আমারও তখন বোধ হয় Law final year. হার্ডিঞ্জ হষ্টেলের সামনে তোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হল। তোর হষ্টেলেও আমায় একবার যেতে বলেছিলি। 1st January আমাকে invite ও করেছিলি। কী বল, তাইত ?

—এই ত সবই ত তোমার মনে আছে দেখচি। আমায় একখানা Inductive Logicও যোগাড় করে দিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে সেদিন অমৃশ্রীও ত

ছিল। রাশিয়ার পোকা মাথায় নিয়ে ঘুরচে ও তখন থেকেই। কী, মনে পড়েচে এখন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়বে না কেন, খুব মনে পড়েচে।

—আচ্ছা, অম্বুশ্রীর খবর কী ?

—ওর জন্তই ত পরে আর তোর সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না।

কলি একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, তা আমি বুঝেছিলাম সেদিনকার ওর কথা বলার ভঙ্গী থেকে। অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে।—আচ্ছা ওর বিয়ে হয়ে গেছে ?

হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া বেদনার তীক্ষ্ণ আঘাতে বন্ধুর বুকের ভিতরটা যেন নিশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাক্‌গে এখন অন্য কথা বল—কিছু দিন আছিস ত এখানে ?

—হ্যাঁ, তা আছি।

—যাক্ ভাল হয়েছে, আমার অনেক সুবিধে হবে।—তা চাকরী করচিস্ কদ্দিন ?

—এই বছর পাঁচেক হল প্রায়।

—ভালই। চাকরী করতে করতে হঠাৎ এটা আবার কী খেয়াল হল শুনি ?

—আঃ থাক না ওসব কথা এখন।

—কেন থাকবে কেন ?—গান্ধীমার্কা Politics—Insufferable non-sense! অসহ্য!

—সে তুমি যাই বল আমার কিন্তু ভালই লাগে। তবে এটা কিন্তু আমার রাজনীতি নয়।

—তবে এটা কী ?

—তর্কের বিষয়। তবুও বলি—আমার এ Politics দলীয় স্বার্থের বিষে জরানো নয়, অর্থাৎ ক্ষমতা লোলুপতার দুর্ধর্ষ দ্বন্দের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বন্ধু বিস্মিত হইয়া বলিল, তার মানে ?

কলি ধীরকণ্ঠে বলিল, তার মানে আর কিছু নয়, এখনকার রাজনীতি হয়েচে অর্থনীতির গোলাম, তাই সেই ধরণের রাজনীতি নিয়ে একটু আধটু লেগে থাকবার চেষ্টা করচি।

—এসব বদ বুদ্ধি কোথা থেকে ঢুকল তোর মাথায় শুনি?

—কেন, আমার মনে হয়, এটাই ত হল সুবুদ্ধি।

—বলতে এতটুকুও বাধল না। একে ত আমরা কুড়ের জাত, তার ওপর আরও কুড়ে তৈরী করার কল তৈরী হয়েচে। এসব অর্থনীতি আজকের দিনে অচল।

—ভুল বলচ বন্ধুদা'। ঠিক উল্টো কথাটা বল্লে। আবার বলি, গান্ধীজী কী বলেছেন জান—"It is the centre round which alone it is possible to build up village reorganisation" গ্রাম পুনর্গঠনের এটাই হল একটা মস্ত বড় প্রাণশক্তি।

বন্ধুর বিপ্লবধর্ম্মী মন অকস্মাৎ ভিতর হইতে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, বলিল, এই বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে ওসব পুরণো জিনিস নিয়ে রোমন্থন করে আত্মতৃপ্তির দিন ফুরিয়ে এসেচে। পুরো উদ্যমে কাজ করে যেতে হবে আমাদের, আমরা চাই কাজ। এই যে যন্ত্রটি এটা হল অলসতার মূর্ত্ত প্রতীক। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, কেবল কাজ করে যেতে হবে! সেটা করতে পারচি না বলেই আজ আমরা অন্য দেশের তুলনায় পেছনে পড়ে আছি। আমরা চাই সব দিক দিয়ে বিপ্লব!

কলি পূর্ব্বের ন্যায় ধীরকণ্ঠে বলিল, বিপ্লব মনে করলেই কী আর বিপ্লব আনা যায় বন্ধুদা'? এ হল স্বতঃস্ফূর্ত্ত জিনিস, একে মানবমনের নির্জীব দেহটার ওপর বেপরোয়া উন্মাদনার অঙ্কুশ আঘাতের দ্বারা জাগিয়ে তোলা দুঃসাধ্য; ইতিহাসের ধারাও তা নয়। বিপ্লবের অন্তর্নিহিত শক্তি, সে হল উপচিত শক্তি—নিপীড়িত মানুষের যুগ যুগান্তরের সাধনার প্রতীক। তাকে রাতারাতি কী করে রূপ দিতে পার বলত? তুমি যা চাইচ তা তুমি সহজে পাবে না বন্ধুদা'। অন্য দেশকে নকল করতে যাওয়াও ভুল হবে। আড়াই হাজার বছরের উত্থান পতনের ইতিহাসের ভেতোর দিয়ে যে মনের চার আনা পরিমাণও পরিবর্ত্তন হয়নি, সেই মনকে তুমি মাত্র কয়েক বছরের বিজ্ঞান-বিধর্ম্মী গণ-আন্দোলনের উন্মত্ততার ছাঁচে ফেলে নোতুন করে গড়ে তুলবে? —কল্পনাবিলাসের কথা। যাক্‌গে, এখন এসব দুরূহ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাক। তর্কে তর্ক বেড়ে যায়।—কৈ অণুশ্রীর কথা আর তুললে না যে?

—তোলবার মতো নয়, তাই তুললুম না।

কলি সংক্ষিপ্ত হাসি হাসিয়া বলিল, সেটা আমি আগে থেকেই টের পেয়েছিলাম। তুমি একটুতেই একেবারে অভিমান করে বস কি না।

—এই অভিমানটুকু ছিল বলেই সেদিন ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে নিজের মান বাঁচিয়ে চলে এসেছি।

—সত্যি দুঃখ হয় দেখে, কী করে তুমি অত বড় একটা আঘাত সহ্য করলে?

বন্ধু কঠিন স্বরে বলিল, এতটুকুও আঘাত পাইনি বরং ও পেয়েচে।

—কী করে বুঝলে?

—বুঝলুম ওর বিবাহিত জীবনের···যাক্‌গে, ওসব কথা না তোলাই ভাল। একটু চা নিয়ে আয়।

কলির প্রবল কৌতূহল জাগিল। হাসিয়া বলিল, যাক্‌গে কেন, আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করচে, কী বলতে যাচ্ছিলে বল না শুনি, লজ্জা করচো কেন?

—কী আর শুনবি। অত্যন্ত···না, এ কথা আমি তোকে কিছুতেই বলতে পারি না।

—আঃ লজ্জা কর কেন, বলেই ফেল না বাবা।

—বলতে পারি, তোর কাছে আর আমার লজ্জাই বা কী। তাছাড়া লজ্জা করাটাও ভুল।

—তাইত আমি ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্চি, আমার কাছে আবার তোমার লজ্জা কিসের।

—কিছুই নয়, তবুও যেন বাধচে,—অণু বলে ও ভুল করেচে, ওকে ক্ষমা করতে হবে। আশ্চর্য, কত চিঠি যে ও লিখলো বিয়ের পর থেকে কী আর বলব। আজ পর্যন্ত একটারও জবাব দিই নি, অবশ্য অনেকদিন হয়ে গেছে। যাক্, বেঁচে গেছি, মরুগগে, বলিয়া মুখভঙ্গীটা বিকৃত করিয়া ফেলিল।

—না, এটা তুমি কিন্তু খুবই অন্যায় করেচো।

—অন্যায়?

—হ্যাঁ অন্যায়। তুমি কী নিষ্ঠুর, আশ্চর্য! মেয়েরা এ রকম ক্ষমা চাইতেই পারে। তাদের ক্ষমা করা উচিতও।

—বিয়ের পর আর তাদের ক্ষমা করা চলে না।

—তাই যদি বল তাহলে বিয়ের আগেও চলে না।

—সেটা তবু সম্ভব, পরে একেবারেই নয়। তাছাড়া বড় কথা হল এই, তাকে যদি তখন ক্ষমা করতুম তাহলে আমি বেঁচে থেকেও মরে থাকতুম—এ ভালই হয়েছে।

—ক্ষতি৷ ছিল কি? ভালই ত হত—শুধু শুধু পাঁচজনের বোঝা বইতে হত না।

—তবুও এতে আনন্দ বেশী,—আজ আমি মৃত্যুকে চোখ রাঙিয়ে বেঁচে আছি।

—কিন্তু জীবনটা যে মাটি হয়ে গেল অণুর।

—তা হকৃগে। তোর যত বাজে কথা। মেয়েরা মাটি হতেই চায়, পুরুষকেও মাটি করে।—যাক্, এখন কাজের কথা বল শুনি।

—পুরুষের দুর্বলতা সেটা।—আচ্ছা একটু বসো ততক্ষণ, চা নিয়ে আসি। বলিয়া, কলি গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে এক কাপ চা এবং সঙ্গে কিছুটা তেল লবণ মাখান মুড়ি ও কয়েকখানা বেগুনি একটা রেকাবীতে করিয়া লইয়া আসিয়া বলিল, যে পথ নিয়েছ সে পথ ছেড়ে দাও বঙ্কুদা'। অন্য পথে এসো, আমি তোমার কাজে সাহায্য করব। এসো এক সঙ্গে কাজ করি।

তাহার কথায় অপ্রত্যাশিত উৎসাহ পাইয়া বঙ্কু উৎফুল্ল চিত্তে বলিয়া উঠিল, সত্যিই কী তুই আমার কাজে সাহায্য করবি কলি? আজ যদি তুই আমার পাশে এসে দাঁড়াস্ তাহলে আমি অসাধ্যও সাধন করতে পারি। I'm ambitious!

কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝ না বঙ্কুদা'। আমি যা বলতে চাইচি তা অতি সোজা জিনিস। তুমি যা চাইচ আমিও তাই চাইচি। লক্ষ্যটা দু'জনের একই, পথটা কিন্তু ভিন্ন। নিগৃহীত, প্রতারিত, বঞ্চিত মানুষের দুঃখ দূর করা আমারও কাম্য, কিন্তু তাই বলে ধার-করা বুদ্ধি এবং পদ্ধতিটা নিয়ে নিজের বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তিকে কলুষিত করো না। জীবনে যা সত্য বলে অনুভব করেচি, এবং আজও করচি, সেটাই তোমার বুদ্ধিবৃত্তির সামনে উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা করছি। আমি আবার বলছি, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াব, এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করব না; কিন্তু আমার দুঃখ এই, তোমার দেশের মানুষই তোমার

পাশে এসে দাঁড়াবে না, কেন না স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তি তারা কোনো দিনও পায় নি। পাবেই বা কী করে বল? ধনী এবং দরিদ্র এ দু'য়ের মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ইংরেজ শাসক ধীরে ধীরে দেড়শ' বছরের তাদের ঐন্দ্রজালিক শাসনের কায়দা কারসাজির ধোঁয়ায় ধূমায়িত করে রেখেছিল, আজও সে ধোঁয়া তেমন ভাবে অপসৃত হবার পরিস্থিতি গড়ে ওঠেনি। তাই প্রচলিত ও স্বীকৃত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তারা অক্ষম। এবং তা করতে যাওয়াও ভুল।

বন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ সব হল তোরdefeatist mentalityর কথা। এ তোর সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কলি—এ হল আতঙ্কের কথা। জার-এর অত্যাচারকে যদি রাশিয়ার পদদলিত মানবসমাজ কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে তুলতে সক্ষম হতে পারে তবে আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে এমন কিছু সময় লাগবে না। প্রথম ইলেকসনের ভেতর দিয়েই এর কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদি একবার এদের জীবনে স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে আর কোনো সংশয় আসবে না।

কলি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, উত্তেজিত হ'য়ো না বন্ধুদা'। তাহলে একটা কথা বলি, লেনিন বা ষ্ট্যালিনের মতো শক্তি নিয়ে এদেশে কটা লোক জন্মেচে বল? তবুও এই পরাধীন দেশে লেলিনের মতো শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন গান্ধীজী এবং তার আগে প্রকৃত বিপ্লবীর ধী, প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি নিয়ে ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, আর বিদ্যাসাগর। এঁরা দুজন রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নি বলেই তাই এঁদের কূটবুদ্ধির পরিচয় আমরা পাই নি। প্রবেশ করলে হয়ত নিশ্চয়ই পেতুম। তাঁদেরই তিন জনের সেই অমোঘ বিপ্লবধর্ম্মী শক্তির স্পন্দনটুকু আজও জাতির প্রাণশক্তিতে অনুভব করা যাচ্ছে। তোমরা সেই স্পন্দনটুকু ভাঙ্গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করচ। চরখা, খাদি এবং আইন-অমান্য আন্দোলন-এর পটভূমিকায় যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্পন্দনের সজীব মূর্ত্তিটি গান্ধীজী নিজের সক্রিয় সত্তার অক্ষয় তুলির সাহায্যে এঁকে গেছেন আজও তা বলতে গেলে অমলিন হয়ে আছে। অহিংসার মন্ত্র, সত্যাগ্রহের সফলতা, আজও অজেয়।

বন্ধু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দোহাই ও গান্ধী নামটা আর করিস না; লেনিনের নামটা শতবার কর, তাতে এতটুকুও বিরক্ত হব না,

যাক্, আমি বুঝতে পারচি তোর সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না। এখন সোজা কথাটা যা বলি, আমি যা চাই—এই ইলেকসনে আমাকে তোর সাহায্য করতেই হবে। আমি নিজে থেকেই তোর কাছে আসতুম। যাক্ নিজে থেকে যখন আসতে বলেছিলি, ভালই হয়েচে। আমি জানতুম তুই ছাত্র জীবন থেকেই পলিটিকস্ নিয়ে কিছু কিছু চর্চ্চা করতিস, এবং সেই জন্যই তোর ওপর আমার যথেষ্ট ভরসা।

কলি হাসিয়া বলিল, শোনো বন্ধুদা, অনেক দিনের পর দেখা তোমার সঙ্গে, সুতরাং এসব নিরস বিষয়গুলো নিয়ে শুধু শুধু আলোচনা করে কথা কাটাকাটি আর উত্তেজনার সৃষ্টি করে কোনো লাভ নেই বরং এসো দুটো চারটে হালকা কথা বল, শুনি।—আচ্ছা ধর, অণুশ্রী হঠাৎ উগ্রপন্থী হয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা নাম করতে সুরু করেচে—জানই ত ওর মাথার মধ্যে রাশিয়া আর চীনের সাম্যবাদের আলোহাওলা, নির্বোধ, রাতের পোকাগুলো অনেকদিনই ঢুকে বসে আছে—মাসের মধ্যে পনেরো দিনই উগ্রপন্থী কাগজগুলোতে বড় বড় অক্ষরে ওর নাম বেরোচ্চে, নানা যায়গা থেকে সম্মান সম্বর্দ্ধনা পাচ্চে ; পাঁচজন জ্ঞানী, গুণী, নীরব, মুখর প্রেমিকের দল ওর ঐ ছন্দেভরা দেহলাবণ্যের প্রশংসা করে যাচ্চে। সেই সব দেখে শুনে তোমার মনটায় কী আঁচড় খাবে না ?

বন্ধু অম্লান মুখে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, শিলাগাত্রে নখের আঁচড়।

কলি স্মিতমুখে বলিল, এ্যাটমিক এনারজি যে ওর মধ্যে কত প্রবল তা তুমি নিশ্চয়ই জান—শুধু আঁচড়ে নয়, পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিতে পারে এমনও সর্বধ্বংসী শক্তি অনেক নারীর মধ্যে আছে।

বন্ধু হাস্তমুখে বলিল, anti-atomic energy আমার মধ্যে যে কত প্রবল সেটা ও খুবই জানতে পেরেচে। যাগ্‌গে, ওসব পুরনো কথা ছাড় এখন।

—আহা অণুকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কোথায় থাকে গো, ও ? ওর স্বামী কী করে ?

—ইলেকট্রিক্যাল এন্‌জিনিয়র।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয় ?

—কী করে হবে ? সে ত থাকে বোখারোয়—D.V.C.র এন্‌জিনিয়র। থাক্, চাপা দে ওসব কথা।—কটা বাজে দেখ ত ? আর বকবো না।

কলি সজলের ঘরের দিখে মুখটা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কটা বাজে দ্যাখ ত রে সজল ?

সজল তাহার পড়িবার টেবিলের উপরস্থিত ছোটো টাইমপিস্‌টার দিকে তাকাইয়া বলিল, আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

—ওরে বাবা, আটটে বাজতে পাঁচ ! না আর বসবো না। উঠলুম, আর নয়, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলি দাওয়ার উপর হইতে লণ্ঠনটা ডান হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া সদর দরজা পার হইয়া গিয়া বলিল, চল তোমাকে ঐ বাঁশ ঝাড়টা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি বন্ধুদা, অনেকদিন ত এ পথে আসনি, অসুবিধে হবে। বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

অনর্গল তর্ক বিতর্কের পর এই লঘু সময়টুকু বন্ধুর বড় ভাল লাগিল। পথ চলিতে চলিতে কত কথাই না তাহার মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া উঠিতে লাগিল,—কলি, সত্যি কী সুন্দর মেয়ে !

কলি বড় তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি আসিয়া বলিল, শোনো বন্ধুদা', লণ্ঠনটা বরং তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও, বুঝলে। বাগ্দীদের কালো কুকুরটা যখন তখন রাস্তার ওপর শুয়ে থাকে—তাই বলছিলাম, আলোটা নিয়ে যাও সঙ্গে করে।

—না, না কিছু দরকার নেই, নিয়ে গেলে, তুই যাবি কী করে ? তোর অসুবিধে হবে না ? না, তোর কষ্ট হবে আমার নিজের জন্য আমি কোনো দিনই ভাবি না।

—না না কিছু হবে না, আমার অভ্যাস আছে, তুমি নিয়ে যাও আলোটা এই নাও, বলিয়া, লণ্ঠনের ডাটিটা তাহার হাতের মধ্যে ধরাইয়া দিল।

—বন্ধু লণ্ঠনটা বাঁ-হাতে করিয়া ধরিয়া লইয়া অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া কী যেন একটা কথা বলিবার জন্য ইতস্তত করিতে লাগিল।

কলি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, কী গো কী ভাবছ ? ভয় করচে বুঝি ? পরিহাসচ্ছলে বলিল, এই তেঁতুল গাছটায় কিন্তু একটা ভূত আছে।

—দুষ্টুমি হচ্ছে, না ?

—আহা, দুষ্টুমি আবার কী। আচ্ছা, চল চল আর একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

বন্ধু কেমন যেন একটা বিহ্বলদৃষ্টিতে কলির স্নিগ্ধ হাসিমাখা স্বল্পালোক-লিপ্ত মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, না থাক, আর এগোতে হবে না, ঠিক চলে যাব।

—তাহলে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? কী ভাবচ বলত? কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে।

—না, এমনি দাঁড়িয়ে পড়লুম।—সত্যি তুই এত সুন্দর গাইতে পারিস্! ভারী সুন্দর গেয়েছিস্ কিন্তু! আর একদিন শোনাস্।

—হা হরি! এই কথাটা বলবার জন্য এত hesitate করচ? হাসিয়া বলিল, কী দুষ্টু বাবা, আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনে আবার বলা হচ্ছে, আর একদিন শোনাস্। গান শুনবে ভারী কথা। তা আজকেই ত শুনতে পারতে—সোজা এসে বল্লেই হত।

—ভাবলুম পাছে যদি লজ্জা পেয়ে, না, বলিস্।

—না না এতে আমার এতটুকুও লজ্জা নেই। আমি আসরে বসেও গেয়েছি।—চল, আর একটু এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।

—কিছু দরকার নেই, আর এগোতে হবে না, যা এবার ফিরে যা। বলিয়া আর সে একমূহূর্ত্তও দাঁড়াইল না, হাঁটিয়া চলিল।

আট

নির্ব্বাচন—তাই আজ গ্রামে গ্রামে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ দুই শক্তির সংগ্রাম—এক দিকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর একক শক্তি; অপর দিকে বিভিন্ন উগ্রপন্থীদের সংঙ্ঘবদ্ধ শক্তি; সুতরাং এই আসন্ন নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার ইহাই একটা বিশিষ্ট রূপ। আজ উভয় পক্ষেরই সমর্থকগণ হাটে-মাঠে-ঘাটে, চা পান-বিড়ির দোকানে, তাশ-পাশা-দাবা, থিয়েটার ক্লাবের আড্ডায়, অফিসে, আদালতে বসিয়া অসংযত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া রীতিমতো নির্বাচনের হাওয়া গরম করিতে সুরু করিয়াছে।

শক্তিপদ এক জন কংগ্রেস সমর্থক। সেদিন সে তিনু মাষ্টারের চায়ের দোকানের ভিতর পশ্চিম দিকের দেওয়ালের এক প্রান্তে পাতা নড়বড়ে সরু

বেঞ্চটার উপর বসিয়া চুমুক দিয়া দিয়া ও থাকিয়া থাকিয়া অত্যুষ্ণ চায়ের উপর ফুঁ লাগাইয়া লাগাইয়া ধীরে ধীরে চা পান করিয়া যাইতেছিল, আর তর্কের মাঝে-মাঝে তর্জন করিয়া উঠিতেছিল।

বিলয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, রাখো তোমার কংগ্রেস! আজ দশ বছর দেশের শাসন ভার হাতে নিয়ে তারা যা করেচে তা আর দেশের লোকের জানতে কিছু বাকি নেই—শুধু জনসাধারণের দুঃখ দারিদ্রের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে, আর নিজেদের পেট পুরিয়েচে, এই ত। থামো! আর কথা বলো না!

শক্তিপদ চোঁ-চোঁ করিয়া বড় বড় চুমুক দিয়া কাপের সমস্ত চা'টুকু মুহূর্ত্তকাল মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া বলিল, দ্যাখ বিলয়, যুক্তিহীন কথা বলিস্ না, বুঝলি। democray অর্থাৎ গণতন্ত্রের মানে যদি কিছু বুঝতিস তাহলে একথা বলতিস্ না। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার দিয়েছে কে?—এই কংগ্রেস! আজ যার একটা ভোটও আছে, সেও তার নিজের মূল্য ধরে নিতে শিখেচে, বুঝতে শিখেছে, বুঝলি। এবং এই যে বোধশক্তি, এটা এনে দিয়েছে কে? গণ-চেতনাকে সক্রিয় ক'রে রেখেছে কে?—এই কংগ্রেস! আজ লাফালাফি করচিস্ ত ওরই জোরে। আজকের দিনে একটা ভোটের অধিকার পাওয়া মানে—গর্ব্বের বস্তু।

ওটা জুচ্চুরির ফিকির।

—বটে। করিস ত মাষ্টারী, বিদ্যের দৌড় ত জানাই আছে। ভাবলি বুঝি খুব একটা বড় কথা বলে ফেল্লুম।

বিলয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ভাঙ্গা টেবিলটার উপর দুম করিয়া একটা ঘুষি মারিয়া বলিয়া উঠিল, বুঝি কী, না বুঝি এই সামনের ইলেকসনেই টেরটা পাইয়ে দেবো। এই adult suffrage যদি না থাকত তাহলে দেখতুম চোরা কংগ্রেস কী করে ভোট আদায় করে। অবশ্য তোমরা যতই ফিকির ফন্দী কর না কেন বন্ধুকে কিছুতেই হারাতে পারবে না, শক্তিদা'। আমরা ধপ্পাবাজি করে কখনো ভোট আদায় করি না, বা করবও না।

শক্তিপদ একটু উত্তেজনার সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আর কথা বলতে হবে না চুপ কর্! চুপ কর্! এই যে আজ তোরা বুকে এত বল পাচ্চিস এটা অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ আছে বলেই।

বিলয় ঔদ্ধত্যের সহিত বলিয়া উঠিল, কেন চুপ করব ! মোটেই চুপ করব না ! সত্যি কথা বলব তার ভয়টা কিসের। এত সেরেফ সমাজের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি চলেচে।

—ত্যাথ বিলয়, ধাপ্পাবাজি কংগ্রেস কখনই করে না। কংগ্রেস যা মুখে বলে তারা তা কাজেও করে। তোদের মতো নয় যে এক ফোঁটা ক্ষমতা হাতে নেই অথচ লম্বা চওড়া কথা আছে,—যেন ভারতে ওনারাই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কংগ্রেস কথা দিলে সে কথা তারা রাখতে পারে, কেন না শক্তি তাদেরই হাতে, তাছাড়া অর্থবল তাদেরই, সঙ্গে সঙ্গে জনবলও তাদের আয়ত্তে। যারা নিঃস্ব তাদের প্রতিশ্রুতি দেবারও যেমন ক্ষমতা নেই, তেমন তাদের সে প্রতিশ্রুতিতে কেউ বিশ্বাসও করে না।

বিলয় গর্জন করিয়া উঠিল, ত্যাখো শক্তিদা', বাজে কথা বল না ! তোমাদের, এবং তোমাদের যারা তৈল মর্দন করে তাদের, সমস্ত সম্পদ আমরা ছিনিয়ে নোবো, সে শক্তিটুকু আমাদের আছে। মিথ্যা আশা বা প্রতিশ্রুতি আমরা দিই না, সে তোমরাই দাও। তার দৃষ্টান্তও আছে অসংখ্য—এই তোমরাই একদিন গলাবাজি করে বলেছিলে, চোরাকারবারীদের আর মুনাফাখোরদের ধরে ধরে ফাঁসি দেওয়া হবে ! আজ পর্যন্ত কটা লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, বলতে পার ?

—ফাঁসি কাউকেই দেওয়া হয় নি, বা হবে না। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে কথনো ওভাবে শাসনে আনা যায় না। কংগ্রেস গান্ধী—আদর্শে বিশ্বাস করে ; তাই হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করতে চায় না—খুব জোর ফোঁস করতে পারে, তাই বলে ছোবল মারবে না কোনোদিনই।

বিলয় ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়া উঠিল, আহা ! কী কথাই বল্লেন রে, বাঃ সব ঘাসের বীচি খেয়ে মানুষ হও, আর দু'সন্ধ্যে হরিনামের বুলি আউড়িয়ে মালা জপে যাও, তাহলেই দিন কেটে যাবে ; আর ওদিকে চোরা কারবারীদের পেট ভরুক, বলিতে বলিতে প্রবল উত্তেজনায় তাহার সর্বশরীর যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল ! বলিয়া উঠিল, অসহ্য ! অসহ্য ! এভাবে আর দিন চলবে না শক্তিদা' ! এই বলে দিলুম। বলি, চাষীদের ওপর ডাণ্ডাবাজি আর শ্রমিকদের ওপর গুলি চালাবার সময় কোথায় থাকে তোমার অহিংসানীতি বল ত দাদা ? অথচ সমাজের মেরুদণ্ড ত তারাই !

শক্তিপদ ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যারা রাষ্ট্রের শত্রু, যারা সমাজের শত্রু, যারা অহিংসানীতির শত্রু, তাদের কাছে যুক্তির কোনো মূল্যই নেই---তাদের জন্য দাম আছে লাঠ্যৌষধমের। সমাজের কল্যাণের জন্য দুষ্টের দমনের প্রয়োজন। যারা ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সমাজকে গড়ে তোলবাব স্বপ্ন দেখে, চিন্তা করে, আমাদের মতে, তারা সমাজের বড় শত্রু, শুধু তাই নয় তারা দেশেরও পরম শত্রু। তারা ভারতের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের শত্রু।

বিলয়ের তরুণ রক্ত যেন ক্রমশই গরম হইয়া উঠিতে লাগিল, উচ্চকণ্ঠে বিকৃত মুখব্যাঞ্জনায় সে বলিয়া উঠিল, সমাজে শত্রু আমরা নয়! সে হলে তোমরা! তোমরা! আর বড়াই করো না শক্তিদা', তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ জিনিস বেশী দিন আর চলবে না, এই ইলেকসনেই তোমাদের শেষ করে দোবো। সমাজকে নোতুন ছাঁচে গড়ে তুলব আমরা, ধ্বংস করে দেবো সব কিছু। সমস্ত কিছু কেড়ে কুড়ে নোবো, দেখতে পাবে—শোষনের দিন চলে গেছে।

শক্তিপদ তাহার কথাগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল, কংগ্রেস ধ্বংসের ভেতোর দিয়ে যেতে চায় না, তাই যারা সমাজবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে আছে তাদের সে কাজে যাতে তারা বাধা পায় তার জন্য নিষ্ঠুর হতেই হবে কংগ্রেসকে। যখন একটা চোখের সংক্রামক বীজাণু অপরটাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে তখন ঐ ঘেয়ো চোখটাকে সোজা উপড়ে ফেলতে হয়, তা না হলে দু'টো চোখই শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। দেহের প্রত্যঙ্গে বা উপাঙ্গে gangrene হ'লে ঐ পচ-ধরা অংশটুকুকে সোজা উপড়ে ফেলতে হয়, তা না হলে সমস্ত দেহটাই দূষিত হয়ে ওঠে। তোরাও ঠিক সেই ধরণের gangrene সমাজ দেহে, তাই তোদেরও ঠিক ঐ ভাবে সমাজ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া দরকার। সুতরাং অহিংসানীতির কথা এ ক্ষেত্রে একেবারেই ওঠে না।

বিলয়ের বয়স বেশী নয়, তিরিশের উর্দ্ধে, কিন্তু তারুণ্যের বিস্ফোরক! অল্প উত্তেজনাতেই সহজেই তাহার মেজাজ গরম হইয়া উঠে, তাই শক্তিপদর শেষ কথাগুলি যেন তাহার তরুণ দেহ-মনের উপর দিয়া একটা বিষবহ্নির হাওয়া লাগাইয়া দিয়া তাহাকে অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল! বলিল, হ্যাঁ আমরা

হলুম gangrene, তা আমরা যদি gangrene হই, তোমরা হলে টি.বি., টি.বি'র বাড়া টি. বি.—মানুষকে তিলে তিলে মারচ তোমরা। তোমরাই ধনিক বণিকদের খাজাঞ্চী হয়ে বসে আছ; আর তোমরাই সমাজের ক্ষুধার্ত মানুষের রক্ত শুষে শুষে খাচ্চ, তিল তিল করে।

শক্তিপদ হাস্যমুখে বলিল, তোদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা অত্যন্ত প্রবল তাই তোরা সমাজে যোগ্যতর মানুষদের সহ্য করতে পারিস না, মানুষের intrinsic valueর ও দাম দিস না, সেই জন্যই চেঁচামেচি করিস্। অবশ্য এ দোষ তোদের একার নয়, পৃথিবী শুদ্ধ অযোগ্য লোকদের কথাই তাই। খালি বকতিমে মেরে কাজ হয় না। বেশ ত! যারা তিলে তিলে মরতে না চায় তারা কী ভাবে বেঁচে থাকতে পারা যায় তার নমুনা একবার দেখিয়েই দিক না।

বিলয় মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, তাইত, ঠিক বলেচ---একজন মানুষ পাঁচ হাজার মুখের অন্ন কেড়ে খাবে, আর এদিকে আর এক জন এক মুঠো অন্নের জন্য হা-হুতাশ করে মরবে! এর নাম যোগ্যতা, চমৎকার কথা! আর এরই বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করা—বলতেও লজ্জা করল না?

—না, এতটুকুও নয়। যা সত্যি কথা তাই বলচি। তোরা অর্থাৎ তোদের দলগুলো যোগ্যতরদের হিংসা করে কেন জানিস নিজেরা তারা কিছু করতে পারে না বলেই। তোরা নিজেরাও ত নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে মরিস্, খালি মোড়ল সাজবার তাল। সমাজের জঞ্জাল তোরা।
বলিয়া তিনু মাষ্টারের কাছ হইতে একটা বিড়ি চাইয়া লইয়া ঠোঁটের মধ্যে লাগাইয়া উঠিয়া পড়িল।

—কী, উঠে পড়লে যে? ওসব চলবে না, কথা শেষ করে যেতে হবে শক্তিদা' এই বলে দিলুম।

—কথা আমার শেষ হয়ে গেছে। আমরা ইলেকসনে জিতবই জিতবো। তোরা জঞ্জালগুলো কিছুই করতে পারবি না।

—দেখো মুখ সামলে কথা বলো শক্তিদা'! এই বলে দিলুম। জঞ্জাল কথাটা ব্যবহার কর কী হিসেবে শুনি?

—জঞ্জাল ছাড়া আবার কী?—সমাজে যাদের থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই তারা সমাজের জঞ্জাল বৈ আর কিছু নয়।

—হ্যাঁ আমরা জঞ্জাল, তা আমরা যদি জঞ্জাল হই তাহলে তোমরা হলে সারমেয়—তোমরা ধনীদের পা চেটে বেড়াও, পদ লেহন কর। তোমাদের শ্ববৃত্তির জন্য দেশ আজ ধ্বংসের পথে।

শক্তিপদ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, তা তোরা সে যা'ইবল কংগ্রেস থাকবে, এবং এই ইলেকসনে জিতবেও, তোরা কিছুই করতে পারবি না।

বিলয়ের আর ধৈর্য্য রহিল না। চট করিরা তাহার মেজাজটা চড়িয়া গেল। রোষরঞ্জিত দৃষ্টিতে শক্তিপদর ঐ নিষ্ঠুর হাসিটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, এই হাসি বার করে দোবো, দেখে নোবো কোন্ মামু বঙ্কুকে হারাতে পারে। ভুবন চাটুজ্জেকে ফুলের মালার বদলে জুতোর মালা গলায় দিয়ে ঘুরতে হবে। যাক্, যা বলেছ তা এখন withdraw কর।

—কেন, ভয় নাকি? আবার বলচি তোরা সমাজের জঞ্জাল—rif-raff.

—কী বল্লে? ভাষা সংযত করে কথা বল শক্তিদা'?

—সংযত ভাষা আসে না, আসা উচিতও না।

—বটে! আচ্ছা, দাঁড়াও কংগ্রেসের পা-চাটাগুলো, বলিয়া ঝপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলয় বাঁ হাতে তাহার সার্টের ক'লারের ডান দিকের ডগাটা টানিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাকে দেওয়ালের সহিত ঠেসিয়া ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। ধাক্কাধাক্কি ধস্তাধস্তিতে কয়েকটা পেঁয়াজি, বেগুনি ও ফুলুরি মেঝেতে পড়িয়া গিয়া এদিক ওদিক ছিটকাইয়া গেল; একটা চা'র কাপও পড়িয়া গিয়া ডাঁটিটা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ঘরের এদিক ও দিক ও রাস্তার উপর হইতে লোকে আসিয়া বাধা দিল, সুতরাং বিলয় আর প্রহার করিবার সুযোগ পাইল না। যাক্, বিবাদটা তখনকার মতো অবশ্য চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু চাপা পড়িয়া গেলেও আরও বেশ কিছুটা সময় ধরিয়া কথা কাটাকাটি চলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত বিলয়ই মাথা হেঁট করিল।

কিন্তু শক্তিপদর ত রাগ কমে না। সে বেঞ্চের উপর আবার বসিয়া পড়িয়া আপন মনে বিড়্ বিড় করিয়া উঠিল,—এ সব সমাজের শত্রুগুলোকে মেরে ঠাণ্ডা করতে না পারলে দেশে শান্তি নেই, উঃ, বাপরে বাপ! জ্বালিয়ে খেলে! আচ্ছা, ঠিক আছে, দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে।—ওরে তিনু, দে ত ভাই আর

একটা বিড়ি, দে ত—তাড়াতাড়িতে বিড়ির ডিবেটা ভুলেই এলাম—কাজের চাপে কিছুই মনে থাকে না ছাই।—তিনু একটা বিড়ি তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, আর এক কাপ চা দি ?

—না থাক্, আচ্ছা, দিবি দে, হাপ কাপ দিস্, আর চার পয়সা পেঁয়াজিও দে, লিখে রাখিস্।

এমন .সময় কে একটি ছোকরা—উগ্রপন্থীদলের—পরিহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিল, কী দাদু, এটা কী ভুবনদার একাউণ্টে চলল্ নাকি ? এখন থেকেই কী ইলেকসনি-পেঁয়াজি সুরু হল নাকি ? শক্তিপদ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে না, দস্তর মতো নিজের গেঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়া হচ্চে—ডেঁপো ছেলে কোথাকার। আমরা ভিখারীর জাত নয়, বুঝলি ? নাঃ ! কবে যে দেশে শান্তি ফিরে আসবে তাই ভাবচি ! বুঝলি তিনু ; এসব হাঘরে ভিখারীর জাতগুলোকে ধ্বংস করতে না পারলে কিছুই আশা নেই দেখচি ; জানোয়ারটা সার্টের কলারটা ছিড়ে দিলে গো, আচ্ছা দাঁড়াও street urchins গুলো !

এই ! কী বল্লি পা'চাটার দল ? সাবধান ! বলে দিলুম সাবধান ! জুতিয়ে লম্বা করে দোবো ফের যদি হাঘরের জাত বলবি, বেইমান কোথাকার। বলিতে বলিতে গোপাল একটা বিরাট হুঙ্কার দিয়া, বলিতে গেলে একটা হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাহার দেহের উপয় ঝাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। অবশ্য, গায় হাত উঠাইতে পারিল না।

ইত্যবসরে সংবাদ পাইয়া ভুবনবাবু কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মী সঙ্গে করিয়া সেখানে.আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্যতম সহকর্মী মণিশঙ্করও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন ! লজ্জায় তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছে ! তর্ক করিতে করিতে সামান্য কারণে শক্তিপদ যে এতদুর ঘৃণ্য কাজ করিয়া বসিতে পারে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। ছিঃ ! বলিয়া, তিনি শক্তিপদকে ভৎ'সনা করিয়া বলিলেন, তোমার চেয়ে বয়সে এরা অনেক ছোটো শক্তিপদ, আজ বাদে কাল চল্লিশে পড়বে তুমি, অথচ এ কি কাণ্ডটা তুমি করলে ? এরা যদি দু'কথা বলেও, তোমার সহ্য করে যাওয়া উচিত।

শক্তিপদ রাগে ফুলিয়া আছে। খেঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, আরে যান, যান,

আপনি এখান থেকে সরে পড়ুন ত এখন ; বাজে কথা বলবেন না—যত সব অর্বাচীনের দল, স্ট্রীট আরচিন্সগুলো, সমাজের জঞ্জাল এগুলো। আপনার এতে নাক গলাতে হবে না, ভুবনদা।

—থামো, থামো শক্তিপদ।

—থামবো আবার কী! এ গুলোর এতবড় স্পর্দ্ধা হয়েছে যে আমার গায়ে হাত দিতে আসে? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দোবো। এক্ষুণি আমি থানায় যাবো—পুলিশে খবর দোবো, দেখিয়ে দোবো মজা।

—আঃ, কী হচ্ছে কী শক্তিপদ? অসভ্যতা করো না।—তোমরা আমায় ক্ষমা করো ভাই, শক্তিপদর মাথা খারাপ হয়েছে, বলিয়া ভুবনবাবু শক্তিপদকে জোর করিয়া টানিয়া উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া একটু ধমক দিয়া বলিলেন, অন্যের কথা শোনবার মতো যদি ধৈর্য্য না থাকে ত তর্ক করতে যাও, কেন? যাও এখান থেকে চলে যাও এখন ।

গোপাল গর্জন করিয়া উঠিল, দেখুন ওনাকে কিন্তু সাবধান হতে বলুন, তা না হলে ভীষণ কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে বলে দিলুম।

ভুবনবাবু অত্যন্ত নিরীহ—নির্বিবাদী মানুষ। তিনি ভয় পাইলেন, কী জানি পরিস্থিতিটা যেরূপ একটা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়া বসিয়াছে হয়ত বা মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বধিয়া উঠিতে পারে। তাই তিনি সশঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন; না, না কেলেঙ্কারী আমি কিছুতেই হতে দোবো না।

শক্তিপদ ক্রুদ্ধ অহির ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিল, এ্যাঃ, ভয় করি না, কোনো মামুকেই ভয় করি না, হক না কেলেঙ্কারী, দেখে নোবো সব মামুকে। ওসব পেশাদারী উগ্রপন্থীদের এতটুকুও ভয় করি না, বুঝলে ভুবনদা'। যত সব ষ্ট্রীট আরচিনস্‌গুলো।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোপাল আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিমিষকাল মধ্যে আবার শক্তিপদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার কেশাগ্রভাগ দৃঢ়মুষ্টিতে পাকাইয়া ধরিয়া লইয়া এক টানে তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। বলিয়া উঠিল, ফের যদি টু শব্দটি করেছ ত জুতিয়ে লম্বা করে দোবো!

গোপালের এই আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপার দেখিয়া ভুবনবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিল,—টু শব্দটি

পর্যন্ত না করিয়া তিনি একপাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মণিশঙ্কর শক্তি-পদকে টানিয়া তুলিয়া বেঞ্চের উপর বসাইয়া তাহাকে গঞ্জনা দিয়া, অথচ উহাদের খোঁচা মারিয়া বিকৃতমুখভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, ঠিক হয়েছে, যেমন গোঁয়ার ছোটলোকদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া। Politics কাকে বলে বোঝে ওরা ?

বিলয় ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দেখুন মণিবাবু, ভাষা সংযত করুন —আপনি ছোটলোক বলেন কাদের ? withdraw করুণ যা বলেচেন ! তা না হলে ছোটোলোকীর চূড়ান্ত করব। রাজনীতি কাকে বলে এই সামনের ইলেকসনেই টেরটি পাইয়ে দেবো।

মণিশঙ্কর অনমনীয় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে কাদের কতদূর হিম্মৎ। আগে পা-চাটা কথাটা withdraw করুন তারপর আমরাও আমাদের কথা প্রত্যাহার করব। কংগ্রেস সব কিছু সহ্য করবে; তাই বলে, ইতরমো কখনো সহ্য করবে না। আমরা ধারকরা বুদ্ধি নিয়ে চলি না।

বিলয় একেবারে চুপ।

ভুবনবাবু দেখিলেন বিবাদটা সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু মিটিল না, বরঞ্চ উভয় পক্ষের মধ্যে একটা স্থায়ী মন কষাকষির ভাব ও একটা তীব্র তিক্ততা রহিয়া গেল, যেটা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না, বা প্রশ্রয় দিতে এতটুকুও উৎসাহী নন। অথচ বিবাদটা মিটিয়া যাওয়ারও একান্ত প্রয়োজন। এই ভাবিয়া তিনি বিলয় ও গোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা কিছু মনে করো না ভাই, আমি ওদের হয়ে ক্ষমা চাইচি; তবে দোষ উভয় পক্ষেরই আছে —অবশ্য দোষ বলবো না, পরস্পরকে তোমরা ভুল বুঝেছো। যাক্, সব ঝগড়া ভুলে গিয়ে তোমরা যে যার কাজ করে যাও ভাই, এটাই আমি আশা করি। দেশের লোক যাকে চাইবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। এতে আর ঝগড়ার কী আছে। গণতন্ত্রের দিনে বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কেরা যখন ভোটাধিকার পেয়েছেন তখন আর ঝগড়ার কী থাকতে পারে।

সহসা তাহাকে বাধা দিয়া মণিশঙ্কর বলিয়া উঠিল, এসব কথায় তোমার থাকার প্রয়োজন নেই ভুবনদা'। আমাদের এই ঝগড়ার মধ্যে তোমার না আসাই ভাল। অতো তোষামোদে আমাদের দরকার নেই। বেশ করেছি

ছোটলোক বলেচি; আবার বলচি, withdraw করব না। চল, চল শক্তি, আর এখানে থাকবার দরকার নাই, বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

নয়

নূতন তেরতলা ভবনে পুষ্করের নিজের দপ্তরখানা। আজ কেনই যেন সে একটু সকাল সকাল অফিসে আসিয়া গিয়াছে। তখনো সাড়ে দশটা বাজে নাই। এমন কী তাহার স্বকীয় কেরাণীবাবুও তখনো পর্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই। সুতরাং প্রায় বারোটা পর্যন্ত প্রত্যহই পুষ্করের ঠিক ওই সময়টুকু যেন অবসর সময়—ভিসিটরও বড় একটা কেহ আসে না। মনটা কেনই যেন আজ এক অনির্ব্বচনীয় হ্লাদের শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতেছে; কাজে এতটুকুও স্পৃহা জাগিতেছে না। ফস্ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া ঘরের উত্তর দিকের একটা উন্মুক্ত বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

শীত আছে, কিন্তু উত্তরে বাতাস নাই। কী সুন্দর এই ধরিত্রী! পুষ্করের কত ভাল লাগিতেছে আজিকার এই বিচিত্ররূপিনী প্রকৃতির লীলায়িত ছন্দ-মুখরিত সুষমাসম্ভার,—মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশের কোল জুড়িয়া লঘুকায়া আলো ছায়ার সে কী অপূর্ব চপল ভঙ্গী; সম্মুখেই জলযানসংক্ষুব্ধ স্রোতস্বিনী; অদূরে হাওড়া ব্রীজ; গঙ্গার পশ্চিম কূলে হাওড়া ষ্টেসনের বিরাট সৌধ। ষ্টেসনের দিকে চোখটা পড়িতেই অকস্মাৎ মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল,—এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণকলির ঐ স্বপ্নেভরা অপরূপ লাবণ্যলালিত মুখের ছবিটা যেন তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—আনন্দ! কী অপূর্ব আনন্দ! তবুও যেন বিরহ ব্যাকুলতা! তিন দিন পূর্বে সে সজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে; সে আবার যাইতে লিখিয়াছে,—এ আমন্ত্রণ ইহা ত পরোক্ষে কৃষ্ণকলির নিকট হইতেই আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে চিঠিখানা কয়েকবার পড়াও হইয়া গিয়াছে তবুও যেন পড়িবার বাসনা মেটে না। আবার গরম কোটের ভিতরের পকেট হইতে চিঠিখানা বার করিয়া লইয়া আর একবার পড়িয়া ফেলিল। পড়িতে কত ভাল লাগে, বার বার উহার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া যাইতে কত আনন্দ—

কত বিরহ, কত ব্যাকুলতা, কত শূন্যতার স্রোত, হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। কত আকুল করা দৃশ্যাবলী কত বিচিত্র রূপ ধরিয়া তাহার চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিল,—শিশু হাওড়াব্রীজটার মতো ময়ূরাক্ষীর বাঁধ; দুই বাঁধের মুখে লৌহপ্রাচীর প্রতিরোধিত সংক্ষুব্ধ ফেনিলোচ্ছল জলরাশির অবিরল কল্লোল, অস্তরবির ম্লানরশ্মিরঞ্জিত দিগন্তের কোলে সবুজ বনানীর স্নিগ্ধ মায়া, বালুচরের ছোটো ছোটো বিলের উপর দিয়া শিকারী বকের চতুর সঞ্চরণ, বিচরণ, তেঁতুলবনের মাথার উপর দিয়া ক্রমবিলীয়মান আলোছায়ার বিলুপ্তির ব্যাকুলতা, দূরে ঋজুকায় চূত-শিরীষের ফাঁকে ফঁকে অবসন্ন আলোর মূর্চ্ছিত ক্রন্দন, খালের ধারে ধারে সারিবদ্ধ বাবলা-বনের বিশাল মমতা, এমন আরও কত কী। নিত্য দিনের বাঁধাধরা কাজের অনুবৃত্ত্যনুবৃত্তির মাঝে জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত্তগুলিকে ঠিক এমনি করিয়া নিবিড় ভাবে নিজের মধ্যে মধুময় করিয়া, প্রেমময় করিয়া অনুভব করিতে কত যে আনন্দের দুঃসহ বেদনা,—তবুও ভাল লাগে!

দেখিতে দেখিতে স্প্রিং দরজাটা ঠেলিয়া কে যেন ঘরের মধ্যে চলিয়া আসিল। পিছন ফিরিয়া দেখে পঞ্চমী,—দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল।

পঞ্চমী একগাল হাসিয়া বলিল, কী, হঠাৎ দেখে বুঝি অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?

—তা একটু হচ্ছি বৈ কি। হঠাৎ কী মনে করে? কী করে টের পেলে আমার অফিস এখানে?

—বাঃ, বেশ তো! নিজেই ঠিকানা দিয়ে আবার নিজেই ভুলে যাচ্ছ।

—ও হ্যাঁ তাইতো। এসো এসো, বসো এই চেয়ারটাতে।

—হুঁ, খুব লোক যা'হক, বাবা এত ভুলো মন; বলিয়া বেশ একটু ঠেস দিয়া বলিয়া উঠিল, তা আর মনে থাকবে কেন, বুঝতে পেরেচি—সঙ্গে যে সেদিন অন্য কেউ ছিল কিনা।

—খুব যে কথা শিখেছ। সোজাসুজি বলতে বুঝি লজ্জা করচে? তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো না? এস আমার পাশের চেয়ারটিতে বসেই কথা বল।

পুষ্করের বসিবার চেয়ারের ঠিক ডান পাশের চেয়ারটার উপর পঞ্চমী গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, তারপর, কেমন আছ বল?

—ভাল না।

—মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার মুখটা ভাবছিলে?

—অত্যন্ত দুষ্ট মেয়ে, বলতেও বাধল না একবার। কার মুখখানা আবার ভাববো শুনি? ধর তোমার মুখটাই যদি ভেবে থাকি?

—থাক, ঢের হয়েছে, আর ঢং করতে হবে না।

—আশ্চর্য এখনো পর্যন্ত তোমার ছেলেমানুষি গেল না।—ভাবছিলাম কী জান, আজ থেকে দু'শ বছর আগে লর্ড ক্লাইভ বাংলা দেশ দখল করল; আমরা সেদিন পায়ে শেকল পরলুম। তাই ভাবচি, আজ থেকে দু'শ বছর আগে এই গঙ্গার স্রোত কী ঠিক এই ভাবে বয়ে চলেছিল? তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে কী বলতে পারবে—সে যুগের কত শত শত অশ্রুত, কলঙ্কিত কাহিনীগুলো—যা ইংরেজ শাসকেরা ইতিহাসের পাতায় বর্ণনা করে নি। তার সব কিছুই মুখস্থ আছে, কী বল?

পঞ্চমী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া অগ্রভাগনিশ্চিহ্ন সুকোমল স্বচ্ছ কেশদাম পরিশোভিত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ তা' আছেই তো, ঠিকই বলেচ, স্রোতগুলো তো তোমারই মত ইতিহাসে পণ্ডিত কিনা,—রবার্টসএর ইতিহাসখানা বোধ হয় চষে খেয়েছে।

—কেন ঠিক বলিনি?

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। সাজাহান কবিতা থেকে ঐ কথারই সুর বেজে ওঠে, "তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্বণ ভগ্নপ্রাসাদের কোণে ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে কাঁদায় রে নিশার গগন"। নূপুর নিক্বণ বলতে কত মধুর করুণ ঝুন্ ঝুন্ শব্দ কানের কাছে বেজে ওঠে, মনটা প্রায় চা'শ বছর আগের দিনে পিছলে চলে যায় —এ-ও তাই। শুধু স্রোত কেন, মাথার ওপর ঐ যে নীল আকাশ আর ঐ অনাদি কালের আদিত্যদেব এদের জিজ্ঞেস করলেও ত বোধ হয় অনেক কিছু ইতিবৃত্ত এরা আওড়াতে পারবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতিরও পরিবর্ত্তন ঘটেনি, আর ঐ নীল আকাশটারও স্থান চ্যুতি হয়নি। আর এই যে দেখচ হেস্টিংস ষ্ট্রীট্, এর পিঠের পিচমোড়া জামাটা খুলে ফেলে এর মাটির দেহটাকে জিজ্ঞেস করলে সেও হয়ত বলতে পারবে কত করুণ মধুর ইতিহাসের কাহিনী,—বলতে পারবে মহারাজা নন্দকুমারকে ইংরেজ দস্যু Warren Hastings কোন বে-আইনী

আইনের প্যাঁচে ফেলে—forgeryর charge এনে—স্যার্ ইলেজা ইম্পেকে দিয়ে ফাঁসি দিইয়েছিল। এ ছাড়া, ওয়ারেণ হেস্টিংসের পরকীয়া প্রেমের কাহিনীও কিছুটা বলতে পারবে। বলতে পারবে, দুটো ইতিহাস অপ্রসিদ্ধ বেইমানদের কথা—মীরজাফর আর পাঞ্জাবী বণিক উমি চাঁদ। আর ঐ জালিয়াত—তার অবশ্য দোষ নেই, সে দেশ জয় করতে এসেছে—লর্ড ক্লাইভএর কথা, কী করে সে জাল দলিলে Watsonএর সই জাল করিয়ে সই বসালে, দুটি বেইমানকে কলা দেখাবার জন্যে।

বাঃ! বাঃ! অদ্ভুত তোমার কবিত্বশক্তি, বোবা ইতিহাসকে মুখর করে তুল্লে। বলিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাক্, এখন কী মনে করে বল?

—এলুম দেখা করতে, বলেছিলাম একটা চাকরি দেখে দেবার জন্য। ভুলে গেছো নিশ্চয়ই?

—না, এতটুকুও ভুলি নি।

—তাহলে কত দূর কী করতে পারলে বল, আর তো পারি না বাবা ঘরে বসে বসে সময় কাটাতে। সত্যি ভাল লাগে না আর, যে কোনো রকমের চাকরি একটা দেখে দাও আমাকে পুষ্করদা।

—চাকরী বল্লেই কী আর এ বাজারে চাকরী জোটান যায়, এমন কি মেয়েদের চাকরি হওয়া একটা কঠিন ব্যাপার। —মেজদাকে বল না কেন সেও তো চেষ্টা করলে দু চারটে চাকরির খবর দিতে পারে।

—মেজদাকে অনেক বলেচি; বলে, স্কুল মিস্ট্রেসের চাকরি নিতে।

—ভাল বুদ্ধিই দিয়েচে!

পঞ্চমী অনুনাসিক স্বরে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, না, না, দূর ও সব মেয়ে ঠ্যাঙানোর কাজ আমার দ্বারা হবে না—বড্ড এক ঘেঁয়ে।

পুষ্কর হাসিয়া উঠিল, বাবা, মেয়ে পড়ানর কাজ তাও তোমার কাছে এক ঘেঁয়ে? তাহলে কোন চাকরীর মধ্যে বৈচিত্র আছে শুনি?

—কেন তুমি যে ধরণের চাকরী করচ এতে তো বেশ life আছে।

—হুঁ, এই প্রথম শুনলুম গোলামীর জীবনে আবার life।

—কেন বেশ তো আছ বাবা, দিব্যি আছ, কেমন মাঝে মাঝে tour করতে যাও, ইচ্ছে মতো অফিসে আস। আমি তো দেখি বেশ আরামেই আছ। সত্যি, তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসে কাজ করতে ইচ্ছা হয়।

পুষ্কর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, অদ্ভুত কথা বল্লে, চাকরি চাকরিই, বুঝলে হে, —পরের হুকুমের সঙ্গে নিজের স্বাধীনতাকে যুতে রাখতে হয়। টাকার অঙ্কে হয়তো পকেট ভার হতে পারে, পদমর্যাদাও বাড়তে পারে—এর বেশী আর কী? তা তুমি উকিল কী ডাক্তার হলে পারতে?

উচ্ছল হাসিতে পঞ্চমীর মুখখানা ভরিয়া উঠিল, বলিল, থাক থাক ঢের হয়েছে আর ঠাট্টা নয়! কাজের কথা বল—একটা চাকরির সন্ধান দেবে কী?

—কিছুদিন wait কর, মাস ছয়েক অন্তত অপেক্ষা কর।

অস্থির কণ্ঠে পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, Impossible! না, এ ভাবে আর আমি মেজোবৌদির ট্যাক ট্যাকানি সহ্য করে থাকতে পারি না। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হতে গেল আর এভাবে থাকতে ভাল লাগে না, বলিতে বলিতে দুর্ধর্ষ আবেগের ভরে অকস্মাৎ টেবিলের উপর স্বচ্ছন্দে রাখা পুষ্করের ডান হাতের মুঠোটা মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিল।

তাহার এইরূপ প্রগল্‌ভতায় পুষ্কর যেন এতটুকুও বিচলিত হইল না বরং তাহার জন্য একটু মায়াই হইল। কিন্তু নিজেকে সে বিন্দুমাত্র শিথিল না করিয়া ঠিক তেমনই সহজভাবে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সহৃদয় কণ্ঠে বলিল, ইস্! এতদিন বলনি, দেখ ত, এই ত কিছুদিন আগেও উন্নয়ন বিভাগে কিছু মেয়ে নিল, একটু চেষ্টা করলেই শ'দেড়েক টাকার মাইনের একটা চাকরি পেতে পারতে।

—ও মা-া-া, কি আশ্চর্য বাবা! খুব যা হোক লোক, এইতো বাবা সে দিন এত করে বল্লুম—মাইরি তুমি এতটুকুও খেয়াল করলে না,—হুঁ হুঁ বুঝেছি, বুঝেছি, তা আমার কথা আর মনে থাকবে কেন, আমি তো আর একই অফিসে চাকরি করি না।

ওঃ, সে কী অভিমান! যেন সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলে আর কী।

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, বাবাঃ, একটুতেই এত অভিমান কর কেন পঞ্চমী, আমার খুবই মনে আছে। এই যে চাকরির কথা বল্লুম না, এসব তিন মাস আগের খবর—তখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল কোথায়, বল?

পঞ্চমী এইবার যেন তাহাকে রীতিমত পাইয়া বসিল। যেন তাহার স্নেহের, তাহার ভালবাসার, তাহার আমিত্বের উপর তাহার একটা অপ্রতিহত

দাবী আছে এইরূপ একটা ভাব দেখাইয়া চোখ মুখ ঘোরাইয়া খুব নিবিড়ভাবে আবেদন করিয়া বলিল, বেশ যা হয়ে গেছে তা'তো গেছে, এবার যেন না ভুল হয়। ভুল হলে কিন্তু·········

—হলে, কী হবে ?

—কথা বন্ধ করে দোবো।

—পারবে ?

—আমি সব পারি।

—আচ্ছা দেখা যাবে।

—হ্যাঁ দেখো। যাক, ওসব ঠাট্টা ছাড় ত এখন। সত্যি যদি কোনো রকমের একটা চাকরি জুটিয়ে না দাও ত উগ্রপন্থী হয়ে উঠবো বলে দিলুম।

পুষ্কর পরিহাসচ্ছলে হাসিয়া বলিল, তা বেশ তো, ভালই তো, উগ্রপন্থী হতে পারলে তবু যা হোক দেশের কিছু কাজ করতে পারবে।

পঞ্চমী এইবার একটু গুরুকণ্ঠে বলিল, ভাবছ বুঝি ঠাট্টা করছি, মোটেই নয়, এতটুকুও দ্বিধা করব না, অবশ্য একা নয়।

—তার মানে ? আবার সঙ্গী চাই নাকি ?

—বাঃ, এসব কাজ কখনো একা একা করা যায় নাকি ?

—কেন অসুবিধেটা কিসের ?

—সে তুমি বুঝেও বুঝবে না,—চাই উৎসাহ।

—তা বেশ তো, বুঝিয়ে দাও না ? কাজে উৎসাহ যোগাবার লোক চাই, এই তো বলতে চাইচ ?

—হ্যাঁ তাই।—লেনিন হয়ত আজ সে লেনিন হতে পারত না যদি না Nadyeshda Krupskayaর মতো নারী তার জীবনের সঙ্গিনী হয়ে তার কাজে উৎসাহ যুগিয়ে না আসত।

—ও বুঝলুম এবার, তুমি তোমার জীবনের লেনিনকে খুঁজে বেড়াচ্চ। তা বেশ তো আগে থেকেই নেমে পড় না, তারপর নয় সাথীর সন্ধান করে নিও।

সন্ধান ত করাই আচে।—আচ্ছা পুষ্করদা, তুমি না এক সময় উগ্রপন্থী দলে যোগ দিয়েছিলে, দেখেছিলাম ?

—হাঁ, দিয়েছিলাম।

—আঃ, সেই সময় তুমি যদি আমাকে দলে টেনে নিয়ে যেতে তাহলে আজ আর আমাকে চাকরি চাকরি করে চার দিকে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না। হয়তো তোমারও জীবনের চলার পথ কত বিচিত্র হয়ে উঠত।

—তখন তোমার মেজদা'কে বলেছিলাম পঞ্চমীর মধ্যে জিনিষ আছে, ওকে আমার সঙ্গে দাও, দেশের কাজ করুক। কিন্তু সে আমায় সন্দেহ করল।

হঠাৎ মেজদা'র প্রতি আক্রোশে ক্রোধে পঞ্চমীর মুখখানা একেবারে রুক্ষ হইয়া উঠিল। দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিল, সন্দেহ? কিসের সন্দেহ করল মেজদা?

—তা তো ঠিক বুঝতে পারলুম না। তখন আমি আর তোমার মেজদা' এম. এ পড়ি, সিক্সথ ইয়ারএ, আর তুমি পড় 1st yearএ! জানই তো তোমার মেজদা বরাবরই একটু ভীতু, তার ওপর আভিজাত্যের গর্ব্ব আছে তার। এ ছাড়া আমাকে ও কেনই যেন সন্দেহের চক্ষে দেখত। একদিন তো সোজা বলেই বসল, নিজে গোল্লায় যাচ্ছ যাও, দয়া করে আর আমার বোনের মাথাটা খেয়ো না। সেই থেকে সাবধান হয়ে গেলুম।

ক্ষোভে, বিস্ময়ে, আফশোসে পঞ্চমীর সমস্ত দেহ এবং মন যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল; সিতাংশু-শুভ্র মুখখানা লাল শালুকের ন্যায় রক্তাভ হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, ছিঃ, মেজদা'র মনটা যে এত সঙ্কীর্ণ তা জানতুম না। এই মেজদার কথামতো চলে আজ আমি মরতে বসেচি। ঠিক আছে দাঁড়াও, তাকে আমি জব্দ করচি— ঐ তারই বাড়ী বসে উগ্রপন্থী রাজনীতি করব।

—আঃ, অত excited হচ্ছ কেন পঞ্চমী? হয়তো তোমার ভাল'র জন্যই সে তোমাকে মিশতে দেয় নি আমার সঙ্গে সে সময়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পঞ্চমী বলিল, হুঁ, হুঁ খুব ভাল করেচেন উনি, আমার জীবনটাকে নিয়ে উনি experiment করে যাচ্ছেন। এতই যদি ভয়ছিল তোমাকে, তাহলে তখনই ত একটা ব্যবস্থা করে ফেল্লেই পারত।

এই experiment কথাটার ভিতর দিয়া সে যে কী বলিতে চাহিল তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পুষ্কর অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে?

—অর্থাৎ মেজদা আজ দশটা বছর ধরে আমাকে পরীক্ষা করে দেখচে আমার মতো একজন cultured এবং শিক্ষিত মেয়ের বিদ্রোহ করবার মতো মনের জোর আছে কিনা ?

—তোমার এসব উদ্ভট চিন্তা। আসল কথাটা কী জান, তোমার মেজদা' তোমার প্রতি এত বেশী স্নেহাসক্ত যে তোমাকে চোখের আড়াল করতে সে মনে ব্যথা পায়।

পঞ্চমী উত্তেজিত হইয়া বলিল, যাও যাও, ওসব ঠাট্টা ছাড়। আজ আমার এত দুঃখ হচ্ছে, তুমি কেন তখন জোর করে মেজদার মুরুব্বিয়ানা থেকে আমায় বার করে নিয়ে এলে না ?—উঃ, মেজদাটা কী হিংসুটে!

সেই কথাই তো ভাবি। এমন কী তোমার মাও একদিন বলেছিলেন, সুহাস, পুষ্করকে বল না, পঞ্চমীকে লজিকটা আর সিভিক্সটা একটু দেখিয়ে দেবে ; কিন্তু তোমার মেজদা তাতে ঘোর আপত্তি তুলেছিল।

—তাই আজও বুঝি অভিমান করে বসে আছ ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল ; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পুষ্কর ইতিমধ্যে তাহার হাত ঘড়িটার দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, ওকী ওরকম মন খারাপ করে হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন ?—সাড়ে এগারোটা বাজল প্রায়, একটু চা আনাই, চা খাও।—পঞ্চমী নীরব রহিল।

বেল টিপিয়া দিতেই বেয়ারা আসিয়া গেল। তাহাকে দুই কাপ চা ও টোষ্ট ওমলেট আনিতে পুষ্কর আদেশ করিল। পঞ্চমী রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, কী দরকার বারণ করে দাও পুষ্করদা', না আমার এখন খেতে ইচ্ছে নেই।—উঃ বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে।

—থামো আর বেশী কথা বলতে হবে না। হবে হবে চাকরি হয়ে যাবে। শুধু শুধু মন খারাপ করচ কেন ?

পঞ্চমী অভিমানদগ্ধ কণ্ঠে বলিল, মেজদার কথায় রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য, মেজদা' আমার সঙ্গে এ ভাবে শত্রুতা করল।

পুষ্কর বলিল, তা মেজদার ওপর অভিমান করে আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ কেন ?—নাও চা খাও, বলিয়া চায়ের কাপটা তাহার মুখের কাছে আগাইয়া ধরিল।

—ধর, ধর, নাও ধর, রাগ করতে নেই, অভিমান ক'রো না।

মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চমীর বুকের উপর হইতে ভারী ভারটা যেন নামিয়া গেল। মনটা বেশ হালকা হইয়া উঠিল, মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিল, বাবারে বাবা, তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা ভার। কী, খাইয়ে দিতে চাও নাকি চা'টা ?

—আপত্তি নেই, যদি ইচ্ছে কর।

—থামো, আর সোহাগ করতে হবে না। দুষ্টু কোথাকার। বলিয়াই, পুষ্করের হস্তস্থিত চায়ের কাপে আলগোছে ঠোঁট লাগাইয়া এক চুমুক চা বেশ আনন্দ ও অনুরাগের সহিত চুক্ করিয়া তুলিয়া লইল।—বাঃ ভারী ভাল লাগল কিন্তু; সত্যি এমন করে রোজ রোজ খাইয়ে দিলে মন্দ লাগে না।

—তা হলে তো আবার প্রতিদিনই এ রকম অভিমান করে বসে থাকতে হয়। তাই করো তাহলে।—ক'টা বাজল তোমার ঘড়িটাতে দেখো ত? আমারটা correct time দিচ্ছে না।

—হ্যাঁ, অনেক সময় নিয়ে নিলুম বটে তোমার, না এবার উঠব।

—অবশ্য আর একটু বসতে পার অসুবিধে নেই।

—না আর বসবো না, আফিস—বেশীক্ষণ আর বসা ঠিক নয়।

—তাহলে কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে এস। সবই ত শুনলুম। তোমার মেজদাই বা কী রকম ভেবে পাই না, আমাকে সেও তো তোমার বিষয় লিখতে পারত একটি বার।

চোঁ চোঁ করিয়া কাপের আধ-ঠাণ্ডা চা-টুকু খাইয়া লইয়া পঞ্চমী ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, আর বল না, মেজদাকে বহুবার বলেছিলাম, কিন্তু বল্লে কি হবে, এক কান দিয়ে ওনার কথাগুলো ঢোকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, উনি বৌদিকে নিয়েই ব্যস্ত, তার হুকুম খাটতে খাটতেই ওনার সময় কেটে যায়। ঐ মেজোবৌদিই আমার সব সর্বনাশ করলে—দাদাকে একেবারে মুঠোর ভেতর করে রেখেচে। যাক্‌গে, ওসব কথা না বলাই ভাল—

হ্যাঁ, না বলাই ভাল। যাক দেখি একটা চাকরির সন্ধান করতে পারি কিনা।

—ওসব দেখি-টেকি নয়, চাকরি আমার একটা চাই-ই।

—বলচি তো চেষ্টা করব, হয়েও যাবে ঠিক, একটু দেরী হতে পারে, এই যা।

—দূর বাপু তাড়াতাড়ি কর, দিন রাত কেবল বাড়ী বসে বসে যেন কী

রকম হয়ে গেছি। এত টুকুও ভাল লাগে না—montonous life, জীবনে এতটুকুও বৈচিত্র্য নেই। একটা বই-টই দাও না গো, পড়ি।

—যাক্ পড়ার বাতিক আছে দেখছি, তা হলে ভালই। আচ্ছা দেবো একখানা বই পড়তে। আমার মনে হয় দুপুরটা শুধু শুধু বসে' বসে' নষ্ট না করে National Libraryর মেম্বার হয়ে বই পড়তে থাক। বড় বড় লোকদের অটোবায়গ্রাফী পড়—জীবনী পাঠ কর।

—তা নয় হব মেম্বার। কিন্তু এখন কী বই দিচ্চ বল।

—দেবো একখানা, ভাল বইই দেবো। বাড়ীতে এস, বলব।

—তা তো যেন যাবই। তা কী বই দেবে বল না ?

—চৈতন্যচরিতামৃত,—কী, অমনি নাক সিঁটকলে শুনে ?

—না সিঁটকবে না, আর বই পেলেন না উনি।

—কেন ভাল বই নয় বুঝি ওটা ? আচ্ছা, সুরেন বাঁড়ুজ্যের জীবনী পড়বে বল ? Politics করচ যখন তখন ত এই রাষ্ট্রগুরুর জীবনী পাঠ করা উচিত। পড়বে ? দেবো ?

—কেন অন্য বই নেই কিছু ? অবশ্য সুরেন বাড়ুজ্যের 'A nation in making' বইটা আমি পড়েচি।

—তাই যদি পড়ে থাক তবে মহাপ্রভুর জীবনী পাঠ করতে আপত্তিটা কী ? সুরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন জান ?—শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং দর্শনেরও পর।

আমার অত কিছু জানবার দরকার নেই। হ্যাঁ, আর একটু বয়স হক তখন শুধু শ্রীচৈতন্য কেন, যবন হরিদাস থেকে সুরু করে রূপ সনাতন ঈশ্বরপুরী, রামপ্রসাদ, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ সকলকেই আবার নোতুন করে পড়ে ফেলব।

—ভাল কথা। তা এক কাজ কর না, যখন পলিটিক্স করবে বলে মনে মনে এঁচে রেখেছো তখন বালগঙ্গাধর তিলক আর গোখলে এদের জীবনী আগে পাঠ কর তারপর গান্ধীজীর। নেহাৎ যদি আর কিছু পড়বার ইচ্ছে না হয় ত অন্তত 'Discovery of India' বইখানা পড়।

—আচ্ছা দিও তাহলে ঐ বইখানা, অবশ্য সে ভাবে পড়িনি আগে—মাত্র চোখ বুলিয়েছি।—যাক, বিকেলে ফ্রি আছো ?

—কেন, কী হল ?

—তা হলে সিনেমা যেতুম। চল না গো, যাবে পুষ্করদা ?

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, সময় কোথায় ? বাবাঃ, ভীষণ কাজ জমে আছে—গাদা খানেক ফাইল।

পঞ্চমী অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বল্লেই অমনি হাতে যত কাজ জমে' উঠল। বল না বাবা তার থেকে, তোমার সঙ্গে যেতে ভাল লাগে না।

—বাঃ বেশ বল্লে যা হ'ক—ছবি আমি বড় একটা দেখি না।

—না, দেখো না, বাজে কথা বল না পুষ্করদা', বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক আছে দরকার নেই যাবার, চল্লুম। বলিয়া হঠাৎ মুখখানা কালো করিয়া গম্ভীর হইয়া গেল।

—ওঃ একটুতেই এত অভিমান!

—থাক, থাক, আর কথা বলতে হবে না, আমি সব টের পেয়েচি।

—কী টের পেয়েচ ?

—কোনো প্রয়োজন নেই জানবার।

আঃ অত রাগ কর কেন, পঞ্চমী। একটু ঠাট্টা করবারও কী স্বাধীনতা নেই আমার ? বলিয়া হাসিয়া বলিল, সত্যি কথা বলতে কী, তোমাকে চটিয়ে দিয়ে বেশ একটু আনন্দ পাই।

—আহা ওসব ঢঙের কথা ছাড়।

—দেখলে তো, এই যে কথাটা তুমি বল্লে, শুধু চারটে কথাই বল্লে, অথচ শুধু যে বলার জন্যই বল্লে তা নয়, তোমার মধ্যে কতটা যে সত্যিকারের রসবোধ আছে এবং তুমি যে আমার মধ্যে কতখানি নিজেকে স্পর্শসুলভ করে ফেলেছ তারই এ একটা মধুর ইঙ্গিত। বেশ লাগল তোমার কথাটা।

—থাক ঢের হয়েচে আর কবিত্ব করতে হবে না। যাক্‌গে, আমি আর কোনো কথাই শুনব না। তিন টাকার দু'খানা টিকিট কাটছি 9 P.M. Show, কী বল ?

—না, ছ'টার কর।

—কেন রাতের শো'তেই ত ভাল। ভিড় কম।

—কেন, ভিড়েতে লজ্জা করে নাকি ?

—কী যে বল তার নেই ঠিক। লজ্জা আবার কিসের ?

—তবে ছ'টার শো'তে আপত্তি কী ?

—ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করবার সুযোগ মেলে না। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা,—বিচ্ছিরি লাগে।

—ওটা ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তবুও। মনকে মনের মতো করে পেতে হলে কোলাহল থেকে মুক্ত থাকাই ত ভাল। এই ত দেখো না, এই যে আজ নির্জন ঘরটিতে ছুজনে বসে বসে আলাপ করচি এর মধ্যে মনের উন্মুক্ত পক্ষ ছুটো কেমন স্বেচ্ছায় সঞ্চালন করবার ছুর্বার সুযোগ পাচ্ছে—কম কথা নয়।

—নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা বল্লে। আমার ত ওখানে বসে কোনো কথাই আসে না, জড় হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী।

—চল না, ঠিক আসবে দেখবে।' যাক্ আমি আর কোনো কথা শুনচি না। ন'টার শো'র ছুখানা কাটলাম।

—বেশ, তা হলে তোমার কথাই থাক।

এমন সময়ে বেয়ারা আসিয়া এক তাড়া চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

স্তূপীকৃত চিঠি, তবুও তারই মধ্য হইতে শ্বেতকরবী রঙের খামে আঁটা একখানা চিঠির একটা প্রান্তভাগ এমনই স্পষ্ট হইয়া বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, ঐটারই উপর কেমন অনায়াসে উভয়েরই চোখটা গিয়া পড়িল। পঞ্চমী একটা বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া বলিল, অদ্ভুত, গভর্ণমেণ্টকে চিঠি দিয়েছে তা এমন রঙিন খামে কেন ? কেমন যেন দেখতে লাগছে!

পুষ্কর একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, বোধ হয় terracotta রঙের খাম হাতের কাছে ছিল না তাই তাড়াতাড়িতে ঐ ধরণের খামে ভরে দিয়েচে, এরকম খামে আঁটা চিঠি আমরা ত হামেশাই পেয়ে থাকি।

—দেখি, চিঠিখানা বার করত ? মেয়েলি হাতের লেখা বলে মনে হচ্চে

—হতে পারে; মেয়েরা ত আজকাল এই ভাবে অনেক সময় চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়ে থাকে কিনা।

—তবে যে তুমি বল এখানে কোনো চাকরি খালি নেই।

—খালি ত নেই-ই, এখন কেউ যদি পাঠায় ত কী করা যাবে বল, কে আটকাচ্চে ?

—কিন্তু official চিঠি personal নামে কেন ?

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, মেয়েদের ওটা খেয়াল, ভাবে বুঝি নাম ধরে চিঠি পাঠালে সোজা গিয়ে একেবারে অফিসারের হাতে পড়বে। তাহলেই চান্‌স্ বেশি থাকবে।

—মেয়েটির হাতের লেখাটি ত ভাল। খোলো না গো একটু, দেখি কী লিখেচে।

—তাই কী হয়, official চিঠি এ ভাবে বাইরের লোককে কী দেখান যায় ?

—আরে বাবা আমার কাছে আবার পর কিসের ; দেখি না, কী লেখে সব মেয়েরা, আমি ত আর কারুকে বলতে যাচ্চি না।

—না বল্লেও, জিনিসটা দেখায় খারাপ।

—থামো থামো আর চাপতে যেও না ! আমি সব বুঝি ! বুঝলে ? কার কাছে ধাপ্পা দিচ্ছ ?

পুষ্কর আর নিজেকে অস্বীকৃত করিয়া রাখিতে পারিল না, মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে বলি, রাগ করবে না ত ? দেখতে পার চিঠিখানা পড়ে।

পঞ্চমীর মুখখানা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল—উৎসব রজনীর অতিক্রান্ত উষার বিগতশ্রী পুষ্পস্তবকের ন্যায় সে উজ্জল হাসি তাহার যেন কোথায় মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল। তাহার আর এতটুকুও বুঝিতে বাকি রহিল না, এ চিঠি কে লিখিয়াছে। গম্ভীর ভাবে ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, চাইনা দেখতে। কোনো প্রয়োজন ছিল না এভাবে চেপে যাবার ; ঠিক আছে। আচ্ছা উঠলুম।

—কেন উঠবে কেন, আরও কয়েক মিনিট বসে যাও না, .বলিয়া চিঠিখানার একটা ধার কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া হাস্যমুখে বলিল, এই নাও পড়ে দেখ, ভয় নেই কিছু লুকব না।—কী হল রাগ করচ কেন ? বাবা একটুতেই অভিমান কর।

রাগে অভিমানে পঞ্চমীর সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিয়া আগুন হইয়া উঠিল। চিঠিখানা তাহার হাত হইতে ছিনিয়া লইয়া ছুড়িয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া

দিয়া কুটিল ভ্রুভঙ্গিমায় বলিয়া উঠিল, দরকার নেই, কোনো দরকার নেই আমার ও চিঠি পড়বার। অত সস্তা নয় এ মেয়ে, অত সস্তা নয়! বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে যেন এক দমক দুরন্ত ঝঞ্ঝার মতো ক্ষিপ্রগতিতে দরজাটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুষ্কর স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

দশ

না, পুষ্করের আজ আর কাজে মন বসিতেছে না। চিঠিখানা পকেটে ভরিয়া লইয়া সোজা সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া হাত ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজিয়া গেছে। নিজের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া ইজি চেয়ারটার উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া চিঠিখানা পকেট হইতে বার করিয়া লইয়া বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিল। না, ইহা ত সে চিঠি নয়, মাত্র একখানা অনুরোধপত্র বলিলেই হয়; না আছে ইহাতে ছন্দময় মধুময় অনাগত জীবনের অমৃত কথা, না আছে এতটুকুও বিরহ ব্যাকুলতার ইঙ্গিত, না আছে এক বিন্দুও কাব্য। শুধু নিরস বাস্তবতার নির্বিকার ভাষা,—অবকাশ ভোগের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রার্থনা জানাইবার একখানা চিঠি মাত্র, আর কিছুই নয়; সেই চিঠি সে ত সরাসরই সংশ্লিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া সেটিকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত আর একখানি পৃথক পত্রের দ্বারা তাহাকে সে অনুরোধ করিয়াছে মাত্র, শুধু অধুরোধ, আর কিছুই নয়,—শুধু কাজের কথা। কিছুই লেখে নাই তবুও যেন তাহার মনে হইতেছে অনেক কিছুই লিখিয়াছে—তাই বার বার পড়িয়া যাইবার জন্য মনটা কেমন যেন উতলা হইয়া উঠিতেছে—হায় রে! এই অনুরোধের পটভূমিকায় মনে মনে সে যে কত বিরহ মধুর কল্পনার আলেখ্য আঁকিয়া ফেলিল তাহা বলিবার নয়। আপন মনে হাসিয়া উঠে, লজ্জা পায়, মনে মনে বলিয়া উঠে, না না ছিঃ, প্রচণ্ড ভাববিলাসিতা, সবই স্বপ্ন,—তবুও মধুর তবুও আনন্দ। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কতাবশতঃ অকস্মাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া ড্রাজের উপর হইতে

চিঠি লেখার দুই একখানা কাগজ ও ফাউনটেন পেনটা তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে সঙ্কুব্ধ মন লইয়া পায়চারি করিতে করিতে ক্রমশঃই একটা চপলতা আসিয়া পড়িল, আবার ইজি চেয়ারটার ওপর গিয়া বসিয়া পড়িল। দুই এক ছত্র লিখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কলমের মুখটা যে এতটুকু কথা কহে না। কি লিখিবে আর কী না লিখিবে, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না,—কৈ সে ত কোনো উত্তর চাহে নাই? তবে কেনই বা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিতে যায়। এই ভাবিয়া কাগজখানা হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে মা আসিয়া বলিলেন, কী হল রে, হ্যাঁ বাবা আজ যে এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলি?

—এমনি চলে এলুম মা, কাজে মন বসচে না।

—কেন কী হল?

—পঞ্চমীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।—আচ্ছা মা তুমিই বল চাকরি বল্লেই কী আর এ বাজারে সঙ্গে সঙ্গে চাকরী জুটিয়ে দেওয়া যায়?

মা হাসিয়া বলিলেন, সে খুবই ত বুঝি, এ বাজারে একটা বেয়ারার চাকরি জোটে না, কেরানীর চাকরী ত দূরের কথা। বড় অবুঝ মেয়ে। কী এমন বল্‌লি রে? আহা বেচারার মনে কষ্ট দিস্ নি।

—না না কিছু বলিনি আমি অথচ একটুতেই ওর অভিমান।

মা সহৃদয় কণ্ঠে বলিলেন, তা ছেলে মানুষ, মা বাপ মরা মেয়ে একটুতেই হয়ত মনে লাগতে পারে।

—না মনে লাগবার মতো এমন কিছুই বলিনি তাকে। ওর আবার বায়না কম নয়; বলে কী জান মা আমায়, পুষ্করদা', তোমার অফিসে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। আচ্ছা বল ত মা, আমি কী চাকরি দেবার কর্ত্তা, না সব সময় আমার অফিসে চাকরি খালি থাকে? বল্লুম ওকে, স্কুল মিস্ট্রেসের চাকরি নেবে? উত্তরে ও বল্লে কী জান, ওরে বাবা মেয়ে ঠ্যাঙান'র কাজ আমার দ্বারা হবে না।

মা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা একটু আবদার করবে বৈকি বাবা, অনেক দিনের জানাশুনো ত!

—তাই বলে এ বড় অন্যায় আবদার ওর, যতই তুমি যাই বল মা।—ও একেবারে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের ঘোর শত্রু—উঠতে বসতে কংগ্রেসকে গালাগালি দিচ্ছে। এই সব করলে, কে ওকে চাকরি দেবে বল ত?

মা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কী, এ কথা ত আমি জানি না। সর্ব্বনাশ, এ সব করলে কে ওকে চাকরি দেবে? ও কী উগ্রপন্থী বুঝি?

পুষ্কর একটু হাসিয়া বলিল, উগ্রপন্থী না ছাই, ওই আর কী, হৈ চৈ করে চার দিকে ঘুরে বেড়ায় যারা তাদের মত উগ্রপন্থী আর কী। দলে ভিড়ে দু'চার দিন মাতব্বরি করা, এ সব হচ্ছে সস্তায় নাম কেনার ফিকির, বুঝলে না মা?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আবার কী। লেখাপড়া শিখেছে, কোনো কাজকর্ম্ম নেই, কী আর করে—উগ্রপন্থী দলে ভিড়ে পড়ল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাইত, সে আমি বেশ বুঝি। যাক্‌গে, তুমি এখন শোও গে যাও মা। ওর জন্যে তোমার অত চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

—না, আমার আবার কিসের চিন্তা। তবুও ভাবি—মা বাপ মরা মেয়ে, ভাইদের গলগ্রহ হয়ে আছে—যদি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে!

পুষ্কর বলিয়া উঠিল, দূর, ওর কিচ্ছু হবে না মা, বলে কিনা আমায় যদি কোনো চাকরি না জোটে ত' উগ্রপন্থী হয়ে যাবো।

—বাবা, এর মধ্যে ও এতটা হয়ে উঠেচে। তবে ওর মরণ।

পুষ্কর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, ও ত ভারী, ওর মেজদা দেবকুমারের বউ—তাকে জান ত'—সে ত' একজন ভীষণ উগ্রপন্থী।

—তাই নাকি? তবে ও মেয়ে গোল্লায় গেছে। তাহলে, ঐ বৌদিই ওর মাথাটা খাচ্চে। ওর যা চাকরী হবে তা বুঝতে পারচি। যাক্‌গে, নিজের দোষেই নিজে ভুগবে। বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ যখন ঘরে বসে আছিস্ তখন চল একটা ছবি দেখে আসি।

—তা বেশ। কী বই দেখবে মা?

—নিমাই সন্ন্যাস।

—তা চল যাই। বইটা নাকি খুব ভাল হয়েচে, শুনচি।

—সে ত হবারই কথা। তা ক'টার শো' তে যাবি? ছ'টার?

—তাই চল মা, এসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

—তা হলে তাই-ই, বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

প্রায় বেলা পাঁচটার সময়, ঠিক বাহির হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পঞ্চমী আচম্বিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চোখে এক জোড়া কালো চশমা, বাঁ হাতে দু'গাছি সোনার চুড়ির সহিত দোদুল্যমান একটা লাল রেশমী বটুয়া। ডান হাতে মুঠার মধ্যে দুইখানা তিন টাকা মূল্যের টিকিট। টিকিট দু'খানা পুষ্করকে দেখাইয়া বলিল, কৈ এস—বেরিয়ে পড়ি, আগে একটু হগ মার্কেটে যাব,—কী আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না? সত্যি কিছু মনে কোরো না পুষ্করদা। চল ওঠো-ছিঃ, রাগ করে না সোনা!

পুষ্করের প্রশান্ত মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ হাসির ছায়া প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। বলিল, কেন, রাগ করব কেন? তা, হগ মার্কেটে কী?

—তোমার জন্যে একটা ভাল সিগরেট কেস কিনবো, তোমার নেই অথচ খেয়াল করে কিছুতেই কিনচ না।

—হুঁ, সিগারেট কেসে কী দরকার আমার?

—আমার ভাল লাগে। সুট পর অথচ বিনা সিগরেট কেসে সিগরেট খাও, বিচ্ছিরি দেখায়। সত্যি, এত smart চেহারাটা তোমার, অথচ এতটুকু যত্ন বা তোয়াজ কর না। তোমার সঙ্গে বেরোনো সত্যি সেও একটা গর্ব্ব—It's a pride—কত মেয়ে আমায় হিংসে করবে জান, কত পুরুষ তোমায়ও হিংসে করবে। যাক, চল, চল, ওঠো, ওঠো, বেরিয়ে পড়ি। একটু ঘুরে আসি তারপর ন'টার শো' তে যাব। রাগ কর না, সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা কর!

—না না তুমি কিছু অন্যায় কর নি। একটু বোসো, চা খাও। মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—হ্যাঁ, করবো ত'—মাসিমা কৈ?

—মা বোধ হয় ওপরে আছে। এখুনি নামবে। তা, কোথাকার টিকিট কাটলে?

—পূর্ণ'র। গৃহদাহ দেখবো।

—ও বই ত দেখা হয়ে গেছে আমার।

—তা হ'ক, আর একবার দেখ না, আমার সঙ্গে বসে ত কখনো দেখনি।

বুঝেছি, আমার উপর অভিমান করেছ, রাগ করেছ !

—না কথনই নয়, আমি তোমার মতো'ঠুন্‌কো নই।

পঞ্চমী অনুনাসিক কণ্ঠে মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, না-া-া, তুমি আমার ওপর অভিমান করেচো পুষ্করদা, বলিতে বলিতে প্রবল আবেগের সহিত পুষ্করের ডান হাতের তর্জ্জনীটা অপরিসীম অনুভূতির সঙ্গে একটিবার টিপিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিল।

—আঃ, কী করচ কী পঞ্চমী ? ছিঃ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে দেখচি—চিকিৎসার প্রয়োজন। অত চঞ্চল কেন ?

—না-া-া, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ পুষ্করদা'। বল—রাগ কর নি ?

—বলচি ত, আরে বাবা রাগ করিনি, তবুও তুমি আমায় জোর করে রাগ করাবে দেখচি। আশ্চর্য, রাগ করার ত কোনো কারণই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—না, ঐ যে চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

পুষ্কর স্মিতমুখে বলিল, আগে থেকেই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলে কিনা তাই। কে লিখেছে, কেন লিখেছে, কিছুই দেখলে না, শুনলে না, অথচ নিজের মনে দুঃখ পেলে, অনুতপ্তও হলে। দরকার ছিল না কিছুরই।—এই নাও চিঠিখানা পড়ে দেখ তাহলে বুঝতে পারবে। আ-হা-হা লজ্জা নেই, পড় না, পড়েই দেখনা একটিবার, কোনো কিছু সঙ্কোচ করবার নেই। এই নাও ধর, ধর না রে বাবা।

এ লোভ পঞ্চমী কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিল না—পড়িয়া না দেখিলে মনের কোণে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধিয়া থাকে। ঐ ত সংক্ষিপ্ত চিঠি, সে এক নজরেই পড়িয়া ফেলিয়া উহার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া লইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হইয়া অপরাধিনীর ন্যায় পুষ্করের প্রশান্ত মুখখানার দিকে তাকাইয়া বলিল, সত্যি আমি ভুল করেছি পুষ্করদা', ছিঃ, খুবই অন্যায় করেচি, I'm so sorry, excuse me, পুষ্করদা' ! সত্যি আমি যে কেন একটুতেই রেগে যাই, বুঝতে পারি না।

—থাক, আর জবাবদিহি করতে হবে না।

—না, না, কিছু মনে ক'রনা পুষ্করদা'। কৈ, ওঠো ?

—তা, মা'র সঙ্গে একটু দেখা করে এস। চা-টা খাও।

দেখিতে দেখিতে মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কী রে পঞ্চমী. কী খবর ? এলি ত এলি একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে, আর একটু আগে এলে পারতিস, মা !

—কী, কোথাও বেরোচ্ছেন বুঝি মাসিমা ?

—হ্যাঁ, কেন ও বলেনি ?

—না ! পুষ্করদা ত কিছুই বলেনি। কোথায় চল্লেন ?

—নিমাই সন্ন্যাস দেখতে। তা, তুইও চল না আমাদের সঙ্গে, যাবি ?

—না। ও বই আমার দেখা হয়ে গেছে মাসিমা। বাজে বই।

—তবে থাক, আমরা দুজনেই যাই। কাল একবার আসিস মা, বুঝলি ? একাটি থাকি, বসে বসে গল্প করা যাবে। বস্ একটু চা নিয়ে আসি, খেয়ে যা। কতকগুলো ঝোলের বড়ি দেবো, নিয়ে যাস।

ওঃ, এ যে প্রচণ্ড আঘাত ! পঞ্চমী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—আঃ, বুকখানা যেন তাহার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় ! ক্ষণকালের জন্য সে যেন কেমন হইয়া গেল ; মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না, কিন্তু নিমিষকাল মধ্যেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটা জীর্ণ হাসি হাসিয়া পুষ্করের বিকারদুর্লভ মুখপানে তাকাইয়া বলিল, বাঃ তুমি ত খুব পুষ্করদা, দিব্যি আমার কাছে সব চেপে গেলে।—দেখলেন মাসিমা, দেখলেন।

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, ও ত বরাবরই একটু ভুলো মন, তুই ত জানিসই, মা। তা যাক। হাঁ রে পঞ্চমী ! তুই নাকি পুষ্করকে বলেচিস, অল্পদিনের মধ্যে যদি কোনো চাকরি বাকরি না জোটে ত' উগ্রপন্থী হয়ে যাবি ?

—হাঁ, তা বলব না ত কী ? শুধু শুধু ঘরে বসে বসে সময় কাটানর চেয়ে রাজনীতি করা ঢের ভাল। আর রাজনীতি করতে হলে উগ্রপন্থী রাজনীতি করাই ভাল।

—বাবা, এ বিদ্যে আবার তোর কবে থেকে হল ? নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনচিস পঞ্চমী। ভুল করবি, এই বলে দিলুম যদি ঐ সব দলে যোগ দিস। যোগ দিতে হলে কংগ্রেসএ যোগ দে। বলতে গেলে এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ভারতে। যাক্, এখন আর সময় নেই কথা বলবার, আসচি ব'স, বলিয়া তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এটা কী হল পুষ্করদা ? না যাবে,—না যাবে, সোজাসুজি বলে দিলেই পারতে ; এসব চালাকি করার কী দরকার ছিল, শুনি ?

—যাব না, একথা বলিনি ত!

—এতো বলার বাড়া করলে। ছিঃ, এ জানলে আমি কখনই আসতুম না। আজ আমায় কাঁদিয়ে দিলে তুমি। উঃ, কী কঠিন তুমি!

—এ কী, এত অভিমান তোমার শরীরে! আশ্চর্য, একেবারে কেঁদে ফেল্লে!

পঞ্চমীর দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, যাও যাও আর কথা বলতে হবে না!

পুষ্কর একটা নিস্পৃহ হাসি হাসিয়া বলিল, ইস্ এত touchy তুমি, জানতুম না। বেশ ত চল না আমাদের সঙ্গে, মা ত বল্লেই।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে পঞ্চমী বলিল, থাক আর ন্যাকামো করতে হবে না, যথেষ্ট হয়েচে। কায়দা করে কাটিয়ে দেবার কোনো দরকার ছিল না। আবার হাসচো? লজ্জাও করে না! কেন, মাকে কাটিয়ে দিতে পারলে না?

—মাকে কী বলে কাটাতুম, বল?

—ও, সে বুদ্ধি কী আমায় যুগিয়ে দিতে হবে? দরকার নেই যাবার, বলিয়া টিকিট দুখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুষ্করের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পুষ্কর টিকিটের টুকরাগুলা তাড়াতাড়ি করিয়া তুলিয়া লইয়া পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল, পাছে মা আসিয়া দেখিয়া কোনো প্রশ্ন করিয়া বসেন।

এদিকে পঞ্চমীর জন্য মনটাও একটু খারাপ হইয়া গেল, আহা বেচারা মনে যথেষ্ট আঘাত পাইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে। ভাবিয়া চট্ করিয়া দেওয়াল ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল,—হ্যাঁ তখনও যথেষ্ট সময় আছে—সবেমাত্র পাঁচটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইয়াছে। কিন্তু পা দুটা ত' চলিতে চায় না। অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—তাই তো, একেতো মা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইবেন, কেননা ব্যাপারটা যে কী তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না, আবার, সেটা জানিবার জন্যও তাঁহার প্রবল কৌতূহল জাগিবে। এই ভাবিয়া ঘরের বাহিরে না গিয়া জানালা দিয়া মুখটা বাড়াইয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৈ না তো—কোনো পঞ্চমীই তাহার নয়নগোচর হইল না।

ইতোমধ্যে এক কাপ চা হাতে করিয়া মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
—কী হল আবার গেল কোথায় মেয়েটা ? আশ্চর্য, বড় ছটফটে, বল্লে গেলুম বস একটু, আসচি, ব্যস্ আর দেখা নেই।

ঐ তো বলে কে, দেখো না মা, বড্ড চঞ্চল মেয়ে।

না:, এ মেয়ের চাকরি হওয়া দুষ্কর—বৃথা চেষ্টা করা।—ভাবলুম দুটো ঝোলের বড়ি খেতে দোবো, বড্ড ভালবাসে ও, তা ছাই গেল কোথায় না বলে ?

কী জানি,—কিছু ত বলে গেল না।

মা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, না এ ভারি ছটফটে মেয়ে দেখচি—না বলেই অমনি চলে গেল! থালি এম. এ-ই পাশ করেচে,—ব্যবহার শেখেনি। বলিয়া তিনি গরদের উত্তরীয়খানা গায় দিয়া লইলেন।

এগার

প্রতিদিন সকালে উঠিয়া উপাসনার পর কলি কিছু সময় ধরিয়া গীটার বাজনা অভ্যাস করে। আজও সে রোদের দিকে পিঠটা ফিরাইয়া দিয়া গীটার বাজাইতেছিল। এমন সময়ে পিয়ন আসিয়া একখানা থামে আঁটা চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

চিঠিখানা হাতে লইয়া কলি শুধু একটীবার ঠিকানাটার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গেল, কিন্তু খুলিল না।

সজল গভীর কৌতুহলের সঙ্গে চিঠিখানা দিদির হাত হইতে মৃদুভাবে টানিয়া লইয়া বলিল, এ আমার চিঠি, এ আমার চিঠি, আমি খুলবো, তুই খুলবি না দিদি, বলিয়াই আবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, না না, তুই খোল দিদি! কবে আসবেন লিখেছেন দেখ ত ?

কলি আবিষ্টচিত্তে চিঠিখানা পড়িয়া লইয়া মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিল, যা বলেছিলাম তোকে……

কেন রে ? আসবেন না, লিখেছেন বুঝি ?

না না, তা নয় রে।

তবে ?

এখনো আরও পনরো দিন পরে।

শুনিয়া সজল-এর মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। বলিয়া উঠিল, দাঁড়াও তো আমি আজই এক্ষুনি আবার লিখব। দেখি তাড়াতাড়ি আসে কি না। দাঁড়া দিদি, দাঁড়া, কাগজ কলম নিয়ে আসছি। বলিয়া সে ছুট দিয়া তাহার পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

কলির মনটাও ভিতরে ভিতরে যেন একটা বেদনাময় শূন্যতায় ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল হয়ত দুই এক দিনের মধ্যেই আসিয়া যাইবে। কিন্তু এ যেন এক দীর্ঘ দিনের বিরহ। মনে মনে ভাবিল সজলকে দিয়া আজই আবার তাহাকে একখানা চিঠি লেখাইয়া আসিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু কেনই যেন পারিল না, লজ্জা, সঙ্কোচ সব কিছুই আসিয়া গেল। অনুরাগের অস্থিরতা ! দুর্দ্দম ! দুঃসহ!—নারী পুরুষের প্রণয়পয়োধি মন্থন করিয়া ইহাকে যেন অমৃতের সহিত গরলবৎ পান করিয়া লইতেই হয়—তবুও মধুর, তবুও হ্লাদময়। কলি ভাবকাতর, তবুও মনে মনে বলিয়া উঠিল, ছিঃ, না, প্রয়োজনই বা কী ? যখন আসিবে লিখিয়াছে তখন তো আসিবেই। এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার সে গীটারটা হাতে লইয়া তন্ত্রীগুলির উপর দিয়া আঙ্গুল চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু মনও সরে না, আঙ্গুলগুলিও স্পন্দিত হয় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

এদিকে সজল ইত্যবসরে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছে। তাড়িতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, এই ভ্যাখ, এই ভ্যাখ দিদি, আমি একখানা চিঠি লিখে ফেলেচি।

—কী লিখলি রে, দেখি। বলিয়া চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া পড়িয়া ফেলিল।

—কী, হাসচিস্ কেন রে দিদি ?

—তুই একেবারে হুকুম করচিস্ কি না, তাই দেখচি।

—তা'না তো কী ? সত্যি, বেশ লাগে কিন্তু পুষ্করবাবুকে। এবার উনি এলে আমি কিন্তু আর কোনো কথা শুনব না—ঠিক ওনার সঙ্গে কোলকাতা চলে যাব, বলে দিলুম—তুই 'বারুণ' করতে পারবি না দিদি, হ্যাঁ বলে দিলুম।

—বেশ তো যাবি।—ঐ, কে এল দেখ তো?

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল।

কলি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত অবস্থায় ছিল। এতক্ষণ ধরিয়া নিজেকে সে নিজের মধ্যে এমনই নিবিড়ভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছিল যে, সে যে কোথায় ছিল এবং কী অবস্থায় ছিল তাহা তাহার এতটুকুও খেয়াল ছিল না। বসনাঞ্চল দেহ হইতে স্খলিত হইয়া গিয়া কখন মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, বেণীমুক্ত রুক্ষ-মসৃণ কেশদাম সাদা ফ্লানেলএর ব্লাউজের উপর দিয়া পিঠের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ বঙ্কুকে দেখিয়া বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত না হইয়া সে স্থির ভাবে অতি ঋজুভঙ্গীতে ডান হাতটা নাড়িয়া আঁচলটা উঠাইয়া লইয়া গা'র সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, কী গো বঙ্কুদা হঠাৎ কী মনে করে?

—কেন, আসতে নেই?

—কেন থাকবে না, নিশ্চয়ই আছে। বাবা, আচ্ছা ঝগড়াটে লোক যা'হক—একটু ঠাট্টা করবারও উপায় নেই। যাক, কেমন আছ বল? ক'দিন দেখিনা যে?

—কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অনেক কথা আছে, ঝগড়া করতেই এসেছি।

—তোমার তো ঝগড়া ছাড়া কথা নেই।

বঙ্কু পরিহাসচ্ছলে বলিল, মন্দ কী, ভাল লাগে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে। কলি স্মিতমুখে বলিল, তা কবে এ ঝগড়া মিটবে বলতে পার?

—সেই উত্তরটা তোর মুখ থেকে শুনব বলেই তো আজ এসেছি।

—কেন আমি কী কোনো ঝগড়া বাধিয়েছি নাকি? বলিয়া তাহাকে মাদুরের উপর বসাইয়া চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

শোন্! শোন্! আরে শোন্!

—আসছি বসো একটু, বলিয়া মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হল, ডাকলে কেন?

বঙ্কু অভিমানমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, দরকার নেই—আজ আর চা খাব না।

—থামো, আর অভিমান করতে হবে না, বলিয়া তাহার আর কোনো কথা না শুনিয়া কলি চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানা মোড়া টানিয়া লইয়া তাহার উপর বন্ধুকে বসিতে অনুরোধ করিয়া নিজে মাদুরের উপর ঠিক তাহার মুখোমুখী হইয়া বসিয়া পড়িয়া মুখভঙ্গীতে স্নিগ্ধগাম্ভীর্যের লাবণ্যময় রেখা টানিয়া হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল, চা খাবে না কেন শুনি ?

এলোমেলো ভাবে বন্ধু উত্তর করিল, এমনি।

কলি বলিল, এসব তোমার দুষ্টমি বন্ধুদা'। এত অভিমান কেন শুনি ?

—যাঃ, বাজে কথা বলিস না—এ তোর ভুল ধারণা।

—না, এতটুকুও নয়। তোমার চোখ-মুখের চেহারা বলচে তুমি অভিমান করেছ। আর তা যদি না হয় তা হ'লে বুঝতে হবে আমার ওপর রাগ করেছ।

বন্ধু মৌন রহিল। কিন্তু মৌনেরও একটা ভাষা আছে, এবং সে ভাষা এত কঠিন হইয়াও এত কোমল যে তাহা শুধু অন্তরের গভীরতম তলদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সে কোনো ব্যথিত হৃদয়কে বার বার সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে—কলির হৃদয়ের নিগূঢ় সত্তাটার কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। নিজেকে সে অটল স্থৈর্যের সহিত সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আশ্চর্য, তোমার শরীরে এত রাগ, এত অভিমান—আমি জানতুম না বন্ধুদা'। নিজেকে এভাবে ক্ষুণ্ন করে তুমি যে কী করে দেশের কাজ করবে তা ভাবতেও পারি না। একবার ভেবে দেখেছ কী ?

বন্ধু গম্ভীর স্বরে বলিল, কোনো প্রয়োজন মনে করি না।

—কিন্তু আমি মনে করি। লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ সাধনের বোঝা মাথায় নিয়ে যে লোক নিজের সুখ দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করবার মতো মনের সে দৃঢ়তা রাখে তার কী কখনো এ অভিমান সাজে ? রাগই ত মানুষের পরম শত্রু—কী বল, তাই নয় কী ?

—না, এ কথা সব সময় মানি না। প্রয়োজন বোধে এই রিপুটাকে মানুষকে কাজে লাগাতেই হয়, তা না হলে মানুষ হয়ে ওঠে অমানুষ।

—এটা তোমার ভুল কথা বন্ধুদা'। যে কাজের ভার তুমি নিয়েছ তা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তুমি চাইছ সমাজসেবার কাজ করতে ; কিন্তু সেবার কাজ যাঁরা করেন তাঁরা একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে তেমন কোমল ; কঠিন তাঁদের পণ, কোমল তাঁদের হৃদয়। অসীম তাঁদের ধৈর্য্য, কর্মের প্রতি উৎসাহও

তাঁদের অদম্য। সুতরাং তোমার এ অভিমান করা বা রাগ করা সাজে না। তুমি মুক্ত পুরুষ হও, সমস্ত অহং ভাবকে তুমি ত্যাগ কর। তুমি গীতার শিক্ষা গ্রহণ করেছ; তুমি কর্মকে যখন তোমার জীবনের যজ্ঞরূপে জ্ঞান করে নিয়েছ তখন ভেতরের ত্যাগকেই তোমার বড় ত্যাগ করে দেখতে হবে। তুমি নিরুদ্বেগ হও, স্থিতধী হও, সাধক হও, তবেই তুমি তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারবে বঙ্কুদা।

—আমি sermon শুনতে চাই না। পলিটিক্সএ কোনো বিনয় চলে না।

—আমি বিনয়ের কথা বলচি না। বলচি, তোমার ভেতরের মানুষটিকে তুমি ঠিক করে গড়ে তোলো বঙ্কুদা'—অস্থিতধী হয়ো না। আমার কথা এই, অন্যের মতকে গ্রহণ করবার ইচ্ছা না থাকলেও অন্তত সেটার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর উদারতাটুকু প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে থাকা উচিত।

বঙ্কু দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যে মতকে কখনই গ্রহণ করব না তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে কিছুতেই কলুষিত করব না! যখন আমি এবং আমার পার্টির অনুগামীরা নিপীড়িত মানুষের ও সমাজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করেচি তখন এসব প্রশ্ন একেবারেই ওঠে না।

কলি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, তার মানে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও, অথচ যুক্তিতর্কের ভেতোর দিয়ে তোমার সমাজসেবা আদর্শের মূল স্বরূপটি যে কী, তা তুমি এখনো পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন করতে পারলে না। শুধু আমার ওপর রাগ করছ আর অভিমান করছ।

—কিন্তু যে বুঝতে চাইবে না তাকে বোঝাবো কী করে? শিখেছিস্ ত কেবল কংগ্রেস আর ভূদান যজ্ঞের কথাই বলতে। কেবল নিজের কথাই বলে যাবার চেষ্টা করিস্—রাগ হবে না তো কী?

—চেষ্টা করতে দোষ কী, তুমি বিপথে যাচ্ছ, তোমাকে কল্যাণ পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করতে হবে আমাকে। দেখচি তোমাকে convert করতে পারি কিনা। কী জান বঙ্কুদা', গান্ধীজী যখন চরখা আর খাদি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতেন তখন দেশের কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোক তাঁকে ঠাট্টা করতে ছাড়েন নি; এমন কী তাঁকে অনেকে পাগলও বলেছেন, অর্থনীতিজ্ঞানহীনও বলেছেন,

এমন কী কবিগুরুও এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে ছাড়েন নি। তবুও তিনি তাঁর লক্ষ্যপথ থেকে এক চুলও নড়েন নি। প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্ক মারফৎ—আমারও কথা তাই।

বঙ্কু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, থাক্‌, থাক্‌, তোর ঐ একঘেঁয়ে কথাগুলো আর শোনাস নি। সব কথায় ঐ গান্ধী নামটা না করলেই নয়। তার যুগ চলে গেছে অনেক দিন। যেমন বিনোবাজীর পাগলামো—সমস্ত ভূএর মালিক যখন সমাজ তখন ভূদান যজ্ঞ একটা বিনয়—ধনতান্ত্রিকতার কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা,—কেন আমরা দানের অপেক্ষায় থাকতে যাবো? সব কিছু সমাজের হাতে তুলে দোবো। ঐ গান্ধী নামটা আর করিস না, ভাল লাগে না, পছন্দ করি না। ওসব, রূপকথার মতো শোনায়।

কলি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, এ জীবনটাই ত একটা রূপকথার মতো। এই রূপকথাটাকে যে যত সুন্দর ভাবে গভীর চিন্তার ভিতর দিয়ে বলতে পারে তাকেই তো মানুষ বেশী করে চায়। এবং সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়। জীবনের প্রকৃত রূপ তো তাঁরাই দর্শন করতে পারেন। বিশ্বলোক তাঁদের সেই রূপকথাগুলো শোনবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব, কত উৎসাহী। কিন্তু সকলের সে রূপ দর্শন করবার মতো সে ক্ষমতা নেই। তা দেখতে হ'লে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। সে দিব্য চক্ষু যে দিন তোমার মধ্যে ফুটে উঠবে সে দিন তুমি সব কিছুই দেখতে পাবে। আমি দেখছি অর্জ্জুনের মতো অবস্থা হয়েছে তোমার। তোমার মধ্যে তাই আমি সেই দিব্য চক্ষু ফুটিয়ে তুলতে চাই—তোমার এ-চোখ দিয়ে তুমি গান্ধী-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারচ না।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌॥

বঙ্কু একটা ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, থাক্‌ থাক্‌ ঢের হয়েচে, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওসব কথা ধর্মমন্দিরে বসে বলিস, অনেক শ্রোতা পাবি। আমি "গান্ধী-রূপ" দর্শন করতে চাই না।

কলি স্মিতমুখে বলিল, একটু ধৈর্য্য ধরে শোনোই না কেন, বঙ্কুদা'। দোষ কী? ধর তোমার Political malaria হয়েছে, বিনোবাজী তোমাকে গান্ধীবাদের কুইনিন বড়ি খেতে বলচেন। খাও না, ক্ষতিটা কী?

বঙ্কু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে বলিল, ব্যাধি আমার হয়নি তোর হয়েছে ; ও বড়ি তুই খা। আমাকে আর ঐ গান্ধীমার্কা কংগ্রেসের ঘৃণ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ধাপ্পাবাজিতে ভুলিয়ে নেবার চেষ্টা করিস নি,—তাহলে, মস্ত বড় ভুল করবি।

কলি স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল, বঙ্কুদা, একটু ধৈর্য্য ধর। দাও না নিজেকে বিলিয়ে, ক্ষতিটা কী ? গান্ধীবাদের ওপর তোমার এতটা অনাস্থা কেন ? নয় নিজেকে কিছুটা অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু সমাজে কোনো মহৎ কাজ করতে গেলেই নিজেকে অনেক সময় অস্বীকার করতে হয় মানুষকে—উপায় নেই! ত্যাগের ভেতোর দিয়েই ত অন্তরের দীনতাকে জয় করতে হবে, তা না হলে বাধা আসবে পদে পদে, সংগ্রাম করবার শক্তিটাও হীন হয়ে আসবে। গান্ধীজী কি বলেছেন জান,·········

বঙ্কু ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আবার ঐ গান্ধী নামটা করবি ত উঠে যাব। গান্ধীবাদকে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়েও সমাজের কল্যাণ সাধন করা যায়। আমাকে ভুল বোঝাতে আসিস নি, কলি। দেশকে অনেক পিছিয়ে দিয়ে গেছে ঐ লোকটি, বুঝলি, সুতরাং ও নামটা বার বার আর উচ্চারণ করিস না।

—আচ্ছা একটু বসো আসছি। তোমার এ কথার জবাব দিচ্চি। বলিয়া কলি উঠিয়া পড়িয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে প্রকাণ্ড একটা কাপে করিয়া এক কাপ চা ও কিছুটা মুড়ি ও কতকগুলা বেগুনি ও আলুর চপ একটা প্লেটে করিয়া লইয়া আসিয়া মাদুরের উপর রাখিয়া বলিল, এসো, চা খেয়ে নাও আগে, তারপর কথা হবে।

বঙ্কু মুখখানা যেন কেমন করিয়া রহিল—এমন কী চা'র কাপটার দিকেও পর্যন্ত চোখটা ফিরাইয়া তাকাইল না। কলি চামচ দিয়া চা'টা নাড়িতে নাড়িতে ওষ্ঠাধরে একটা সরল স্বচ্ছ হাসির রেখা টানিয়া বলিল, আচ্ছা বঙ্কুদা, তুমি একটুতেই অত উত্তেজিত হয়ে ওঠো কেন বলত, তাতে তোমার নিজেরই ত' ক্ষতি। যে সঙ্কল্প তুমি নিয়েছ তা দুশ্চর তপস্যার মতো, তাকে তুমি ত্যাগ করতে পার না কখনই। ও কী ? ও ভাবে বসে আছ কেন ?—বলিয়া চায়ের কাপটা তাহার হাতের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, এস, ধর!

বঙ্কু রুক্ষ স্বরে বলিল, নিচ্ছি রাখ! বলিয়া পুনরায় রুক্ষস্বরে বলিয়া

উঠিল, তুই আমাকে betray করছিস,—বলত. ভুবনবাবুর ওখানে কেন গিয়েছিলি ?

—এ কথার জবাব তুমি পাবে।—তা, চা'টা খাও, বেগুনিগুলো জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল যে! আশ্চর্য লোক বটে তুমি।

—কেন, কথাটা কী সত্যি নয় ? আমাকে কী কথা দিয়েছিলি বলত, মনে আছে ?

—নিশ্চয়ই আছে। আমি আজও বলচি, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তোমায় সাহায্য করব—এতে এতটুকুও ছলনা নেই।

বঙ্কু ক্ষণকালের জন্য যেন কেমন হইয়া গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কলির মুখপানে সে এমনই একটা নীরব আত্মসমর্পণের স্নিগ্ধ সরল ভঙ্গী করিয়া তাকাইয়া রহিল যেন তাহার ঐ অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া, কলি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, একটিবার সহাস্য মুখে বলে, এই নাও বঙ্কুদা', চা খাও, আমি তোমার কথায় এতটুকুও দুঃখিত হয় নি, অভিমান করিনি।

বঙ্কু এতক্ষণের পর চা'টা হাতে লইয়া সহাস্যমুখে বলিল, কিছু মনে করিস না কলি, আমি বোধ হয় ভুল শুনেছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—স্বচ্ছন্দে।

—আচ্ছা, ভুবনবাবু কী তোকে দলে টানতে চান ?

—অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন করলে বঙ্কুদা'।

—কেন এমন কী জটিল যে সে কথার সোজা উত্তরটা দিতে পারছিস না ?

—জটিল বৈ কী, অত্যন্ত জটিল। এটা ত তোমার ভাল ভাবেই জানা উচিত যে সরকারী চাকরী করে, কেউ কখনো সক্রিয় ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে পারে না। তাছাড়া আমি ত কংগ্রেসের মধ্যে নেই।

—কিন্তু আছিস ত দেখছি।

—কে বল্লে ?

—কেন, বিলয়ের কাছ থেকে শুনেছি।

—কি শুনেছ, বল ত। সব কথা না শুনে, না বুঝে অনর্থক নিজের মনকে কষ্ট দাও কেন। মানুষ যে কী করে রাগ করে তা আমি কখনো ভাবতেও পারি না।

বঙ্কু ক্ষমাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে কলির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, কিছু মনে করিস নি কলি—আমি বোধ হয় ভুল শুনেচি।—বাঃ, ভারী সুন্দর চা হয়েছে ত।

—দাঁড়াও, তাহলে আর এক কাপ এনে দি।

—না থাক, বস, আবার পরশু এসে খাব।

—আচ্ছা তা' হ'লে পরশু এস কিন্তু, ভুলে যেও না যেন আবার ইচ্ছে করে, তোমার তো আবার একটুতেই রাগ হয় কিনা।

—সত্যি, আমি একটুতেই একেবারে উত্তেজিত হয়ে উঠি কেন, বলত? বুঝতে পারি না কেন এটা হয়—ছিঃ।

—কিন্তু উত্তেজিত হয়ে ওঠা বা রাগ করা ভুল, বঙ্কুদা'।

—কিন্তু, পুরুষের শরীরে রাগ থাকবে না, এ কেমন কথা। ক্রোধই ত পৌরুষের লক্ষণ।

—সেটা হল তেজ, ক্রোধ নয় বঙ্কুদা'। রাগ মানুষকে হীন করে ফেলে, তেজ মানুষকে মহত্ত্বের স্পর্শলাভে সহায়তা করে। তেজ রাখ, ক্রোধ রেখো না কখনো মনে।

বঙ্কু একটা সঙ্কোচহীন হাসি হাসিয়া বলিল, বুঝলি কলি, দরকার হলে আমি মানুষকে খুনও করতে পারি।

কলি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রয়োজন হলে আমিও আমার এই তুচ্ছ জীবনটাও দান করতে পারি, তবে মানুষকে খুন করতে বা করাতে পারি না। বলিয়া হঠাৎ বঙ্কুর মুখের উপর একটা গভীর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে খুন করতে পার? আশ্চর্য, তুমি এত কঠিন! না, এত কঠিন হয়ো না বঙ্কুদা'। উঃ, আমি কল্পনাও করতে পারি না।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে সমস্ত বেগুনি ও চপগুলা শেষ করিয়া ফেলিয়া বঙ্কু একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, অত্যন্ত কোমল বলেই কঠিন হতে আমার এতটুকুও দ্বিধা নেই, দুঃখ নেই। আমি অন্য রক্তে তৈরী কলি, আমি অন্য রক্তে তৈরী।

কলি, শান্ত কণ্ঠে বলিল, বুঝেছি তোমার হল রক্ত নেবার নেশা আর আমার হল রক্ত দেবার। কিন্তু তুমি ভুল পথে চলেছ।—যাক্‌গে, ও সব কথা এখন থাক। আচ্ছা, এবার বলত, বিলয়ের কাছ থেকে কী শুনেছ?

—তুই নাকি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিস্ এবং কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবি বলেছিস—তাই ভুবনবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে চাস।

কলি স্থির চিত্ত হইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, যা শুনেছ তার সমস্তটাই সত্য নয়। কংগ্রেসে আমি যোগ দিই নি তবে কংগ্রেসকে ভালবাসি। ভুবনবাবুর সঙ্গে এখনো পর্যন্ত পরিচিত হই নি।

বঙ্কু মুহূর্তের মধ্যে একটু গম্ভীর হইয়া গেল ; মুখের হাসিটিও তাহার কোথায় মিলাইয়া গেল। রূঢ়কণ্ঠে বলিল, সত্যি কথা বলতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে ?

—এতটুকুও নয়। সত্য কথা বলতে কোনদিনও ভয় পাই নি, পাবও না।

বঙ্কু পূর্ব্বের ন্যায়ই সেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, বুঝেছি সব কিছুই। যাক, এখন আর তর্ক করে সনয় নষ্ট করতে চাই না। অবশ্য যদি তুই মনস্থ করে থাকিস যে কংগ্রেসে যোগ দিবি, তা হলে, আর আমার কাজে সাহায্য করববার দরকার নেই।

কলি মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমার এ ভুল ধারণা। বঙ্কুদা' আমাকে ভুল বুঝো না, আমি সমাজসেবার কাজ ভালবাসি। আমি আবার বলচি, আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো। ভুবনবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, তাতে কী হয়েছে, তাঁর কাছে যেতে দোষটা কী—আমি ত কোনো দলেই নেই। গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় সমাজ গঠন সে তো সকলেরই জন্য। তাঁর সঙ্গে কারো বিবাদ থাকতে পারে না। বিনোবাজীর সঙ্গে কী কারু ঝগড়া থাকতে পারে ?

বঙ্কু সহসা যেন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কলি যেন একটা বিষময় মোহদণ্ড হাতে লইয়া তাহাকে বিপথগামী করিয়া তুলিয়া, ধীরে ধীরে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। দারুণ ক্রোধে তাহার সর্ব শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা আগুনের স্রোত খেলিয়া গেল। উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল' ওসব অবান্তর কথাগুলো না তোলাই ভাল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্ব্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হবে না, কেননা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাও সর্ব্বোদয়ের আঠারো দফা গঠনকর্মের একটা অংশ। সে দিকে কংগ্রেসের কোনো প্রচেষ্টাই নেই। তুই আমায় ভুল বোঝাবার চেষ্টা করিস না কলি। বার বার আর আমার কাছে ঐ নামটা করিস না, রাগে সর্ব শরীর জ্বলে ওঠে। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কিছু নেই এবং তাদের যারা সাহায্য করে তাদের সঙ্গেও আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

কলি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি ।আমার ওপর অবিচার করছ বঙ্কুদা', আমাকে ভুল বুঝ না। আচ্ছা বেশ, গান্ধীজীর নামটা নয় তোমায় সহ্য না হয়, কিন্তু স্বামীজীর নামটা বোধ হয় তোমার নিশ্চয়ই সহ্য হবে, আশা করি। বলিতে বলিতে সহসা একটা প্রশান্ত আবেগের উত্তেজনায় কলির সর্বাঙ্গ মৃদু মৃদু শিহরিত হইয়া উঠিল ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আমি বলব আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ লেনিনের থেকেও মহত্তর শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। অত বড় মহান্ শক্তিমান্ ধীমান্, তেজস্বী মহাপুরুষ, বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দিতে ভারতের মাটিতে আর জন্মগ্রহণ করেননি। আজ যদি আমি বলি গান্ধিজী ও বিনোভাজীর সর্ব্বোদয় সমাজ গঠন স্বামীজীর মহত্তম সমাজসেবা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ তবে :বোধ হয় এতটুকুও ভুল হবে না। তুমি স্বামীজীকে শ্রদ্ধা কর নিশ্চয়ই ?—যাক্ আচ্ছা তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার কী, কেন তুমি কংগ্রেসকে পছন্দ কর না ?

বঙ্কু দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন পারব না নিশ্চয়ই পারব এবং প্রতি পদে পদে আমি দেখিয়ে দোবো কংগ্রেসের দোষ ত্রুটি কোথায়—এর মতো এত বড় একটা শোষণযন্ত্র আর নেই। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করচে তো এরা, একে-বারে গলা টিপে না মেরে তিলে তিলে সমাজেব অবহেলিত ক্ষুধার্ত মানুষকে মারচে এরা। এই শোষণযন্ত্রটিকে ভেঙ্গে দিতে না পারলে ভারতের প্রতিটি নরনারীর জীবনে কোনদিন সুখ ও শান্তি আনা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে না। আমি কোনদিনও কংগ্রেসে যোগ দোবো না, বরং তুই আমাদের মধ্যে চলে আয়।

কলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, এ তুমি স্বপ্ন দেখচ বঙ্কুদা'। যার বুনিয়াদ শক্ত তাকে তুমি এত সহজেই কাত করে ফেলবে ?

বঙ্কু গর্ব্বিত স্বরে বলিয়া উঠিল, ফেলব বৈ কি নিশ্চয়ই ফেলবো! এ কংগ্রেসকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দোবো না!

কলি ধীরকণ্ঠে বলিল, তোমাদের হাতিয়ারটা কী ?

—বিদ্রোহ, বিপ্লব।

—সশস্ত্র না বিনা অস্ত্রের ?

—দেশের মানুষ যা চাইবে তাই।

—তোমার দেশের মানুষ যে কী চায় তা তারা জানে না। তোমরা

দের মুখ দিয়ে যা বলাও তাই তারা তোতার মতো বলে যায়। তাদের নিজেদের বিবেকের কাছে তারা চোর হয়ে বসে আছে। বিদ্রোহ, বিপ্লব এর তারপর্য, এর মূল্য তোমার দেশের লোক জানে না, এবং শুধু তাই নয়, যারা তাদের নেতৃত্ব করে তারাও বিদ্রোহের বহ্নি কী করে যে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে হয় তাও জানে না। যাদের মধ্যে ত্যাগের স্বতঃস্ফুর্ত্ত চেতনা জাগে নি তারা কখনো নিজেদের পা'য় দাঁড়াতে পারে না।

বঙ্কু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ সব তোর প্রতারণার কথা। বিদ্রোহ কাকে বলে দেখিয়ে দোবো। এই কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করব।—তুই দেখে নিস।

কলি একটা সংযত হাসি হাসিয়া বলিল, কংগ্রেস ছাড়া কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করতে পারে কে, জানি না। আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছেড়ে দাও, ছাঁটাই করা চলবে না, মাগ্‌গিভাতা বাড়িয়ে দাও ইত্যাদি কতকগুলো ছেঁদো কথার মধ্যে এতটুকুও প্রাণশক্তি নেই, যেন পাঁচ টাকা বা দশ টাকার দাবী আদায় করে নিতে পারলেই তাদের সব দুঃখ ঘুচে যায়। হাসিও পায়—এরই নাম তোমাদের বিদ্রোহ, এরই নাম তোমাদের আন্দোলন। এই ধরণের বিদ্রোহের সাহায্যে তুমি কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করবে, ভাবচ ? একেবারেই অসম্ভব।

—এই অসম্ভবকেই সম্ভবপর করে তুলতে হবে।

—পারবে বলে ত মনে হয় না। ভারতের লোক কোনো দিন সে ধরণের বিদ্রোহ চায় না, বা তা করবার মতো সে মনের জোর তাদের নেই, সে শিক্ষাও নেই। রাশিয়া বা চায়নাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে ওঠাও ভুল হবে। আগে দেশে মানুষ তৈরী কর, তারপর বিপ্লব বা বিদ্রোহের কথা চিন্তা কোরো। বিদ্রোহ করতে পারে তারাই যারা সত্যিকারের সত্যাগ্রহী, যারা আমরণ পণ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। তোমাদের যা কিছু সবই তো হুজুকের ব্যাপার।

বঙ্কু উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, অত্যন্ত অবুঝের মতো কথা বলছিস্! এই strike বা দাবীর আন্দোলনের ভেতোর দিয়েই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়—এই ভাবেই আমরা শক্তি সঞ্চয় করব, করেওচি।

—those are ripples on the surface, এ তো জলবুদ্‌বুদের মতো—শুধু

ক্ষণিকের আস্ফালন ছাড়া কিছু নয়। যে দিন থেকে এই সংবিধানকে তোমরা মেনে নিয়েছ সেদিন থেকে তোমাদের সংগ্রাম করবার শক্তি হারিয়েছ। যদি দেখতুম যে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্ম আমরণ পণ নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছ তাহলে বুঝতুম তোমাদের সে শক্তির মানে আছে। তোমরা ত্যাগে পিছিয়ে আছ।

—ত্যাগ আমরা যথেষ্টই করেছি, এবং করছিও।

—এ তোমার ভুল কথা বঙ্কুদা, ত্যাগের সে স্পৃহা তোমাদের মধ্যে নেই। নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে আপোষ করে নিয়ে তোমরা জনচেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, আজও করছ।

—কখনই না। ত্যাগ আমরা আজও করচি।

—সে মনের জোর উগ্রপন্থীদের নেই। তাই যদি থাকত তাহলে এ ইলেকসনে তোমরা কিছুতেই নামতে না। তোমরা শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলবার আশা দিয়ে যাদের ভুলিয়ে রেখেছ তাদের তোমরা নিষ্ঠুর ভাবে প্রতারণা করেছ। অথচ, তোমরা যদি সর্বোদয় সমাজ গঠনের প্রতি নজর দিতে তাহলে শ্রেণীহীন অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়ে উঠত—গান্ধীজীর কল্পনাও তাই ছিল, বিনোবাজীর লক্ষও সেই দিকেই বলে মনে হয়।

—না আমরা তাদের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করিনি। তাদের জন্যই তো এ সংগ্রাম। বিনোবাজীর ঐ দুর্বল সংগ্রাম আমাদের জন্ম নয়।

—বুঝেছি, ইলেকসনে জিতে বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বাহবা নেবার নামই হল তোমাদের সংগ্রাম; যা কিছু এই সরকার করবে তার নিন্দে করে নাম কেনবার নামই হল সংগ্রাম। অর্থাৎ কংগ্রেসের নামে ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করার নামই হল সংগ্রাম।

বঙ্কু সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল বা:, বা:, বেশ বল্লি তো ইলেকশন থেকে কেন আমরা সরে দাঁড়াব? নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামতেই হবে আমাদের—গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচন পরিহার করা মূর্খতা। কংগ্রেসকে পরাজিত করতেই হবে। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো মানেই কংগ্রেসকে স্বৈরাচারী হবার সুযোগ দেওয়া।

—এটা তোমাদের ভুল পথ, সম্পূর্ণ আত্মঘাতী পথ। এর নাম হল বিলুপ্তির পথ। তোমাদের উগ্রপন্থী দলগুলো এই করে দিন দিন তাদের অস্তিত্ব

বিপজ্জনক করে তুলচে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসবে যখন তোমাদের সকলের ভারতের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সময় ঘনিয়ে আসবে। অবশ্য কংগ্রেসের দিক থেকে বিচার করে দেখলে তাতে ভালই হবে।

বঙ্কু ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ চিন্তা করেই বসে থাক। কংগ্রেসের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে কিনা, তাই ঐ কথা বলচিস্।

কলি ধীর কণ্ঠে বলিল, বেশ ধরলুম নয় তোমরা, উগ্রপন্থীরা, এ নির্বাচনে জিতলে, কিন্তু এ জয়লাভের কোনো মূল্য নেই। শেষ পর্যন্ত তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমরা তোমাদের লোভকে জয় করতে পারবে না ; লোভ থেকে আসবে হিংসা, হিংসা থেকে আসবে কলহ, কলহ থেকে সৃষ্টি হবে দলাদলি ; দলাদলি থেকে জন্মাবে দলীয় দুর্বলতা। তারপর দলীয় দুর্বলতা থেকে যা হয়, পার্টির ওপর অনাস্থা আসে, অবার অনাস্থা এলেই দল ভেঙ্গে ছন্নছাড়া হয়ে যায়, তখন যে পার্টীটা শক্তিশালী বেশী তাতেই গিয়ে যোগ দেয় জনশক্তি। এখানে সর্ব্বশক্তিমান কংগ্রেস, সুতরাং এতেই সকলে এসে যোগ দেবে।

বঙ্কু পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের ভিতরে না থাকিয়া বাহির হইতে ইহাকে আন্তরিকতার সহিত সাহায্য করিয়া কলি নিশ্চয়ই উগ্রপন্থীদের সর্বনাশ ঘটাইয়া তুলিবার নিমিত্ত তলে তলে চেষ্টা চালাইয়া যাইবার উদ্দেশে ভুবনবাবুর সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ একটা কঠিন ধারণা বঙ্কুর মনের মধ্যে পাকাইয়া উঠিল। তাই অত্যন্ত রূঢ় কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আজ আমি বুঝতে পারচি কলি, তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবি।

কলির প্রশান্ত মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ সরল হাসির ছবি ফুটিয়া উঠিল। বঙ্কুর মুখের উপর একটা স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, সে দিনকার চায়ের দোকানের ঘটনাটার সম্বন্ধে তুমি তো সব কিছুই শুনেছ বঙ্কুদা'। তোমার দলের লোকেরাই তোমার সর্ব্বনাশ করচে বেশী। আমি কংগ্রেসেই থাকি, বা তার বাইরে থাকি, তাতে তোমার লাভ ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু তুমি যদি কংগ্রেসে এসে যোগ দাও তাহলে—আমার মনে হয়—কংগ্রেস এবং আমাদের দেশ তাতে খুব বেশী ভাবে উপকৃত হবে। সুতরাং সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার কিছু নেই।

বন্ধুর বিদ্রোহী মন কলির কোনো যুক্তিই স্বীকার করিয়া লইতে অক্ষম। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস শক্তির অঙ্কুশ দ্বারাই শক্তির সহিত লড়াই করিয়া যাওয়াই মানুষের ধর্ম্ম। তাই কলির কথাগুলি শুনিয়া সে আরও বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, বিনয় বা গোপাল, তারা এতটুকুও অন্যায় করে নি সে দিন! দোষ শক্তিদারও ছিল।

—হয় তো ছিল। কিন্তু অন্যের দোষ ধরে নিজের দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে partyর সমষ্টিগত ক্ষতি সাধন করা কী সমীচীন? তোমাদের মধ্যে এত বিভেদ, এত ঝগড়া কেন, জান—শুধু আত্মশুদ্ধির অভাব বলে, এবং যার জন্য তোমাদের দলগত দুর্বলতা।

—কেন কংগ্রেসের মধ্যে নেই?

—আছে, কিন্তু সেটার স্বরূপ আলাদা। কংগ্রেসের বাইরে থেকে, কতিপয় কংগ্রেসকর্মী হয়ত ক্ষমতা লাভের আশায় অন্য দু'চার জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে হিংসা করে থাকে, এবং তারাই কংগ্রেসের বদনাম করে বেড়ায়। তাদের মধ্যেও আত্মশুদ্ধির অভাব আছে, স্বীকার করি। কিন্তু কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি নেই তাতে। পরের দোষ ধরা স্বভাবটাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে ঐ দুর্বলতাটাই প্রবল। সেই জন্যই তোমরা উগ্রপন্থীরা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়চো।

—এটা তোর ভুল ধারণা। আজ উগ্রপন্থীরা আছে বলেই কংগ্রেস স্বৈরাচারী শাসনের নগ্নমূর্ত্তিটা সমাজের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠছে। উগ্রপন্থীদের তারা দস্তুরমতো ভয় করে; এবং ভয় করে বলেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের কিছুটা লোক-দেখান উপকার করবার চেষ্টা করে তারা। তারা benevolent despotsদের মতো, অর্থাৎ Philosopher kingsদের মতো, উদারতা দেখাতে আরম্ভ করেচে,—কিছু দিয়ে সব কিছু আদায় করে নেবার চেষ্টা। তারা যা কিছু করচে যেন দয়া করেই করচে, যেন কিছু না করলেও কিছু বলবার নেই। বলিতে বলিতে সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, এগুলোকে গুলি করে মারলেও রাগ যায় না।—আঃ! ঐ আবার উৎপাতটা এলো!

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না॥

তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা .

ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবেনা, ভাব দেখে কী যায় না জানা।

গাহিতে গাহিতে ভৈরব সন্ন্যাসী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার ডান হাতে একটা একতারা, ললাটে শ্রীখণ্ডের তিলক কাটা, কণ্ঠে ঘুনসিতে গাঁথা তুলসীর মালা, সৌম্য মূর্ত্তি, মুখে সদা প্রফুল্লতার ও বিনয়ের কখনো ভাবেভরা, কখনো সরল হাসি। নধর দেহটি ঘিরিয়া এক গৈরিক রঙের উত্তরীয়, পরণে ফিকে জাফরাণী রঙের আট হাতি মোটা ধুতি। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বিদ্যানুরাগী, সংসার বিরাগী—আপন ভোলা—কিন্তু কালীভক্ত।

ঝপ করিয়া দাওয়ার এক কোণে বসিয়া পড়িয়া ভৈরব পরিহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিল, অত গুলি মারামারি কিসের। কি গো দাদাঠাকুর, অত গুলি মারছো ক্যানে ?

বঙ্কু কর্কশ কণ্ঠে তাহাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিয়া উঠিল, থাম্ থাম্ Stupid ! এটা এখন কালীনাম শোনবার সময় নয়। যা, যা, সরে যা এখান থেকে !

ভৈরবের শরীরে যেন এতটুকুও রাগ নাই। বয়সটাই বা তাহার এমন কী ? বলিতে গেলে বঙ্কুরই সমবয়স্ক। তবুও যেন তাহার মুখের হাব-ভাবে কোথাও বিন্দুমাত্রও বিরক্তি বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। হাস্যমুখে বলিয়া উঠিল, তোমার ঐ এক কথা দাদাঠাকুর, ঐ এক কথা। তুমি যেন বাংলা দেশে স্বর্গ রাজ্যি এনে দেবে, তোমাদের ক্যানে ভোট দিয়ে পাঠান হবেক না। উ সব ইন্‌কিলাবের দিন হুঁয়ে গেঁইছে।

বঙ্কু এইবার কিছুটা গাম্ভীর্যের সহিত বলিয়া উঠিল, অসভ্যতা করিস্ না ভৈরব, হয় চুপ করে বসে থাক, আর নয় বেরিয়ে যা এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে কলিও মৃদু কণ্ঠে বলিল, আঃ, চুপ করে একটু বসো না সন্ন্যাসীঠাকুর !

—একট গান শুন্‌বে তো বস্‌ছি। একট গান শুন।

না ! এখন কেউ তোর গান শুনতে পারবে না, এখন চলে যা এখান থেকে ! বলিয়া বঙ্কু মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, বড্ড জ্বালাচ্ছে ! ওকে পরে আসতে বল কলি।

কলি ভৈরবের মুখপানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বিনীত কণ্ঠস্বরে বলিল, একটু পরেই নয় ঘুরে এসো, সন্ন্যাসীঠাকুর।

ভৈরব হাসিতে হাসিতে বলিল, আর ঘুরতে টুরতে লারবো দিদিভাই, সামনেই শিবরাত্তি, বক্কেশ্বর যেতে হবে। এখুনি যাবো উই তুল গোবিন্দর ঘর, আর আমাকে বসাঁই রেখো না দিদিভাই, কিছু পয়সা দাও, আর গান শুন একট। গান্ধীবাদ আর উগ্রবাদ নিয়ে একট কবিগান বেঁধেচি।

বঙ্কু বিষম বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল, এ যেন একটা আপদগোছের আসিয়া জুটিয়াছে—একেবারে গণ্ডারের চামড়া—এতটা ভৎসনার পরেও নির্বোধের মতো হাসিয়া হাসিয়া সব কিছু গায় মাখিয়া লইতেছে। মনে মনে বলিয়া উঠিল, আশ্চর্য, হত ভাগার শরীরে এক ফোটা রাগ পর্যন্ত নাই, এমন কী রাগাইয়া দিলেও রাগে না, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিযাও লাভ নাই। এই ভাবিয়া বঙ্কু বলিয়া উঠিল, কেউ তোর গান এখন শুনবে না, উঠে যা এখান থেকে। জ্বালাস না আর।

ভৈরব একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, একটু জ্বল্‌লেই বা দাদাঠাকুর, তাতে ক্ষতিটোই বা কী? যখন ভোট পাবে না তখন তো আরও জ্বলবে।

—ভোট আমাকে দিতেই হবে রে, ভোট আমাকে দিতেই হবে, ভোট না দিলে না খেতে পেয়ে মরবে সব লোক!—আচ্ছা, এখন ওঠ তো বাপু!

কলি বলিল, হ্যাঁ, এখন একটু ঘুরেই এসো সন্ন্যাসীঠাকুর।

ভৈরব মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে একটা অলৌকিক হাসি হাসিয়া ইহ-জীবনেষ সূক্ষ্ম দর্শন আওড়াইয়া বলিল, ই জগতে কিছুই সত্যি লয়, সব মিছে রে দাদাঠাকুর, সব মিছে। এই দু'দিনের জীবনে যে যেমন কাজ করবেক সে তেমনই ফল পাবে—হঅ। সবই এই কপাল—মানুষের নিজের কিছুই করবার ক্ষ্যামতা নাই। তুমি কিছুই করতে লারবে। এই দুনিয়ার যে মালিক তাঁরই হাতে সব।—বলি ও দিদিভাই! যা করবে তাড়াতাড়ি কর, ই দিকে সুময় যে চলে যেঁছে।

কলি জানে ভৈরব গান না শোনাইয়া কিছুতেই বিদায় লইবে না, যদিও বা নেয়, তবুও কিছু ভিক্ষা না লইয়া সে ছাড়িবেই না। তাই ভৈরবকে বসাইয়া সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।—আঁচলে একটিও পয়সা নাই।

বঙ্কু বলিল, এ সব ভণ্ডামি ছেড়ে খেটে খা, ভৈরব, খেটে খা—ওঃ, তোদের মতো কতকগুলো ভণ্ডতে মিলে দেশের অনেক সর্বনাশ করছে।

ভৈরব হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাদের চেঁয়ে তুমরা বেশী ভণ্ড

দাদাঠাকুর। তুমরা ত শুধু কথা ভুঁলুয়ে খেয়ে যেছো ; আমরা কিন্তু খেটেই খাই। এই যে গান করি ইতে কী খাটুনি নাই ? বেশ খাটুনি আছে। এই যে দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে গান করি, ই বড় কম খাটুনির কাজ লয়। তুমি যে এই বকৃতিতা দিয়ে ঘুরে বেড়াও তাতে কী এমন খাটুনি আছে ? বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু না হইয়া আবার দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

বঙ্কু দেখিল, এ যেন একটা বিষম আপদ, নড়িবার নামটি করে না। তাই সে আর কথা বাড়াইল না।

ইত্যবসরে কলি ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, ওর পেরে সঙ্গে উঠবে না বঙ্কুদা'।—এই নাও সন্ন্যাসীঠাকুর, পয়সা নাও। বলিয়া একটা সিকি তাহার ডান হাতের কাছে বাড়াইয়া ধরিল।

ভৈরবের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা ভাব আসিয়া গেল। নির্বিকার চিত্তে শূন্যের দিকে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, শুধু এই পোড়া পেট ভরাবার জন্যেই পৃথিমীতে মানুষ আসে নাই, বুঝলে দাদাঠাকুর। দু'দিনের জন্য এসেছি, শুধু তাঁরই নাম করে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব। তবে হুঁ, একট কথা বলি, ঐ জোড়া বলদের ভিতরে যা খুঁজবে তাই পাবে দাদাঠাকুর। তুমার উই-ত্রিশূলের ভিতর কিছু নাই গো, কিছু নাই—ই সব মুখ্যু সুখ্যু লোকের কথা। যাক্, এখন আর বেশী বক্ বক্ করবো না, একট গান ধরছি, শুন। বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গান সুরু করিল :—

কেবল আসার আশা আসা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে ভ্রমর ভুলে রল॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
ও মা ! মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল॥

গান শেষ করিয়া ভৈরব আর সেখানে দাঁড়াইল না। শুধু কলির মুখের দিকে তাকাইয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিল, দিদিভাই, এখন তবে চল্‌লম। আমার পাওনা গণ্ডা পরে লুব।

শুনলে তো বঙ্কুদা', ওর কথাগুলো সব শুনলে ?

—হ্যাঁ শুন্‌লুম।

—একেবারে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত।—যাক্‌গে, তোমার ঐ গুলিমারার

জবাবটা চাও নাকি এখন ?

—না, আজ আর সময় নেই। ঐ হতভাগাই তো এসে সব মাটি করে দিল। এখন উঠি, বুঝলি।

—আচ্ছা শোনো, একটু দাঁড়াও তাহলে, একখানা বই নিয়ে আসি, পড়তে দোবো তোমায়। বলিয়া উঠিয়া গিয়া শোবার ঘর হইতে একখানা বই লইয়া আসিয়া বন্ধুর হাতে দিয়া বলিল, পড়েছো নাকি বইখানা ?

—হুঁ, rubbish ! nonsensical—"Eonomics of Khadi" পড়বার মতো বইই নয়।

—তবুও আমার কথাটা একবার রাখ না, পড়ে ছাখো না।

—আচ্ছা, পড়ে দেখবো। বলিয়া বইখানা হাতে লইয়া বন্ধু প্রস্থান করিল।

বারো

আরে থাক্, থাক্, না না, পায়ে হাত দিতে নেই মা। ব'সো ব'সো, ঐ চেয়ারটাতেই ব'সো।

কলি শুনিল না। আভূমি নত হইয়া ভুবনবাবুর দুই পায় হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া, একটা হাতাহীন চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

ভুবনবাবু হাস্যমিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে দেখে আজ আমি বড় খুসি হলুম মা। আজ বাঙলা দেশে—শুধু বাঙলা নয়—সারা ভারতে তোমার মতোই নারীদের দরকার। সে দিন যখন মণিশঙ্করের কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে শুনলুম তখন আনন্দে আমার বুকখানা ফুলে উঠল, সে দিন বুঝলুম যে, হ্যাঁ, বাঙলার নারী সমাজ আজ তাদের নিজেদের দেশকে বুঝতে শিখেছে। বলিয়া বিপিনের শ্রদ্ধাবনত মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, বিপিন, তুমি ভাগ্যবান, তোমার মেয়ে ভারতের নারী সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছে। আশীর্বাদ করি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনে যে আদর্শকে ও অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধায় আদর করে গ্রহণ করেছে সেই আদর্শই যেন ওর জীবনের লক্ষ্য পথে ওকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

বিপিন মুক্তকণ্ঠে বলিল, ও মেয়ে এখন আর আমার নয় বড়বাবু (ভুবনবাবু), ও মেয়ে এখন আপনাদের। মানুষকে ভালবাসাই মানুষের ধর্ম্ম; ও তাই, সেটাকেই ওর জীবনের আদর্শ করে নিয়েচে—মানুষকে ভালবাসা, সমাজকে ভালবাসা এর চাইতে মহৎ কাজ আর কী আছে?

ভুবনবাবু গদগদ স্বরে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, জানি বিপিন, সে খবর আমি পেয়েছি,—খাদি, চরখা, সমাজ সেবা ওর জীবনের আদর্শ। যেদিন থেকে ও এখানে এসেছে সেদিন থেকেই ও খাদির প্রচার নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। গান্ধীবাদে ওর মত বিশ্বাসী খুব কম দেখেছি বিপিন। কংগ্রেসকে ও বোধ হয় ওর জীবনের তুল্যই ভালবাসে।

শুনিয়া কলি একটু হাসিয়া বলিল, প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি, কংগ্রেসকে আমি ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু তাহলেও কংগ্রেসের আমি কেউ নয়, আমাকে সম্পূর্ণভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক করে ধরবেন না।

উত্তরে মণিশঙ্কর বলিয়া উঠিল, না না, কংগ্রেসের ভেতরে আমরা সেভাবে আপনাকে না পেলেও আপনার সাহায্য আমরা চাই।

কলি উদার কণ্ঠে বলিল, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বশক্তি দিয়ে সমাজ-সেবার কাজ করে যাব, কিন্তু কংগ্রেসে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। প্রয়োজন হলে আমি ভূদান-যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারি।

মণিশঙ্কর বলিল, ভূদান-যজ্ঞে যখন যোগ দিতে আপত্তি নেই তখন কংগ্রেসের মধ্যে আসতেই বা দোষ কী?

কলি একটু হাসিয়া বলিল, সমাজসেবাই আমার ধর্ম্ম, রাজনীতি আমার ধর্ম্ম নয়, মণিবাবু। কংগ্রেসের যারা শত্রু হয়ে আছে তাদের সঙ্গে মিত্রতা ক'রে, তাদের কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করে তোলাই আমার কাজ। যারা উগ্রপন্থী তাদের কংগ্রেসপন্থী করে তোলাই সবচেয়ে বড় কাজ হবে আমার, এবং সেইখানেই হবে কংগ্রেসের সব চেয় বড় লাভ—আমি সেই নিয়েই থাকব মনে করেছি।

কথাগুলি ভুবনবাবুকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিল। তিনি সত্যই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মনে মনে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ মেয়েটির বুদ্ধি আছে বটে, খুবই মুল্যবান কথা বলিয়াছে তো। তাই তাহার বুদ্ধি এবং বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, খুব সুন্দর কথাই বলেছ মা।—তা কংগ্রেসের

ভেতরে থেকেও তো সে ভাবে কাজ করা যেতে পারে।

—তা অবশ্য পারা যায়, কিন্তু তাতে করে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করতে চাই। তা'ছাড়া সমাজ-কল্যাণ রাষ্ট্রগঠনই যখন লক্ষ্য এবং উপলক্ষ তখন গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় সমাজ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারলেই তো আমাদের লক্ষ্য স্থলে আমরা পৌছতে পারবো বলে আশা করি। সুতরাং সমাজসেবাই বড় সেবা বলে আমার মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ভারতের ঘরে ঘরে পোঁছে দিতে হবে—মানুষের ভেতর ভগবানকে আমরা দেখেছি। আমি সেই ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই, কাকাবাবু।

ভুবনবাবু তাহার কথাগুলি খুব গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়া মনে মনে বুঝিলেন, এ মেয়ে বড় কঠিন মেয়ে, বেশ বুদ্ধিমতীও। বুঝিয়া, তিনি আর তাহার স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিলেন না; বরং খুশি হইয়া বলিলেন,. তোমার কথাগুলো শুনে আমার ভারী আনন্দ হল মা। তুমি গান্ধীজীকে উপলব্ধি করতে পেরেছ—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। তুমি বিনোবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার বাসনা রেখেছ, এর চেয়ে আনন্দের ও উৎসাহের বিষয় আর নেই। বলিয়া তিনি ভাবে গদগদ হইয়া বিপিনের প্রশান্ত মুখের পানে তাকাইয়া অকপট হৃদয়ে বলিলেন, আমি ভাবতেও পারি না বিপিন যে, এত সুন্দর ভাবে তুমি কী করে তোমার এই মেয়েকে সমাজসেবার শিক্ষা দিলে; এটা গর্ব্বের কথা, আনন্দের কথা। এর কাছে অনেক কিছু জিনিস শেখবার আছে।

বিপিন অমায়িক, শান্ত, ধীর স্থির, নিরহঙ্কার। তবুও কন্যার প্রশংসা শুনিয়া সে মনে মনে একটু গর্ব অনুভব করিল; তবে তাহার চোখ মুখের হাব ভাবের ভিতর দিয়া সেই অস্ফুট গর্বের, এমন কী অতি ক্ষীণ রেখাটুকুও, লাঞ্ছিত হইয়া উঠিল না। একটা অমায়িক হাসি হাসিয়া বলিল, স্বামীজীর আদর্শে গড়া মেয়ে আমার। সেবার কাজে ও আনন্দ পায় বেশী, তাই পরের সেবা করতে ও ভালবাসে। তাই জীবনটাকে ও সেই আদর্শে গড়ে তোলবার জন্যে সমাজসেবার কাজে নিজেকে ঢেলে দেবার সঙ্কল্প নিয়েছে। আজ ওকে আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম বড়বাবু। উগ্রপন্থীরা এ দেশের অতীতের-

রত্নেভরা মনটাকে নিঃস্ব করে নিয়ে সমাজকল্যাণ চায়, তাই তাদের কাছে ওকে ঘেঁষতে দিই নাই। বলিয়া সে বিদায় লইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভুবনবাবু আনন্দে উল্লাসে আবেগে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিপিনকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, বাইশশো' বছর আগে মহারাজ অশোক তাঁর ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে দান করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম্মকে, আর আজ তুমি দান করে গেলে তোমার আদর্শস্থানীয়া কন্যাকে মহাজাতীয় প্রতিষ্ঠাকে, তথা কংগ্রেসকে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার কন্যাকে শ্রদ্ধা করি। আজ থেকে সে জাতির অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল বিপিন। এসো, আবার দেখা ক'রো সময় করে।

এইরূপ অকপট প্রশস্তি শুনিয়া বিপিনের সমস্ত দেহ যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভুবনবাবুকে ইহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার মতো ঠিক সে ভাষা তাহার মুখে কুলাইয়া উঠিল না; শুধু গম্ভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল। তার পর লাঠি গাছটা হাতে লইয়া, আচ্ছা, আসি তাহলে এখন বড়বাবু, ও রইল। বলিয়া, সে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

মণিশঙ্কর ভুবনবাবুর দিকে মুখটা ফিরাইয়া কলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তাহলে সামনের সপ্তাহে যে একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে তাতে উনিই তো উদ্বোধন সঙ্গীতটা গাইতে পারেন।

ভুবনবাবু বলিলেন, কিন্তু ও তো কংগ্রেসে থাকবে না বলেচে; তা ছাড়া ও তো সরকারী চাকুরে। ওর পক্ষে রাজনীতি করা চলবে না, বলিয়া কলির মুখের প্রতি একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলিয়া তাকাইলেন।

কলি স্মিতমুখে বলিল, না, রাজনীতি আমি করতে পারবো না কাকাবাবু।

মণিশঙ্কর বলিল, না না, এটা সে ধরণের কোনো Political meeting নয়, সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক, সুতরাং এতে যোগ দিতে বোধ হয় কোনো অসুবিধে নেই আপনার।

কলি বলিল, সে হলে অবশ্য আপত্তি নেই।

ভুবনবাবু বলিলেন, তা হলে বন্দে মাতরম্ গানটা তুমিই গেয়ে শোনাবে,

এটা আমাদের সকলের ইচ্ছে ; তোমাকে আমাদের মধ্যে পরিচিত করে তুলতে চাই।

কলি স্মিতমুখে বলিল, কোনো প্রয়োজন ছিল না।

মণিশঙ্কর হাসিয়া বলিল, না, তা হয় না।

ভুবনবাবু বলিলেন, তাহলে আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে মা।

—বলুন।

—কংগ্রেসের কিছু সদস্য সংগ্রহ করে দিতে হবে, অবশ্য এখন নয় ইলেকসনের পর।

কলি ধীরকণ্ঠে বলিল, খুব শক্ত কাজের কথা বলছেন কাকাবাবু। তাছাড়া আমার বিশ্বাস শুধু সভ্য দিয়ে কাজ হওয়া সন্দেহজনক, চাই আন্তরিকতা। যাঁরা কংগ্রেসকে ভালবাসে, এর মধ্যে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আসবে তাঁদেরই আমরা চাই এবং পাবোও তাঁদের। কিন্তু এ কাজ করতে আমি অক্ষম। অন্য যে কোন সমাজসেবার কাজ দেবেন তা আমি আনন্দের সঙ্গে করে যাবার চেষ্টা করবো।

তাহার এই ধরণের নিস্পৃহ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ভুবনবাবু, মণিশঙ্কর উভয়েই মনে মনে বেশ কিছুটা দমিয়া গেলেন কেননা তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা ধারনা করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই ভুল বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তবুও উভয়ের বড় একটি সান্তনা এই যে, বঙ্কু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে হাত করিয়া লইতে পারে নাই, এবং ভবিষ্যতেও পারিবে কিনা সন্দেহ,—সেই সংশয়শূন্যতাই তাঁহাদের কাছে আজ বড় আনন্দের বিষয়।

ভুবনবাবু বলিলেন, কাজ তুমি করে যাবে বলছ মা, কিন্তু কংগ্রেসের হয়ে যদি কাজ করতে না পার তা হলে গাঁয়ের মানুষকে কী করে কংগ্রেসকে ভালবাসতে শেখাবে, বল? সুতরাং সেদিক দিয়েও তো কিছুটা আন্দোলনের ও প্রচারের প্রয়োজন।

কলি বলিল, কংগ্রেসের কাজই তার বড় আন্দোলন, তার পরিচয়, তার বিস্তরতম প্রচারের হাতিয়ার। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফলতার মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে। সেখানে উগ্রপন্থীদের আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। দেশের মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কংগ্রেসকে ভালবাসতে শিখেছে এবং প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই শিখছে। গাঁয়ের প্রতিটি মানুষের

জীবনে আজ বেঁচে থাকার স্পন্দন জেগে উঠেছে। উগ্রপন্থীরা যতই যা বলুক, করুক না কেন, আমাদের কাজই আমাদের প্রকৃত বল, প্রকৃত ভরসা। খাওয়া, পরা, শিক্ষা আর বাসস্থান, এই চারটে জিনিসের ব্যবস্থা তো কংগ্রেস সরকার ধীরে ধীরে করে ফেলবার চেষ্টা করচে, তাইএখন আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ হল গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজ পরিকল্পনার আঠারো দফা কর্ম-সূচির কয়েকটিকে, যেমন ধরুনঃ—অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ, মাদকতা বর্জন, খাদি, গ্রামশিল্প, গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা কল্পে-চেষ্টা, শ্রমিক সংগঠন, কুষ্ঠ রোগ ও যক্ষা রোগ সেবা ও প্রতিকার ইত্যাদি—বাস্তবে রূপায়ণের দিকে নজর দেওয়া। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের মানুষ আজ কংগ্রেসকে চাইবে এবং চায়ও।

ভুবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিশ্বাস তোমার কিসে থেকে হল মা?

—গাঁয়ের যারা সরল মানুষ, যারা চাষী, যারা দিন মজুর, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে মিশে দেখেছি তারা কংগ্রেসকেই ভালবাসে, তারা বলে উগ্রপন্থীরা স্বার্থপর। তা ছাড়া তাদের সবেতে বড্ড বাড়াবাড়ি।

শুনিয়া ভুবনবাবু উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, সত্যিই কী গাঁয়ের লোকের এই মনোভাব? তা হলে কী এ বিশ্বাস তোমার হয় মা যে, কংগ্রেস বেঁচে থাকবে?

আমার ত সেই বিশ্বাস—মানুষের মনটাই সব। আমরা ইচ্ছে করলেই রাতা-রাতি কোনো একটা কিছু করে ফেলতে পারবো না। তাছাড়া পুরাতনের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশী এবং নাড়ীর যোগ ও দুশ্ছেদ্য, তাই চট করে, বিশেষ করে, এ দেশের মানুষ কোনো নোতুন মতবাদকে গ্রহণ করে নিতে অক্ষম। এখানকার হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সভ্যতা একে পেছনের টানেই বেশী ক'রে টানে, তাই এখানে কোনো বিজাতীয় তন্ত্র স্থায়িত্বলাভ করতে পারবে বলে মনে হয় না,—এ আমার বিশ্বাস। ধীরে ধীরে এ মনকে গড়ে তুলতে হবে। পণ্ডিতজীর মতো লোক তিনিও ভারতের এই ঐতিহ্যের কথা বলেছেন; তাঁর এ কথা কটি আমি মনে রেখেছি "There seemed to me something unique about the continuity of a cultured tradition through five thousand years of history, of invasion and upheaval, a tradition which was widespread among the masses and powerfully influenced them.

মণিশঙ্কর একেবারে হাঁ হইয়া গেল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, বাঃ কী অপূর্ব্ব এই নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী! সত্যই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়, অনুরাগে প্রাণ ভরিয়া উঠে,—পুরুষের কর্মের উৎসাহ জীবনে চলার পথের আলোকবর্ত্তিকা। অপূর্ব! অপূর্ব! কী লাবণ্যময় জ্যোতির্ময় রূপ। মুগ্ধ-নয়নে তাহার প্রশান্ত পেলবদৃষ্টি মুখখানার প্রতি তাকাইয়া বলিল, বড় সুন্দর কথা বল্লেন। সত্যি, এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়েই সমস্ত জিনিসটা বিচার করে দেখতে হবে।

ভুবনবাবু ততোধিক বিমোহিত হইষা বলিলেন, বড় মূল্যবান কথা বল্লে মা। সত্যি, কি সুন্দর ভাবে শিল্পীর চোখ দিয়ে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তোমার দেশকে তুমি ভালবেসেছো। বলিয়া মুখটা ফিরাইয়া দেখে ভৈরব, সেই একতারা হাতে। গান গাহিতে গাহিতে সে একেবারে বৈঠকখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি পেতে
থাকে ত্রাণ বাসনা।

পেন্নাম্ বড়বাবু! আজ একটুকু বেশী করে দিতে হবে, বক্কেশ্বর যাবো। ভুবনবাবু একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, বাড়ীর ভেতারে যা।

—তা আজ আর গান শুনবেন না, বড়বাবু? বলিয়া কলির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, কী গো দিদিভাই, তুমি যে এখানে? তুমি তো কংগ্রেসের লও। তা এখানে কী বটে?

কলি তাহাকে দেখিয়া আগে হইতে মুখটা আড়াল করিয়া বসিয়াছিল কিন্তু এখন আর সে ভাবে থাকিতে পারিল না; মুখখানা ফিরাহয়া লইয়া বলিল, তোমাকেও তো দেখছি সব ঠাঁই, সন্ন্যাসীঠাকুর।

—হুঁ, ঠিক বলেচ। আমি ত সব ঠাঁইয়েই যাই, কিন্তু তুমি তো দেখছি দু'দিকেই আছ।

কথাটা শুনিয়া ভুবনবাবু মণিশঙ্কর উভয়েই বিস্মিত হইয়া মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। ভুবনবাবু ভৈরবের উপর একটু বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এখানে আর দাঁড়াস্ না ভৈরব!

ভৈরবের অনন্ত ধৈর্য্য এবং মুখে তাহার সেই সদা প্রফুল্লতার অমায়িক

হসি। সুতরাং বড়বাবুর কোনো কথাই তাহার কানে গেল না। সে আবার বলিয়া উঠিল, ই তো উ দলের লোক গো! ই আবার তুমাদের দলেও আসচে নাকি? সাবধান কিন্তু!—কী গো দিদিভাই, তুমি কী সবতেই আছ নাকি?

কলি হাসিয়া বলিল, তোমার তো ভোট নেই সন্ন্যাসীঠাকুর। তুমি আবার কথা বল কেন?

—সন্নেসীর আবার ভোট কিসের?

—তবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাও কেন ঠাকুর?

—উ সব নীতি-টিতি তো করি না দিদিভাই। যারা উ সব করে তারাই আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায়।—কী বলেন গো বড়বাবু?

ভুবনবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার কথার কোনো উত্তরই তিনি করিলেন না।

মণিশঙ্কর মুখখানা বাঁকাইয়া খিঁচাইয়া উঠিল, কাজের কথার সময় তোর ঐ কালীর নাম ভাল লাগে না। সরে পড়! সরে পড় এখান থেকে!

সে কথায় সে এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ করিল না; ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, তুমাদের তো ঐ একই কথা দাদাঠাকুর,—ভোট দিতে হবে। ভোট ভোট করে তো তুমরা দেশটোকে উচ্ছন্নে দিলে, ভিক্ষে পাবার জো নাই, বলে কিনা খ্যেটে খা! কী দরকার খ্যেটে খাবার! বলিতে বলিতে সহসা ভাবাবেগে তদ্‌গত হইয়া আপন মনে আবৃত্তি করিয়া উঠিল :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সব ধর্ম্ম ছেড়ে এখন তাঁকেই ডাক—তা হলেই তরে যাবে, দাদাঠাকুর, বলিয়া, তারপর একটা টগরগাছের নীচে গিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পরিল।

তাহার কথায় আর কেহই মনোযোগ দিল না, ভুবনবাবু তো নয়ই। কলি বলিল, কোনো ইজ্‌মই আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমাদের জ্ঞান-প্রবুদ্ধ মনটাকে নিংড়ে বার করে নেওয়া শক্ত! ঐ যে লোকটা (ভৈরবকে দেখাইয়া) ওখানে বসে আছে দেখছেন ওকে ব্যক্তিগত ভাবে না দেখে যদি অন্য দৃষ্টি কোন্ থেকে দেখেন তাহলে বুঝবেন আমাদের এই হাজার হাজার বছরের মনের কথা, ধ্যানের কথা, ঐতিহ্যের কথাই ও বলে। সোবিয়েত

জীবনদর্শন এ কথা ত কোনো দিন বলতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং উগ্রপন্থীদের আস্ফালনই সার।

ভুবনবাবু মনে মনে খুব উৎসাহিত বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, তাহলে তুমি বিশ্বাস কর মা কংগ্রেস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পাববে ?

কংগ্রেস তো নিস্ক্রিয় নয় যদিও মন্থর, কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে বিজ্ঞান ধর্ম্মী গতিশীলতা আছে; সুতরাং সে প্রতিষ্ঠান টিকে না থাকবার কারণ নেই।

কথাটা ভৈরবের কানে গেল। মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে সে বলিয়া উঠিল, বুঝলে বড়বাবু, তিনিই সব, আর সব মিছে, মিছে, এই বলে দিলম্ দিদিভাই, বঙ্কুটো কিছুই করতে লারবে। চন্দ-সূয্যি যতদিন উঠবেই দেশে, ভগবানের নামও ততদিন থাকবে। সবই তাঁরই ইচ্ছে গো বড়বাবু, মানুষ কিছুই লয়। চাকা ঘুরচে, চাকা ঘুরচে, তুমিও কেউ লও, আমিও কেউ লই।—আচ্ছা, চল্লাম্ গো বড়বাবু। বলিয়া সে বিদায় হইল।

এমন সময় পরান বাগ্দী আসিয়া খবর দিল বিলয় প্রভৃতি শক্তিপদ'র সঙ্গে আবার ঝগড়া বাধাইয়াছে। বঙ্কুর দল ফুটবল গ্রাউণ্ডটি আগে হইতেই দখল দিয়া বসিয়াছে; তাহারাও সেখানে তাহাদের দলের এক ছোটো-খাটো সভার আয়োজন করিতেছে।

শুনিয়া ভুবনবাবু একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, তাহলে আজ উঠলাম মা, তুমি এখন এসো। দেখি বঙ্কুটা আবার কী করে বসল। ঐ দিনকার সভায় কিন্তু আসতে ভুলো না মা, বলিয়া ভুবনবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

তের

সে দিন গণ্ডগোলের খবর শুনিয়া কলি আর সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইল না। ভুবনবাবু প্রভৃতি সকলেই খুব বিস্মিত হইলেন। সে যে কেন আসিল না সে সম্বন্ধে কেহই কিছু অনুমান করিয়া উঠিতে পারিল না। কেবল মণিশঙ্কর মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, আমি এ জানতুম ভুবনদা'—ও সব বাউরি বাগ্দীদের চাল-চলনই আলাদা। নাও, এবার বোঝো, খুব ত তুমি সেদিন ওর

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলে !

ভুবনবাবু শুনিয়া খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। অবশ্য, মনে মনে তিনি যে একটু উতলা না হইয়া উঠিলেন এমনও নয় ; তবে তিনি চট্ করিয়া এ বিষয়ে দ্রুত একটা কিছু মন্তব্য করিলেন না। যে যতই কিছু বলুক না কেন, তাহার দৃঢ় ধারণা হইল, হয়তো, কোনো অনিবার্য কারণবশতঃই হোক বা কোনো গণ্ডগোলের আশঙ্কা করিয়াই হোক, কলি সে দিনকার সে সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই।

অনেকে হিংসায় কান ভাঙ্গানি দিয়া বলিল, খৃষ্টান মিশনে মানুষ হওয়া মেয়ে, বিশ্বাস করা কঠিন, বড়বাবু। তাছাড়া ও মেয়েকে বিশ্বাস নেই,—নিচ্ জাত।

ভুবনবাবু সহজে বড় একটা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন না, বা লাগানি ভাঙ্গানিতে একটুতেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া অপরিণামদর্শীর মতো কাজ করিয়া বসেন না। তিনি ধীর, স্থির। কিন্তু এই সমস্ত নিন্দুক ও হিংসুক লোকগুলির অনুদার ও ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তিনি যেমন অবাক্ হইয়া গেলেন, তেমনি ব্যথিতও হইলেন। তবুও তিনি অটল স্থৈর্যের সহিত নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, এই যদি তোমাদের মনোবৃত্তি হয়, তাহলে তোমরা কংগ্রেসে থেকো না ! তোমরা নিজেরাও কিছু করবে না, অন্যকেও কিছু করতে দেবে না। বলিয়া মাথাটা নীচু করিয়া গালে হাত দিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি যেন জলের উপর দিয়া রেখা টানিয়া গেলেন।

মণিশঙ্কর বলিল, তুমি ভুল করচো, ভুবনদা'। সে যে কী ধরণের মেয়ে তা আমি আজ টের পেয়ে গেছি ! আমি আজ সকালেও তাকে দেখেছি বন্ধুর সঙ্গে কুমোরপাড়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ফাঁসাবে, এই বলে দিলুম—সাংঘাতিক মেয়ে ! যা ভেবেছিলুম তা তো নয়, আশ্চর্য হয়ে যাচ্চি !

ভুবনবাবু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন—কীসে বুঝলে সাংঘাতিক ?

—তার হাবভাব দেখে !

—বেশ, কিন্তু কী বুঝলে ?

—বুঝলুম, তার গতিবিধি ভাল না—যদিও সে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে সমাজসেবিকাদের সঙ্গে নিয়ে চরখা আর খাদির এবং আরও সব কুটির শিল্পের

প্রচারের চেষ্টা করছে, গ্রামসেবিকাদের কাজে সহায়তা করছে, তবুও একটা কথা কী, সত্যি করেই যদি সে ভূদান যজ্ঞে যোগ দেবার মনস্থ করে থাকে তবে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে কাজে লেগে পড়চে না কেন? বস্তুর সঙ্গে তার এতো কী কথা থাকতে পারে, শুনি? তার সঙ্গে মেশেই বা কেন?

এতদূর পর্যন্ত শুনিয়া ভুবনবাবু বলিলেন, থাক্, আর দরকার নেই বলবার। বলিয়া তিনি মাথাটা হেঁট করিয়া রহিলেন।

মণিশঙ্করকে তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। শুধু বলিলেন, বিপিনের মেয়েকে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে আমি যে সমাজসেবা কাজের সূত্রপাত করেছি তার সব কাজের ভার তোমরাই নিও।

মণিশঙ্কর বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমরা প্রত্যেকে এ কাজের ভার ঘাড় পেতে নোবো!

কিন্তু শক্তিপদ বেশ বুঝে এ অতি কঠিন কাজ, এবং এ কাজ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া লইয়া হাসিমুখে সম্পাদন করিয়া যাওয়া যে কতখানি অনুরক্তি ও স্বার্থত্যাগের ব্যাপার তাহা একমাত্র কৃষ্ণকলি ভিন্ন এই সমস্ত গ্রামের মধ্যে আর অন্য কেহ তেমন বুঝে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাকে তো ইহারা কেহই চায় না, অথচ তাহাকে সরাইয়া দিয়া এ কাজ চালাইয়া যাওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার। তাই, সে আর কোনো কথা না বলিয়া সমস্ত কাজের ন্যাস নিজের হাতেই লইতে সম্মত হইয়া বলিল, শুধু কথা দিয়ে কাজ হয় না। আজকাল পেশাদার সমাজসেবক-সেবিকায় দেশ ভরে গেছে। আমরা আর, সে বদনামটা চাই না। বুজলে হে মণি, কিছু কাজ আমাদের করে দেখাতে হবে।

মণিশঙ্কর বলিল, দেখো শক্তি কাজ আমরা করে যাচ্ছি এবং যাবোও। হাড়ি, মুচি, বাউরি, বাগ্দীদের বাদ দিয়েও আমাদের মধ্যে আমরা কাজের লোক পেতে পারি। কিন্তু, এ সবের আগে, সবচেয়ে বড় কথা হল কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখা।

ভুঁবনবাবু যদিও মণিশঙ্করের কথায় আবার মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন তবুও তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কংগ্রেস বেঁচে আছে এবং থাকবেও। যদি কোনোদিন মরে যায় তো তোমাদের মতো কতকগুলো অনুদার মনোবৃত্তির লোকের হাতেই মরবে।—ছিঃ মণি, ভাষা সংযত কর!

মণিশঙ্কর বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িতে নাড়িতে বেশ দমক দিয়া বলিয়া

উঠিল, অবশ্য তুমি আমাকে যা, তা, বলতে পার ভুবনদা ; কিন্তু এটা চিন্তা করে দেখো, আমাদের দলে ঢুকে আমাদেরই সর্ব্বনাশ করছে ঐ মেয়ে !—ঐ দেখো, ঐ দেখো কেরামত আসচে, কী খবর নিয়ে এসে হাজির হল ।আবার দেখো ।—কী হে কেরামত ? কী খবর ?···হঠাৎ এমন সময় ?

কেরামত বিড়িটায় একটা জোর শেষ টান দিয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, বিপিনদার মেয়েটা বড় মুস্কিল করছে, ওকে কংগ্রেসে নিয়ে নাও বড়বাবু তাড়াতাড়ি, তা না হলে সর্ব্বনাশ।

কেরামতের কথায় ভুবনবাবু এতক্ষণের পর সত্যই একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাইত, মণিশঙ্করের কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যা নয়,—মেয়েটি কী তাহা হইলে কংগ্রেসের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এ পক্ষে আসিয়া যোগ দিয়াছে ? কিন্তু, তাহার মন যেন কিছুতেই সে কথায় সাড়া দিয়া উঠে না। তাই তিনি কেরামতকে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ তুমি একথা বলচ কেন কেরামত ? তুমি কী তাকে ভালভাবে জান ?

কেরামত তাহার লম্বিত শুভ্রশ্মশ্রুর উপর দিয়া বাঁ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে হাস্যমুখে বলিল, তা জানি বৈকী তাকে বড়বাবু—মেয়েটা ভাল, খুব ভাল স্বভাব, মনটাও উদার, গরীবের মা-বাপ—সমাজসেবার কাজ করে। বি. এ. পাশ দিয়েছে, সরকারী চাকরী করছে। কিন্তু জোড়া বলদের ওপর টান্ আছে দেখেছি। আমায় বলে, কেরামতদা', ভেবে-চিন্তে ভোট দিও। কিন্তু, বন্ধুটাই তো ওর মাথাটা খেলো। ওকে টেনে নিয়ে এসো এ দলে।

ভুবনবাবু বলিলেন, এই বলছ ভাল মেয়ে ; তবে এ আবার কী কথা বলছ, কেরামত ?

—হুঁ, ঠিকই বলছি বড়বাবু, ঠিকই বলচি। এই তো ওকে দেখে এলাম কচি মিঞার খামারটার ধারে বড় পাকুড় গাছটার নীচে বসে জটলা করছে। কচে, ভোদো, মনে, বিলে, শিবু, দাসের' আলির বড় ছেলেটা, হাফেজ আলির ভাইটা, গোপলা—সব যেয়ে জুটেছে ওখানে। আর ঐ দলের সদ্দারটা বক্কা বসে' বসে' খুব বক্তিমা মারছে। মেয়েটা এ-ম-নি ভাল, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝি না। —ও মণি, তুমি চল না একবার আমার সঙ্গে, দেখে আসবে। চল যাই, এসো ভাই, চলে এসো।

মণিশঙ্কর মিট্ মিট্ করিয়া একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসিয়া ভুবনবাবুর মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, কী আমার কথা ত বিশ্বাস হল না। এবার কী হল ? বলিয়া নিজের মনে একটা অস্ফুট অশ্রাব্য উক্তি করিয়া উঠিল,—একে বাউরী, তায় খ্রীষ্টান মিশনে মানুষ। এদিকে আবার বঙ্কুটার মাথা খাচ্চে ; ছ্যাঃ ! কংগ্রেসেরও ইজ্জৎ গেল, একে ডোবাতে ঢুকেছে। বলিতে বলিতে কেরামতের সহিত বাহির হইয়া গেল।

ভুবনবাবু ও শক্তিপদ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া মণিশঙ্কর ও কেরামতের কথাগুলি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

চোদ্দ

কি গো বঙ্কুদা',—তুমি বোধ হয় আমার ওপর সেদিন খুব রাগ করেছ, না ?

বঙ্কু একটু বক্র ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল, না, রাগ করবে না ! নোতুন-নোতুন পলিটিক্স করছিস্ কিনা তাই ঐ ভাবে তর্ক করতে শিখেচিস, আর ঐ গান্ধী নামের মোহে এমনই ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছিস্ যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে সমস্ত বিষয়টা বিচার করে দেখতে চাস্ না।

কলি বলিল, যাক, বইখানা কী রকম পড়লে এখন বল ?

—এযুগে ও বই একেবারেই অচল। বিজ্ঞানের যুগে অবৈজ্ঞানিক কথা বলছিস্।

—কথাটা না ভেবে চিন্তেই বল্লে, বঙ্কুদা'। চরখা তো সকলের জন্য নয়, এটা তুমি ভুল করচ। ভারতের প্রাণশক্তি যেখানে সেখানেই এর প্রয়োজন চিন্তা করা হয়েচে। আমি, তুমি হয়তো, প্রত্যেকে, চরখায় সুত কাটবো না, বা কাটবার দরকার মনে করব না। যাদের জন্য এ জিনিস, তাদের কথাই বলবো। আমরা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করব না কোন দিনই, কিন্তু তাই বলে তাকে এবং যন্ত্রসভ্যতাকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বেহিসেবী মুরুব্বিয়ানা করতে দিতে পারি না। তাছাড়া, চরখার অর্থনীতিক দিকটাও যদি বিবেচনা করে দেখো তাহলে, সমাজজীবনেও এর গুরুত্বটা বড় কম নয়, এর নৈতিক দিকটাও উপেক্ষা করবার মতো নয়। মুখ্যতঃ এ জিনিসটার প্রয়োজন এবং আদর ভারতের

চাষী এবং দিনমজুরদের কাছে। তাছাড়া গ্রামীন শিল্পকে যদি জাগিয়ে রাখতে বা পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হয় তাহলে চরখাই হল সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ উপায়, একটা উপজীব্যও বটে।

বন্ধু উত্তেজিত হইয়া বলিল, you talk nonsense! পাগলের মতো কথা বলচিস্! ওগুলোকে ধরে ধরে পুড়িয়ে ফেলতে হয়!

কলি হাসিয়া বলিল, বুঝেছি, তোমাদের মাথায় চীন আর রাশিয়ার political bacilli ঢুকেছে, তাই ঐভাবে কথা বলচ। যেখানে পায়ে হেঁটে যাবার দরকার, সেখানে তোমরা লাফিয়ে যেতে চাও। রাতারাতি দেশময় তুমি মিল গড়ে তুলতে পার না, বা তোলবার দরকার নেই। ভারতের চাষীরা বছরের মধ্যে চার মাস অলস হয়ে বসে কাটায়; তাছাড়া বেকারের সংখ্যা বড় কম নয়; সুতরাং, ঐ সময়টুকু তারা চরখায় সুতো কেটে সময়ের যেমন সদ্ব্যবহার করতে পারে, আংশিক ভাবে জীবিকা-অর্জনের সুযোগও পেতে পারে।

—কী যা তা বকছিস্! মেসিনের যুগে মানুষকে আমরা চূড়ান্ত সুখ সুবিধে দিতে চেষ্টা করবো। আমরা উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলবো, তাহলেই ঐ চার মাস ঘরে বসে বসে বিনা কাজে আর চাষীদের সময় কাটাতে হবে না। তাদের অন্য ভাবে কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেই তারা ঘরে বসে থাকতে চাইবে না। আমিও তোকে একখানা বই পড়তে দিচ্ছি, বলিয়া খবরের কাগজে জড়ানো একখানা বই তাহার হাতের কাছে ধরিল, তারপর কাগজখানা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, পড়ে দেখিস বইখানা তাহলে রাশিয়া সম্বন্ধে একটা clear idea পাবি! কি ছিল আরকী হয়েচে দেশটা!

—নিশ্চয়ই পড়ব—The socialist sixth of the world—ভালই, নিশ্চয়ই পড়ে দেখবো।

—পড়ে গ্যাখ্, বুঝতে পারবি, সত্যি একটা জাত বটে!

—দেখব তো বটেই। তাছাড়া আজকাল তো রাশিয়া এ পাড়া ও পাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখচি, বাজারে তো সোবিয়েত দেশের বই ছড়াছড়ি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, তবুও এ বইখানা একখানা বই বটে।

—আগে পড়ে দেখি, তারপর বলবো। কিন্তু গান্ধীজী কী বলেছেন জান, "machinery has its place, it has come to stay. But it must not be allowed to displace the necessary human labour."

আমারও কথা তাই। যন্ত্র হল দানবীয় শক্তি। সুতরাং, এই শক্তিকে খুব বেশী মাতব্বরি করতে দিলে সমাজের, তা'তে, ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা। মানবীয় শক্তি যেখানে একান্ত প্রয়োজন সেখানে তাকে কাজে লাগান উচিত।

—না, এ সব ভুল কথা। যন্ত্রকে ভয় করবার কিছু নেই। উৎপাদনকে আমাদের বাড়াতেই হবে, এবং সেটা বাড়াতে হো'লে যন্ত্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান এবং যন্ত্র আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে মানুষের দৈনন্দিন সুখ এবং সুবিধে বৃদ্ধির পথে সাহায্য করছে; সুতরাং যন্ত্রকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখা ভুল হবে।—রাশিয়া আজ পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টি করেচে!

—স্বীকার করি তোমার কথা, বঙ্কুদা'। কিন্তু, একটা কথা কী জান, সুখ-দুঃখ বোধটা এক এক দেশে এক এক রকম দেখতে পাওয়া যায়। এই সুখ-বোধের নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি নেই, বা থাকতে পারে না, এটা মুখ্যতঃ ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যাপকভাবে সমাজগত, ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত, সংস্কার-সম্ভূত ব্যাপার, বিশেষ করে আমাদের দেশে। কেউ বা আনন্দ পায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে—সে চায় তপস্যা, সাধনায় সিদ্ধি। কেউ বা শান্তি পায়, আনন্দ পায় শুধু তাঁরই নাম নিয়ে, আবার কেউবা শুধু ভোগের মধ্য দিয়েও আনন্দ পায়। যে দেশের মাটীতে রাজার দুলাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ভিখারী হতে পারে, যে দেশের মানুষ ত্যাগকেই জীবনের মহৎ আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিয়েছে, যে দেশের মানুষ পার্থিব সুখকে সুখ বলেই স্বীকার করে না, অন্তরের শান্তি-টাকেই বড় করে ধরে নিয়েছে সে দেশের মানুষকে সহজে লোভ দেখিয়ে মোহান্ধ করে তোলা কঠিন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই ত্যাগ-প্রবুদ্ধ ভারতের এই তো হল ধ্যান ও ধারণার কথা। একে তুমি কোনো মতেই উপেক্ষা করতে পার না। ভোগের পিছনেও তারা ত্যাগকে রেখে দিয়েছে—সব কিছু পেয়েও যেন একটা অমূল্য রত্ন পাওয়া যাচ্ছে না, এবং সেটা পাবার জন্য কত আকূতি, কত ব্যগ্রতা, কত তিতিক্ষা, কত দুশ্চর তপস্যার অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা তার মনের মধ্যে অহরহ জ্বলে চলেছে। তুমি দিলেও সে নেবে না।

বঙ্কু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এসব হল পুঁজিবাদীদের, শোষণকারীদের কথা। না, নেবে না?

কলি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তার যা দরকার তার বেশী সে কিছুতেই নেবে না, নিতে পারেও না, কেননা সে যে সব কিছুই বিসর্জ্জন দিয়েছে।

বঙ্কু তাহার কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তবুও হাস্যমুখে বলিল, তোর কথা শুনে অবাক হতে হয় কলি, তোর চিন্তাশক্তি যে আজকের দিনেও এত স্থূল হয়ে আছে, ভাবতেও পারি না। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্ম্মের ধাপ্পা-বাজিতে, সত্যকে মিথ্যার আবরণে কলুষিত করে রাখতে চাস—এসব বিত্তশালী আর শোষণকারীদের যুক্তি।

—এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল কথা বঙ্কুদা। এই বিশ্বাস, এই ধ্যান, এই ধারণা, হাজার হাজার বছরের বিশ্বাসের নিকষ পাষাণে কষা, হঠাৎ এসে জুড়ে বসেনি। সুতরাং, তুমি অসমীচীন কথা বলছ।

—না, এতটুকুও নয়, খুবই যুক্তির কথা বলছি। জীবনের চলার পথের ভারতের আদর্শ হল গীতা, এবং তার শিক্ষা তুমি পেয়েছ আশা করি। সবই তো কর্ম্মফল, শোষণ টোসন সব ভুল কথা। জগৎটা ভগবানের নিয়মেই চলছে।

বঙ্কু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিয়া, আশ্চর্য আজকের এই বিজ্ঞানধর্ম্মী যুগে এমন কথাও তুই বলতে পারিস?—দুঃখ, দারিদ্র এসব হল সমাজেরই নিজের সৃষ্টি করা জিনিস—এ সব মানুষকে ঠকাবার বুদ্ধি।—রেখে দে তোর কর্ম্মফল!

excited হয়ো না বঙ্কুদা। জন্মটাই তো মানুষের কর্ম্মফলের অনুবৃত্তি; সুতরাং, সমাজের তাতে কোনো হাত নেই। এই ভাবেই সমাজের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, এই ভাবেই ক্রমবিকাশের অনুবৃত্তি, সুতরাং শোষণটা ব্যাপকভাবে, সম্পূর্ণভাবে সমাজের অঙ্গীভূত ব্যাপার, আর স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বঙ্কু উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, absolute nonsense! সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধির কথা!

কলি শান্তকণ্ঠে বলিল, না বঙ্কুদা, খুব সরল কথাই বল্লুম। এই ধর, তুমি যে আজ লেনিন, ষ্ট্যালিন আর মাও সে তুং, এঁদের ছবিগুলোকে পূজো কর, এটাও তো এক ধরণের শোষণ। তুমি তাঁদের প্রতিভা, মনীষা, বিশ্বজনীনতার কাছে মাথাটা নীচু করে আছ—এটা তোমার মনের ধর্ম্ম—অথচ তুমি যে কত অসহায় অবস্থায় তাঁদের দ্বারা শোষিত হচ্ছ, তা একবার ভেবে দেখো ত?

—অত্যন্ত অনুদার মনের পরিচয় দিচ্ছিস। তাদের জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবো না, এ কী বলছিস তুই?

কলি প্রশান্ত গর্বের সহিত বলিয়া উঠিল, বেশ তাই যদি বল তা' হ'লে আমি বলবো এ দেশের কোটি কোটি নরনারী মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিতজী, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী ইত্যাদির ছবিকে যে ধরণের শ্রদ্ধা দিয়ে আসছে, লেনিন ও ষ্ট্যালিন বা মাও সে তুংএর ছবির প্রতি ঠিক সেই ধরণের শ্রদ্ধা দিয়ে আসতে পারবে না।

—না দেয় ক্ষতি নেই। তবে তাদের ভুল তারা একদিন বুঝবে, এবং ধর্মের মোহরজ্জুকে পুড়িয়ে ভস্মও করে দেবে।—আমি কঠিন বাস্তববাদী।

কলি স্মিতমুখে বলিল, দেখা যাক্।

—হ্যাঁ, দেখতে পাবি বৈকী।

—তা দেখিয়ো, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি, কংগ্রেসকে পছন্দ না হয় ভূদান যজ্ঞে যোগ দিয়ে তোমার এই বাস্তববাদী রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সফলতা লাভের চেষ্টা কর না কেন ?

বন্ধু হাসিয়া বলিল, তুই আমায় লোভ দেখাচ্ছিস ? চোরেদের যারা পোষে তাদের সঙ্গে ভিড়তে বলছিস ? এ কী ভুবনবাবুর কাছ থেকে নোতুন বুদ্ধি নিয়ে এলি নাকি ?

—আমি কারো বুদ্ধিতে চলি না, বন্ধুদা।

—তাই তো দেখচি—যারা চোরেদের পোষে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলছিস, তা না ব'লে বরঞ্চ এক কাজ কর, আমাদের পার্টিতে এসে যোগ দেবার চেষ্টা কর, তাতে দেশের মঙ্গল হবে।

—কেন তোমরা কী চোর ধরতে বেরিয়েছ ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই—সব তাড়িয়ে ছাড়বো !

কিন্তু চোর ধরতে যেয়ে নিজেরাওযেন আবার চোর তৈরী হয়ে না যাও! কেননা ওটা ত একটা সংক্রামক ব্যাধি।—তা ছাড়া, কংগ্রেস তো আর চোর হতে পারে না,—চোর সমাজের লোক, সমাজকে নিয়েই তো যত কিছু রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। চোর আমরা ! জাতির চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। যে সব রাজকর্ম্মচারীরা ঘুষ খায়, বা চুরি করে তার জন্য দায়ী কংগ্রেস নয়, দায়ী আমরা নিজেরা।

থাক, আর নীতিকথা আওড়াতে হবে না।

—নীতি কথা নয়—সরল সত্য কথা বল্লুম।

—এ তো দুর্বল মনের পরিচয়। চুরিও বন্ধ করা যায়, ঘুষ দেওয়া নেওয়াও বন্ধ করা যায়,—সব ধরে ধরে গুলি করে মারার ব্যবস্থা করতে হবে।

—ভুল কথা—এ জিনিস কিছুদিন এ রকম সহ্য করে যেতেই হবে। সব ফুলেই কী ফল হয় বন্ধুদা? কিছুটা বাদ পড়ে।

—কড়া আইনের দ্বারা সব ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

—ভুল কথা।—অন্তরের শুদ্ধি এবং স্বভাবের ক্রম পরিবর্ত্তন ছাড়া মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করা যায় না—মানুষ মেসিন নয়, তার মনটা তৈরী হ'তে হ'তে চলে, সুতরাং সবই সময়সাপেক্ষ।

—এ কথার কোনো যুক্তি নেই,—প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিস।

—না বন্ধুদা, তা নয়। আইনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়াটাই যেন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার, তাই আইনের কথা আমরা বেশী করে চিন্তা করি,—খুব সত্যি কথা এটা, তা না হলে দণ্ডবিধি আইনের সৃষ্টি হল কী করে? সত্যি, যেন বিভিন্ন রকমের অপরাধ করতেই আমরা জন্মেচি। তা' না হ'লে অপরাধের জন্য দণ্ডভোগ দেখেও আমাদের শিক্ষা হয় না কেন?

—খুব হয়। লোভ এবং হিংসা এ দুটো জিনিসকে আমরা সমাজ থেকে দূর করবো, তা হলেই সব জিনিস সোজা হয়ে আসবে। ক্ষমতা হাতে পেলে এর প্রমাণও দিতে পারব। একবার রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌, তারা তাদের দেশকে কত উন্নত করে তুলেছে। লোভকে জয় করেছে তারা।

—ভুল কথা তোমার! লোভকে তারা জয় করতে পারে নি, কড়া শাসনের চোখরাঙানিতে দাবিয়ে রেখেছে। কৈ, আমেরিকা বা ইংলণ্ডের লোকেরা কী কোনো অসুখে আছে? অথচ তারাও তো মানুষ, এবং তাদের মধ্যেও সে লোভ ও হিংসা নেই এ কথাও কেউ বলতে পারে না, বরঞ্চ আমি বলবো তাদের লোভ বড় সাংঘাতিক—বিশ্বজয়ী; অথচ গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা তাদেরই দেশে। আমরা আত্মশুদ্ধি ও সমাজবোধের ভেতর দিয়ে লোভকে জয় করতে চাই। তা ছাড়া, আমরা রাশিয়া বা চায়নার দিকে তাকাতে যাবো কেন?

—আমাদের দেশকে সেই ছাঁচে ঢেলে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে বলে। সাম্যবোধ ও সমাজচেতনা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে বলেই তাদের দিকে তাকিয়ে দেখা দরকার আমাদের।

—সাম্যবোধ যখন আসবে তখন আপনা হতেই আসবে, তাকে কৃত্রিম পন্থায়

জাগিয়ে তোলবার দরকার নেই। রাশিয়ার দিকে আমাদের তাকাবার প্রয়োজন নেই, বরং তাদের যদি প্রয়োজন থাকে তো আমাদের জানবার চেষ্টা করুক। আমরা দিতে পারি, নেবার আমাদের প্রয়োজন নেই।

বন্ধু অস্থির হইয়া বলিল, ও সব ভণ্ডামি ছেড়ে এখন কাজের কথা বল শুনি। কিছু কাজ কর।

—কাজ তো তোমরা কাউকেই করতে দেবে না, বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। তোমরা যে কোনো ব্যাপার নিয়ে অনর্থক হৈ চৈ করচ—কোনো অর্থ নেই তার। তোমারা মাছের দাম বাড়লেও চেঁচাচ্ছ, আবার নার্সরা strike করলে তাদেরও পক্ষ সমর্থন করছ। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তোমাদের উৎপাত নেই,—অন্যায় করবে তবুও মালিককে বা গভর্ণমেণ্টকে চোখ রাঙাবে। সর্বত্র একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, তোমাদের কোনো মতের ঠিক নেই।

—আছে বৈ কি! নিশ্চয়ই আছে! যে কোনোও রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার ইচ্ছেটা জাগিয়ে তুলতে হবে সমাজের প্রত্যেক স্তরের পদদলিত মানুষের মধ্যে। তাই যদি না করা হয় তবে সমাজচেতনা আসবে কী করে?

—তবুও আমি বলবো তোমাদের Principle এর ঠিক নেই—আজ যাকে তোমরা চোর, জোচ্চার, লম্পট বদমাইস বলছ কাল তাকে তোমরা মাথায় তুলে নিয়ে নাচ্চ। কংগ্রেসের বেইমানদের, যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যায়, আবার তাদেরই বেশী করে কাছে টেনে নিচ্ছ।

—দলে আমরা প্রত্যেককেই টানতে চেষ্টা করবো তা' না হ'লে কাজ করবো কী করে? আমাদের এটা রামকৃষ্ণ মিশন নয়। বেইমান গুলোকেই তো দরকার বেশী; তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ আমাদের নিতেই হবে।

—এই জন্যই তো তোমাদের পার্টির কৌলিন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, ভুল কথা বরং বাড়ছে।

—না কথনই নয়। একটা উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের সৃষ্টি করেছ তোমরা সমস্ত দেশময়—বিশেষত বাংলাদেশে। একটা বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়তে দিচ্ছ না তোমরা, কেবল বাধার সৃষ্টি ক'রছ।

বন্ধু প্রবল উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল, বাঃ, বেশ কথা বল্লি! খেতে

পরতে, থাকতে, না পেলেই তো মানুষ চেঁচাবে। আর চেঁচাবে নাইই বা কেন ? মালিকদের আঁতে ঘা না দিলে তারা জব্দ হয় না—কোনো দাবী মেনে নেয় না। তা' ছাড়া, উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা এ দুটো জিনিস যদি মালিকের হাতে থাকে তা হলে উৎপাদন বাড়তে পারে না, কেননা মালিক দেখে তার লাভটা; লাভ না পেলে কারবারে টাকা ঢালতে চায় না—বলে over production—যার ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা নিত্যই বেড়ে চলেছে—ইনডাসট্রি গ্রো করছে না।

কলি ধীর কণ্ঠে বলিল, বাঁচার মতো করে বাঁচবার অধিকার সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই আছে এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু আগে সে অধিকার পাবার যোগ্যতা থাকা চাই, তারপর দাবীর কথা। আগে সমাজচেতনা তার-পর অধিকার। কিন্তু সে সমাজচেতনার উন্মেষ কোথায় ? আগে চরিত্রবল, মনোবল, তারপর অধিকারের কথা।

—এ সব অনেক তর্কের কথা তুল্লি, এখন আর ভাল লাগছে না, উঠি।

—এত তাড়াতাড়িই উঠবে ? আর একটু বসে যাও না।

—না থাক আর বসব না, আজ পার্টি মিটিং আছে, আসবি নাকি একবার?

—তা যেতে পারি আপত্তি নেই; কিন্তু আমার নাম-গন্ধ কোথাও রেখো না।—আচ্ছা, এসব করে কী হবে বল ত' বন্ধুদা' ? বরং কাজ কর, কাজ কর। তুমি গীতার শিক্ষা পেয়েছ, তুমি মানুষকে ভালবাসতে পেরেছ। বেশ! তুমি কংগ্রেসকে পছন্দ না কর ভূদানযজ্ঞে যোগ দাও। আবার বলি, এসো একসঙ্গে কাজ করি, বন্ধুদা' ! you are a misguided intellect.

কলির শেষ কথাটা তাহার যে কত ভাল লাগিল বলিবার নয়। অপরিসীম পুলকে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হাস্যমুখে বলিয়া উঠিল, থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না, ঢের হয়েচে, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার খুব কথা শিখেছিস। Intellect এর কী পরিচয়টা পেলি ?

কলির ওষ্ঠাধরে এক অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়া উঠিল—সে হাসি কত মধুর কত প্রেরণাময়, কত প্রাণভরা—বন্ধু মুগ্ধ নয়নে শুধু একটিবার তাহার মুখপানে তাকাইল।

কলি বলিল, না গো বন্ধুদা', সত্যি কথা বল্লুম, তোমার মধ্যে জিনিস আছে, তুমি একটু স্থিতধী হও।

সহসা বঙ্কু সেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া যেন আর কথা বাহির হয় না। আবার একবার কলির প্রশান্ত হাস্যমধুর মুখের দিকে তাকাইয়া সে শুধু তাহার হৃদয়ের অকপট ধন্যবাদটুকু প্রকাশ করিরা, স্থির হইয়া বসিয়া রইল। এত বড় একটা আত্মপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া নিজের মধ্যে নিজেকে সে বার বার প্রশ্ন করিয়া উঠিতে লাগিল,—তোর সাধনার পথ কোন্-মার্গে? সন্দেহ জাগে, পড়িয়া যায়, আবার আসে, আবার মিলাইয়া যায়। ক্ষণ কালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে কোথায় সরিয়া গেল,—সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দুঃখ, দারিদ্র, সুখ, আনন্দ, অশ্রু, হিংসা, দ্বেষ, উন্মাদনা, ত্যাগ, নিষ্ঠা সবই যেন তাহার মন হইতে শরতের এক খণ্ড লঘু স্বচ্ছ মেঘের ন্যায় নিমিষকাল মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার নিকট ইহাই বোধ হয় চরম সত্য, ইহাই বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র আনন্দ—একমাত্র নিমিত্ত—আর সব কিছুই মিথ্যা, সব কিছুই অন্ধকার, সব কিছুই নিষ্প্রয়োজন,—শুধু হৃদয় দেওয়া আর নেওয়া। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়া উঠিল, বুঝলি কলি ভাবছি এ ভাবে আর Politics করবো না।

কলি হাসিয়া ফেলিল,—কেন, কী হল? ও, সেইজন্যই বুঝি মুখ দিয়ে এতক্ষণ কোনো কথা বেরোয়নি। অনেক চিন্তা করে বল্লে বুঝি, কথাটা?

—সত্যি, এক এক সময় মনে হয়, না এভাবে রাজনীতি করা ছেড়ে দোবো।

—হুঁ, অত সহজে এ জিনিস ছাড়া যায় না বঙ্কুদা। এটা একটা নেশা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো দিকিন।

—Dr Roy is a genius, তাঁর কথা বাদ দে। আসি এখন বুঝলি। বলিয়া, বঙ্কু উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

শোনো বঙ্কুদা আজ রাতে আমাদের এখানে খেয়ো, নেমতন্ন রইল, তাছাড়া আরও অনেক কথা, অনেক তর্ক, এখনো মিটল না।

বঙ্কুর বুকখানা আনন্দে ফুলিয়া উঠিল, হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, ভালই তো আসবো। তা কী উপলক্ষে?

—আজ আমার জন্মদিন।

—ভারি দুষ্ট তো তুই। তা আগে বলিস নি কেন? খালি হাতে কী আসা যায়?

—খুব যায়। এসো, এক সঙ্গে কাজ করে যাই আমরা, তাহলেই সেটা বড় দেওয়া হবে। রাতে এসো কিন্তু—তোমার যখন সুবিধে হবে আসবে।

দিদি! দিদি! শীগগির আয়, শীগগির আয়, চলে আয়, বাইরে আয়, পুষ্করবাবু এসেছেন। বলিতে বলিতে সজল যেন একটা দমকা বাতাসের মতো ছুটিয়া আসিয়া, আবার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

বঙ্কুদা' যেয়ো না, একটু ব'সো আসচি, বলিয়া কলি শশব্যস্তে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া গিয়া এক রকম জোর করিয়াই হোল্ডলটা পুষ্করের হাত হইতে টানিয়া লইয়া নিজের বাহুমূলের ভিতর দিয়া শক্ত করিয়া জাপটাইয়া ধরিয়া লইয়া বলিল, ইস্, হাতটা একেবারে ভেরে গেছে বোধ হয়! কাউকে পেলেন না পথে?

পেয়েছিলাম একটি ছোট ছেলেকে, কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছিল তার, তাই তাকে তেতুলবাগানটার কাছাকাছি পর্যন্ত এনে ছেড়ে দিলাম।

—আঃ, না ছাড়লেই হত, এই ত আর একটুকুখানি পথ!

যাক্‌গে, সুটকেশটা আমার হাতে দিন, দিন না, ছাড়ুন, আমার হাতে দিন কাঁধে করে নোবো—ওঃ সেই সুটকেশটা রে দিদি, বুঝলি, সেই সুটকেশটা। বলিয়া সজল তাহার হাত হইতে সুটকেশটা কাড়িয়া লইল।

কলি হাসিয়া বলিল, তবে কী প্রত্যেকবারই একটা করে নোতুন সুটকেশ কিনবেন নাকি উনি?

—আঃ, তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে সজল, কথা শোনো না কেন? —না, না, তোমায় নিতে হবে না, ছি, লোকে কী বলবে বলত? আমি নিয়ে যাচ্চি—কতদূর যেতে হবে বল ত?

—ঐ তো আমাদের ঘর দেখা যাচ্ছে, চলুন, আসুন, বলিয়া সজল সুটকেশটা কাঁধের উপর চাপাইয়া লইল।

কলি বলিল, আগে থেকে একটু জানিয়ে এলে তো ভাল হ'ত, এত কষ্ট হ'ত না।

—না কিছু কষ্ট হয়নি।

—হয়েছে বৈকি, ইস, একেবারে ঘেমে গেছেন। ঠিক জায়গায় নামতে পেরেছিলেন চিনে? বলিয়া কলি বাড়ীর সদর দরজার কাছাকাছি আসিয়া

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া হোল্ডলটা মাটিতে নামাইয়া রাখিল।

বঙ্কু মুখটা অন্য দিকে করিয়া গম্ভীরভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। কলি তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া ডাকিয়া বলিল, চল্লে কেন বঙ্কুদা? শোনো, একটু দাঁড়িয়ে যাও! এসো, এনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি' তোমার।

বঙ্কু নিস্পৃহ কণ্ঠে একটা দৃষ্টিকটু গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, কে উনি? বেশ তো আর এক সময় হবে, এত ব্যস্ত হবার কী আছে? এখন আর একটুও দাঁড়াতে পারছি না। বড্ড কাজ জানিসই তো।

পুষ্কর একটু দূরেই দাঁড়াইয়া সজলের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, সুতরাং বঙ্কুর কথাগুলি তাহার কানে যায় নাই, তাই পরিচিত হইবার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল; কিন্তু প্রয়োজন হইল না।

কলি আর একবার অনুরোধ করিয়া বলিল, কী ভাবছ বঙ্কুদা এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি,—একই অফিসে আমরা কাজ করি বলতে গেলে একই জায়গায়, আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন উনি।

বঙ্কু সেই একই ধরণের নিস্পৃহতার সহিত বলিল, ভালই।

—তা এসো আলাপ করিয়ে দি, কী ভাবচেন বলত উনি, ছিঃ।

—অন্য সময় হবে, উনি ত দু'একদিন থাকবেন বোধ হয়? বলিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—যাক্, তা'হলে চল্লে? রাত্তিরে আসতে কিন্তু ভুল না।

—চেষ্টা করব, ঠিক বলতে পারছি না, যদি কাজের চাপে না আসতে পারি তো কিছু মনে করিস না। বলিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

পনেরো

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় কলি পরিবেশন করিতে করিতে বলিল, যাক্, ভাল দিনেই এসে পড়েছেন।—আজ আমার জন্মদিন।

—বেশ তো, আগে থেকে আমায় এতটুকুও জানান নি। ইস্ তাইতো একেবারে খালি হাতে এসে পড়লুম।

—ঐ জন্যেই তো জানাইনি। তাছাড়া যথেষ্টই তো এনেচেন।

—না কিছুই আনিনি, অত্যন্ত লজ্জায় ফেল্লেন আমায়।

—বাজে কথা বলতে হবে না।—নিন এখন খেয়ে নিন তো, কিছু ফেলতে পারবেন না। রান্নাটা কী রকম হয়েছে বলুন?

—খুব ভাল হয়েছে। এ কী—একটা আস্ত মুরগী! বাবাঃ, খাব কী করে?

—খুব পারবেন, খেয়ে নিন। এ দেশের রান্না কী রকম খেয়ে দেখুন—বড়ি পোস্ত, আর মাছের টক, কলাইয়ের ডালটা দিলুম না আর।

কেন, ভালই ত হত।

—পায়েসটা কী রকম হয়েছে খেয়ে বলবেন, এটা নিজের শেখা রান্না।

—তা. রামীকে দেখছি না যে?

—সজল বলিল, সে যে গ্রামসেবিকার কাজ নিয়েচে। গ্রামে গ্রামে ঘুরচে।

—কলি বলিল, কাল দেখা হবে। আসবে। চলুন আজ আপনাকে এখানকার দু'একখানা গ্রাম দেখিয়ে আনি।

সজল বলিল, হঁা, চলুন আজ বিকেলে বেড়াতে যাবো। যাবেন তো?

—হঁা, কেন যাব না, বেড়াতেই ত এসেছি।

—খুব মজা!—দিদি, তুই যা খেয়ে নে, আমি ততক্ষণ এনার কাছে বসছি।

—আচ্ছা তুই তা হলে ব'স্ আমি আসছি। বলিয়া কলি চলিয়া গেল।

খাওয়া দাওয়ার পরে পুষ্কর সজলকে লইয়া বেশ গল্পে জমিয়া গেল। কলিকাতা কী রকম সহর, সেখানে দেখিবার মতো কী কী জিনিস আছে, হাওড়া ব্রীজটা কত বড়, বড় গঙ্গাটাই বা কতখানি চওড়া, বোটানিকেল গার্ডেন্স আলিপুরের পশুশালা, তেরতলা দপ্তরখানা, ভারতীয় প্রত্নশালা, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিষয়ে সজল পুষ্করকে নানা রকম প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

কথায় কথায় সজল একটা সরল প্রশ্ন করিয়া বসিল। আচ্ছা আপনি গড়ের মাঠ দেখেছেন?

পুষ্করের একটু হাসিই পাইল, তাইতো, গড়ের মাঠ দেখ নাই এমন লোক তো কলিকাতায় খুব কমই আছে। তবুও কেনই যে তাহার এই কৌতুহল হইল সেটা জানিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

—কাগজে যে পড়ি কিনা। কাগজে দেখেছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওরলাল নেহেরু ঐ ময়দানে দু' একবার বক্তৃতা দিয়েছেন, বাবাও মাঝে মাঝে গল্প করেন খুব বড় মাঠ নাকি, লক্ষ লক্ষ লোক ধরে, সত্যি? আচ্ছা, আপনি প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছেন?

প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া পুষ্কর একেবারে অবাক হইয়া গেল। অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিল, হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু আমি ভাবছি তুমি প্রধান মন্ত্রী সম্বন্ধে এত খবর কী করে রাখ, তোমার মতো বয়সের ছেলেরা অনেকে তো তাঁর সম্বন্ধে জানেই না! তুমি তাঁর বক্তৃতা কখনো শুনেছ?

—হ্যাঁ শুনেছি। বোলপুরে যখন তিনি এসেছিলেন, শান্তি নিকেতনে, সেই সময়। মুখ্যমন্ত্রীর মত যদিও অত লম্বা নয়, মাথায় গান্ধী টুপী—হিন্দীতে বল্লেন, ভাল বুঝতে পারিনি, ওরেঃ বাবা, লোক সব হাঁ হয়ে শুনছে তাঁর কথা আমি রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা শুনেচি।

—তুমি তো অদ্ভুত ছেলে দেখছি, আশ্চর্য, তুমি এত সব খবর রাখ?

—আমরা যে কংগ্রেস ভক্ত।—ভালই হ'ল। কোলকাতায় গিয়ে তা' হলে প্রথমেই তোমায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অফিস দেখিয়ে নিয়ে আসবো। তা হলে আমি যে সমস্ত বইগুলো তোমাকে উপহার দেবো বলে এনেছি সেগুলো তোমার খুব কাজে লাগবে। এই সব মহৎ লোকদের জীবনী তুমি পড়বে,—রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখার্জি, বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধিজী, পণ্ডিত জহরলাল, নেতাজী বিনোবাজী, এ ছাড়া আরও অনেক বড় বড় লোকের জীবনচরিত তোমায় পড়তে দেবো।

—হ্যাঁ, দেবেন, দেবেন আমি পড়বো। আমার খুব ভাল লাগে পড়তে। আচ্ছা আপনি The Discovery of India বইখানা পড়েছেন?

পুষ্কর শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার পিঠের উপর মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, সে কী, এ বইয়ের নাম তুমি কী করে' জানলে?

—কেন, দিদির কাছে আছে যে, দেখেছি।

এমন সময় কলি আসিয়া উপস্থিত হইল। কথাটা তাহার কানে গিয়াছে। শুনিয়া বলিল, ও বইটা ওর পড়বার খুব ইচ্ছে, বুঝলেন। কিন্তু পারে না

ইংরেজীতে লেখা তো। অথচ এর বাংলাটা কিনি কিনি ক'রে আর কেনাই হয়ে ওঠে না।

পুষ্কর বলিল, আমি কিনেছি ওর জন্যে, কিন্তু আসবার সময় ভুলে ফেলে এসেছি। এখন থেকে মহৎ লোকদের জীবনী পড়ার অভ্যাস রাখা খুব ভাল।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত আমি ওকে বিনোবাজীর জীবনী পড়তে দিয়েছি। ভূদান যজ্ঞের ইতিহাস এবং আদর্শটা যে কী সেটা জানা দরকার, অবশ্য ওর পক্ষে এ বয়সে ও জিনিস বোঝা যদিও একটু শক্ত তবুও পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার এখন থেকে।—কে যেন ডাকছে বাইরে—দেখে আয় ত সজল।

সজল বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, বিলয়দা' এসেছেন, একবার ডাকছেন তোকে।

কলি সদর দরজার বাহিরে আসিয়া দেখে বিলয় একখানা ছোট কাগজের টুকরা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। টুকরাটায় শুধু এক কলমই লেখা আর বেশী নয়,—বঙ্কু এখনি একবার তাহাকে দেখা করিতে লিখিয়াছে; সভা আরম্ভ হইয়া গেছে।

বিলয় বলিল, বঙ্কু বলেছে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, meetingএর সময় হয়ে গেছে, বলতে গেলে আরম্ভ হয়ে গেছে।

—বলুন তাকে আমার যেতে একটু দেরী হবে। যাচ্ছি।

বিলয়কে বিদায় দিয়া কলি বাড়ীর ভিতরে গিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া লইয়া পুষ্করের কাছে আসিয়া আবার কিছুক্ষণ গল্পে মাতিয়া গেল।

এদিকে হাত ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখে প্রায় সাড়ে চারটে বাজিয়া গিয়াছে। সভা অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া যাইবার কথা এবং হইয়াও গেছে। অথচ তাহার যাইবার খুব একটা ইচ্ছাও, নাই কিন্তু না গেলেও নয়। মনে মনে ভাবিল একবার ঘুরিয়া আসিবে। বলিল, আজ আর বেরোতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না, একটা meetingএ attend করতে হচ্ছে কিনা। একটু ঘুরে আসছি, যাবো আর আসব, না গেলেই নয়। হাসিয়া বলিল, গ্রামে এসে হঠাৎ একটু আধটু পলিটিক্স করছি।

—ভালই তো।—না, না, মনে করব আবার কী, আসুন আসুন, ঘুরে আসুন। আমি ততক্ষণ সজলের সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করি।

—আচ্ছা, আসি তাহলে। বলিয়া কলি চলিয়া গেল।

পুষ্কর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি গান করতে পার সজল ? সজল হাসিয়া বলিল না, আবৃত্তি করতে পারি।

—ত'াহলে শোনাও দেখি একটা।

—শুনবেন ? আচ্ছা শুনুন, নজরুলের একটা শুনুন, 'মানুষ' কবিতাটা থেকে শোনাচ্চি ঃ—

গাহি সাম্যের গান—

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!

নাই দেশ-কাল, পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম্মজাতি

সব দেশে, সবকালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

আর এখন নয়, পরে আবার শোনাবো।

—বেশ পরেই হবে।—আচ্ছা দিদি কোথায় মিটিংএ গেলেন ?

—বঙ্কুদা'র বাড়ী।

কথাটা যেন এক ধাক্কায় পুষ্করকে কোথায় ভৃগু হইতে সানুনিম্নে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, বঙ্কুদা কে ?

—ঐ যে যাঁকে দেখলেন তখন দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দিদির সঙ্গে কথা বলছিলেন। দিদির সঙ্গে ওনার ছোটো বেলা থেকেই আলাপ, দিদিকে বলেন উগ্রপন্থী হতে।

পুষ্কর ব্যথিত কৌতূহলের সহিত প্রশ্ন করিল, দিদি কী বলেন তাতে ?

সজল এলো-মেলো ভাবে উত্তর করিল, দিদি বলে আমি, ভূদানযজ্ঞে যোগ দ'বো।—আমি ওসব অত কিছু বুঝি না কী সব কথা যে হয়।

তাইতো, পুষ্করের বিধ্বস্ত মনের কোণে কত স্থূল, কত সূক্ষ্ম প্রশ্নই না জাগিয়া উঠিল,—কে এই বঙ্কু ? মুখখানা যে মনে পড়িয়াও পড়ে না ; বার বার যেন নীহারিকার মতো চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিয়া ঘন ঘন হারাইয়া যাইতেছে,— এ কোন্ দুঃসহ আকাঙ্খা ! তবু···! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে যেন একটু অন্যমনা হইয়া গেল।

সজল সেটা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হল ? কী ভাবছেন ?

শুষ্ক হাসি হাসিয়া পুষ্কর বলিল, না এমনি ; ভাবছিলাম তোমার দিদি কী করে উগ্রপন্থীদের দলে যোগ দিতে পারেন ?

—না, না, দিদি কিছুতেই উগ্রপন্থী নয়। বঙ্কুদা'র সঙ্গে কেবল তর্ক হয়।

—কী বলেন তাতে তিনি ?

—বলে কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে যাবে, ভূদান যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যাবে, সে মানে অনে এ এ এক্ কথা, অনেক তর্ক। বঙ্কুদা রেগে ওঠে মাঝে মাঝে, দিদি কিন্তু এতটুকুও রাগ করে না। দিদি বলে, কংগ্রেসকে ভোট দ'বো—আর যেই না বলা, ব্যস্! বঙ্কুদা' অমনি ক্ষেপে ওঠে। দিদি মিট মিট করে হাসে। বাবা বলেন, ভুবনবাবুকে ভোট দ'বো, উগ্রপন্থীদের এতটুকুও বিশ্বাস নেই।

—তাই নাকি ? বলিয়া একটু হাসিল। মনে মনে ভাবিল—যাক্, তবুও ভাল যে উগ্রপন্থী নয়। জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা, ভুবনবাবু কে ?

—কংগ্রেসের লোক। খুব বিদ্বান লোক, ভাল লোক, বাবার থেকে ছোটো কিন্তু সব লোক খুব মানে। দিদিকে সেদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—দিদি গেছলেন ?

—হ্যাঁ। বলিয়া হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজীর ছবির মাঝখানে টানানো একখানা ছবির দিকে চোখটা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো ও ছবিটা কার ?

—জিসাস্ ক্রাইষ্টের।

সজল হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ ঠিক বলেচেন তো, কী করে জানলেন ?

পুষ্কর হাসিয়া জিজ্ঞসা করিল, বল তো তুমি কী করে জানলে ?

আমার এক কাকা যে খৃষ্টান। তা, ছাড়া দিদি যে গান্ধীভক্ত। দিদি বলে, গান্ধীজীও যীশুর ভক্ত ছিলেন।

—ঠিক বলেছেন দিদি। গান্ধীজী যে কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরে যীশুর একখানা ছবি থাকত, সেই ছবিখানার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

—জানেন, আমাদের বাড়ীতে অনেক বড় বড় নেতাদের ছবি আছে—যেমন ধরুন, গান্ধীজী, নেতাজী, পণ্ডিতজী, সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজদ থেকে সুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর, এমন কী, প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের ছবিও আছে।

—এত ছবি সব কে যোগাড় করলে ?

—দিদি। দিদির এটা একটা বাতিক। দিদির শোবার ঘরে কার কার ছবি

আছে জানেন ?—পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, নিমাই, সারদা দেবী। ভগবান বুদ্ধেরও ছবি আছে একখানা। —আচ্ছা, বলুন তো গান্ধীজীকে জাতির জনক বলে কেন ?

—বাঃ ভারী সুন্দর প্রশ্ন করেছ তো। আচ্ছা বুঝিয়ে দ'বো তোমায়।

—হ্যাঁ বলুন না, শুনি।

শুনবে ? আচ্ছা শোনো তা' হ'লে। তোমরা তো স্কুলে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ছ, কেমন ? ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস বোধ হয় তোমাদের এখন থেকেই পড়ান সুরু করা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

—তা' হ'লে একটু একটু বুঝতে পারবে। আচ্ছা শোনো।—এই ইংরাজ জাত, এদের দেশ ইংলণ্ডে—ইংলণ্ড কোথায় সে তো তুমি ভূগোলেই পড়েছ —এরা প্রথম ভারতবর্ষে আসে ব্যবসা করতে—সে ধর প্রায় আজ দু'শ বছরেরও আগে—তারপর আমাদের দেশের ধন সম্পদ দেখে তাদের খুব লোভ হয়, বুঝলে ? তারা তখন মতলব করতে লাগলো এ দেশটাকে দখল করে নেবার; ভাবলে যদি দখল করে নিতে পারে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য করে এ দেশ থেকে প্রচুর টাকা পয়সা সোনাদানা নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারবে। এই ভেবে তারা চেষ্টা চালাতে লাগল, শেষ পর্যন্ত এ দেশ তারা দখল করে নিলেও। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আমবাগানে ইংরাজের সঙ্গে বাঙলার তখনকার নবাব সিরাজদৌলার এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নবাব হেরে যান।

—আচ্ছা পলাশী কোথায় ?

—পলাশী হ'ল, মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যে—মুরশীদাবাদের তেইশ মাইল দক্ষিণে, আবার এই মুর্শিদাবাদ হ'ল তোমাদের এই বীরভূম জেলারই লাগালাগি বলতে গেলে।

—তা হলে তো আমাদের দেশের কাছেই।

—হ্যাঁ, তাইত।

শুনিতে শুনিতে সজলের কৌতূহল ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছিল। আগ্রহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা তারপর কী হল বলুন।—আচ্ছা ইংরাজদের দেখতে কেমন ?

—এবার যখন আমার সঙ্গে কোলকাতায় যাবে তখন দেখিয়ে দ'বো—ফরসা

দেখতো। তারপর শোনো, নবাব তো হেরে গেলেন, কিন্তু তিনি হেরে গেলেন মানেই সমস্ত বংলা দেশ ইংরাজের দখলে চলে গেল বলতে গেলে। নবাবের তখন বয়স কত ছিল জান ?

—কত ?

—মাত্র কুড়ি বছর। আর তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন নবাব।

—এ্যাঁ! মাত্র কুড়ি বছর বয়স!—আচ্ছা তারপর কী হল ?

—বাঙলার পর আস্তে আস্তে করে তারা সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করে নিল, আমরা একেবারে পরাধীন হয়ে গেলুম। কিন্তু এ দিকে আবার দেশকে স্বাধীন করবার জন্য ইংরাজের সঙ্গে লড়ালড়ি করতেও ছাড়লুম না আমরা। লড়ে চল্লুম! আমরা সারা ভারতের লোক হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ সকলে মিলে এক হয়ে ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম। চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫ সালে, তার মানে ধর আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে—Indian National Congress অর্থাৎ যে কংগ্রেসের নাম আজ আমরা করছি—এই নামে একটা দল গঠন করা হয়। এখানে একটা জিনিস জেনে রাখ,—এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কল্পনা যাঁর মাথায় প্রথম আসে তিনি হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জীবনী এনেছি, পড়ে দেখো। সেই দলে তখনকার দিনের ভারতের খুব বড় বড় পণ্ডিত, বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং সাহসী লোকেরা এসে যোগ দেন, এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ভারত-বর্ষময় তার শাখা গড়ে ওঠে। ইংরেজ এই কংগ্রেসকে দেখে দস্তর মতো ভয় পেয়ে গেল। এই কংগ্রেসের প্রথম যিনি সভাপতি হন তাঁর নাম হলো উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। প্রতি বছরই এই কংগ্রেসের একটা সম্পূর্ণ অধিবেশন হ'ত যেমন আজও হয়। এই যে কংগ্রেসের কথা বলচি এর মধ্যে তখনকার যুগে ভারতের সাধারণ লোক যেমন ধর, চাষী, মজুর বা অন্য সব গরীব দুঃখী লোক, বিশেষ করে অশিক্ষিত লোকেরা এসে যোগ দেবার সুযোগ পায় নি বা যোগ দিত না। কিন্তু গান্ধীজী এসে যখন এই কংগ্রেসে যোগ দিলেন তখন এই কংগ্রেসের মধ্যে যেন একটা নোতুন প্রাণ এল। অর্থাৎ তিনি চাইলেন কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ও দরিদ্র চাষী মজুরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। চরখা এবং খদ্দরকে ইংরেজরা আমাদের ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু গান্ধীজী সেই চরখার আদর সকলের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনলেন। তিনি

ইংরেজকে এদেশ থেকে অস্ত্রের সাহায্যে মারধোর করে তাড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন না,—হিংসাকে তিনি প্রশয় দিতেন না। তিদি প্রত্যেক মানুষকেই ভালবাসতেন। আমরা পরাধীন ছিলুম তো, তাই আমাদের কোনো রকম অস্ত্র ছিল না; অথচ আমাদের আবার লড়তে হবে; কী করে লড়ি? তাই গান্ধীজী এমন একটি কৌশল আবিষ্কার করলেন যার বলে তিনি ইংরেজের সঙ্গে রীতিমত লড়ালড়ি করবার সুযোগ পেলেন। অহিংসা, সত্যাগ্রহ, এবং অনশন ব্রত গ্রহণ—এই তিনটি অস্ত্রের ব্যবহার তিনি জাতিকে শিখিয়ে গেছেন। অবশ্য যদিও এখন এ সব জিনিস বোঝা একটু শক্ত তোমার পক্ষে তাহলেও জেনে রাখো। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এমন সুন্দর নীতি আবিষ্কার করতে পারে নি। কংগ্রেসের আদর্শ দরিদ্র অশিক্ষিত ভারতবাসীর সামনে তিনিই তুলে ধরেছেন তাই তিনি জাতির জনক হয়ে আছেন।

বিষম আগ্রহের সহিত সজল এইসব ইতিবৃত্ত শুনিয়া গেল। তারপর চা আনিতে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

বঙ্কুর মনটা ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ ধরিয়া ছটফট করিতেছিল,—উঃ! এ যেন একটা বিষজর্জ্জর কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে,—কলিকে ডাকাইয়া পাঠাই-বার তার এমন কিছু প্রয়োজন ছিল না, তবুও ডাকাইল। কলি আসিয়া বলিল, কী গো বঙ্কুদা' ডেকে পাঠালে কেন? আমি ত আসতুমই। বলিয়া একটা লোহার চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল।

—আসতে দেরী হচ্ছে দেখে ডেকে পাঠালুম।

আসতুমই তো, না পাঠালেও চলত।

—তা যাক্। কী decide করলি?

—কেন আমার ত decision নেওয়াই আছে।

—তার মানে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবি, এই বলতে চাস্?

—না, আমি তা বলি নি, আমি বলেছি আমি সমাজসেবার কাজ নোবো।

বঙ্কু ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, কেন আমাদের কাজটা কী সমাজ-সেবার কাজ নয়?

—কিন্তু আমি তো রাজনীতি করব না. সে ত তোমায় বলেই দিয়েছি। তোমারা ত সমাজসেবার নামে রাজনীতি করছ।

বিলয় বলিল, তাহলে আপনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছেন কেন?

না না, আপনি ভুল বলছেন। আমি কংগ্রেসকে ভালবাসি একথা বলেছি। বন্ধুদার কাছে তো বরাবরই আমি এই কথাই বলে আসছি। লক্ষটা যখন দু'দলেরই এক তখন পথটাও ত এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশের ও সমাজের কল্যাণ যখন আপনারা চান এবং কংগ্রেসও চায় তখন যুক্ত হয়ে কাজ করে যাওয়াটাই তো সমীচীন।

বিলয়ের দেহের রক্ত যেন সহসা ভিতরে ভিতরে আগুন হইয়া উঠিল, বলিল, এ কী হাস্যকর কথা বলছেন আপনি দিদি ? আমরা কোথায় চাইছি পুঁজিদার ধ্বংস করতে আর আপনি কিনা বলছেন তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে —বাঃ ! বেশ কথাই বল্লেন।

কলি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনারা আগে থেকেই ভয় পাচ্ছেন কেন ? সমাজতান্ত্রিক ছাঁদে রাষ্ট্রগঠনই যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য তখন সমাজব্যবস্থায় পুঁজিদারদের মুরুব্বিয়ানা কংগ্রেস কায়েমী হতে দেবে না। ধাপে ধাপে উঠতে হবে আমাদের। আজকের ১৯৫৬ সালের ভারতবর্ষ ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অবস্থায় নেই, সুতরাং আপনারা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পিছনের দিকে তাকাবেন না।

—এ আপনার সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কথা। যখন সমস্ত উৎপাদন এবং বণ্টনের ভার পুঁজিদারদের খেয়ালখুসির উপর নির্ভর করছে তখন আপনি কী করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কথা চিন্তা করতে পারেন ? সেরেফ শোষণ চলচে।

কলি ধীর স্থির। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনারা যে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলবার কল্পনা করছেন বিলয়বাবু তা সহজসাধ্য নয়। শোষণ কংগ্রেসও চায় না, তবে রাতারাতি কোনো কিছু ঘটিয়ে তুলতে গেলে অনেক কিছু বাধা-আসবে। এই নিয়ে বন্ধুদার সঙ্গে সেদিন অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। তা ছাড়া আর্থিক অসমঞ্জসটা বড় কথা নয়।

বিলয় বলিল, কেন ? এই থেকেই ত সমাজে মানুষের দুঃখ দারিদ্র বেড়ে চলেছে।

কলি বলিল, আপনার এ কথা অস্বীকার করি না, তবে একটা কথা কী জানেন, এই অর্থনীতিক অব্যবস্থার তবু যাহ'ক একটা সুব্যবস্থার সুপথ খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু অনন্ত কালের যে শোষণ তাকে আপনারা রুখতে

পারবেন কী করে ? প্রত্যেক সমাজেই মানুষ আপনা হতেই ব্যষ্টিগত ভাবে, এমন কী শ্রেণীগত ভাবে আত্মসমর্পণ করে চলেছে। মানুষে-মানুষে প্রভেদ এ তো জন্মগত প্রভেদ, এ তো মূল প্রকৃতিতে প্রভেদ, এখানে মানুষের নিজের কোনো কিছু করবার ক্ষমতা নেই। তাই এখানে একজন অপর আর একজনকে টপকিয়ে যেতে পারে না। গেলেই বিপদ। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। সকল জাতির পক্ষে, সকল দেশের পক্ষে, সকল সমাজের পক্ষে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। সমাজে স্তরে স্তরে মানুষে মানুষে শোষণ চলে আসছে। যারা আবার মহাপুরুষ তাঁরা আবার বেশী শোষণ করেন। যাঁরা ধর্ম প্রবর্ত্তক তাঁরা ত সবচেয়ে বড় শোষক—মানুষের জ্ঞানকে, বুদ্ধিকে, চিন্তাশক্তিকে তাঁরা কী ভাবে যে শোষণ করে যান তা কল্পনাও করা যায় না। এইভাবে লেনিনও করেছেন, গান্ধীজীও করেছেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন, পরমহংসদেবও করেছেন আবার পণ্ডিতজীও করছেন। আবার democracyর নামে বন্ধুদাও কববার চেষ্টা করছে।

বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, এসব তোর বিকৃত মনোভাবের কথা। একে যদি শোষণ বলিস তাহলে মানব সভ্যতার ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস মিথ্যে। ও ভাবে কখনো তর্ক করা চলে না। আমরা শোষণ বলতে বুঝি অর্থনীতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক ও মানসিক বন্ধ্যতা। যাক্, বুঝতে পেরেছি এসব তোর মূল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। এখন কাজের কথা বল্ শুনি।

কলি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, কাজের কথা তো ঐ একটা—তোমরা কংগ্রেসে গিয়ে যোগ দাও তা'হলে দেখবে সব শোষণ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসবে। শুধু রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, আমেরিকার মুখ চেয়ে বসে থাকলেও হবে না, আমাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে —অতীত থেকেই বর্ত্তমানের মন গড়ে ওঠে—জোর করে কখনো কোনো জিনিস সমাজের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। ইতিহাসকে কখনো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না, বিলয়বাবু। আমরা, আমরাই।

বিলয় আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, দৃপ্তকণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিল, অবান্তর কথা বলবেন না দিদি! আমরা কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চাই এবং করবোও

এ আপানি দেখতে পাবেন। প্রয়োজন হলে রাশিয়ার .দিকে তাকাতে হবে বৈকী আমাদের। ভাগ করে খাবার দিন এগিয়ে এসেছে।

কলি ধীর কণ্ঠে বলিল, ভুল হবে। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। শুধু দুটো কথা দিয়েই আপনাদের বুঝিয়ে দ'বো এ জিনিস। প্রথমত:, রাশিয়ার লোক সংখ্যা দেখুন, মাত্র কুড়ি কোটি, যেখানে ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় আটত্রিশ কোটির কাছে। তারপর তার আয়তনের কথা ভেবে দেখুন, প্রায় ৮৩ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ তারাই দখল করে বসে আছে, যেখানে ভারতের আয়তন মাত্র ১২ লক্ষ বর্গমাইলের কাছে। তা' ছাড়া, তাদের সম্পদও অফুরন্ত। তবুও তাদের সমাজে একদিন আর্থিক সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়াবে, যতই তারা family planning করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করুক না কেন। চায়না তো আগে মরবে। ভারতের কথা ওঠেই না। পুঁজিবাদী আমেরিকাকেও একদিন ধ্বংস হতে হবে। যাক্,আর বেশী কথা বাড়াতে চাই না। তবে শেষ কথাটা আমি এই বলি, স্বামীজীর ভাষায় বলি, এ হল সনাতন ধর্ম্মের দেশ—সুতরাং এখানে কোনো ইজ্‌ম্ খাটবে না।— আচ্ছা উঠি তা' হলে এখন, বুঝলে বঙ্কুদা'। বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বঙ্কু বলিল, শোন্, সামনের সপ্তাহে আমাদের এখানে একটা বড় রকমের সম্মেলন সভার আয়োজন করা হয়েছে। সমস্ত পশ্চিম বাঙলার প্রত্যেক জেলা থেকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট উগ্রপন্থী নেতারা এবং কর্ম্মীরাও আসবেন। সেই সভায় তোকেও উপস্থিত থাকতে বলচি।

কলি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, এ কী অসম্ভব কথা বলছ বঙ্কুদা'।

—না, এতটুকুও অসম্ভব নয়, ইচ্ছে থাকলেই আসতে পারবি।

—কিন্তু তা হ'লেও।

—কেন তুই ত বলেছিস দরকার হলে চাকরিও ছেড়ে দিতে পারিস। তবে আর কেন hesitate করছিস? রাজনীতিতে মত পরিবর্ত্তন চলে।

—কিন্তু আমি তো রাজনীতি করি না; আচ্ছা, চেষ্টা করব আসতে; তবে, কথা দিতে পারছি না। আজ রাতে আসছ তো?

—খুব চেষ্টা করবো।

—না, না, এসো ; ভেবে চিন্তে বলব ; সব কাজ সেরেই এসো। বলিয়া কলি প্রস্থান করিল।

ষোল

তিন দিন পরের কথা।

আজ শীতটা যেন নাই বলিলেই হয়। প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া পুষ্কর বলিল, চলুন আজ বেড়াতে বেরোবো।

কলি বলিল, বেশ তো, চলুন, আজ আপনাকে আমাদের এ দিককার দু'চারখানা গ্রাম দেখিয়ে আনি, চলুন নদীর ধার দিয়েও বেড়িয়ে আসবেন।—হাঁটা অভ্যাস আছে তো ?

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—চলুন বেরিয়ে পড়ি।—এসো সজল যাই। বলিয়া তাহার নিজের ক্যামেরাটা বাঁ কাঁধের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইল।

কলিরও একটা খুব ভাল ক্যামেরা ছিল ; সেও সেটিকে নিজের ডান কাঁধের সহিত ঝুলাইয়া লইল। ওয়াটার বটল্‌টা সজল-এর হাতে রহিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া কলি হঠাৎ একটা খড়ো ঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর পুষ্করের হাত হইতে তাহার ক্যামেরাটা চাইয়া লইয়া বলিল, আজ আপনার ক্যামেরাটা দিয়েই ফটো তুলব, দিন ত'।

—এখানে কী ছবি তুলবেন ?

—দেখুন না কী ছবি তুলি ; বলিয়া 'শশি'! 'শশি'! বলিয়া কাহাকে ডাক দিল।

শশী বাড়ীতে ছিল না। ডাক শুনিয়া তাহার স্ত্রী অঘোরী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অঘোরীর বয়স খুব বেশী নয়, পঁচিশের সামান্য কিছু ঊর্ধ্বে ! ক্ষীণাঙ্গী, গর্ভবতী। দেহে রক্তহীনতার দরুণ সমস্ত মুখখানা একেবারে পাণ্ডুর হইয়া আছে। পরণে একখানা ছিন্ন মলিন ডুরে সাড়ী যাহার এক তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়াতে দেহের সম্পূর্ণ লজ্জা কোনমতে নিবার্য্য। মাথার সম্মুখভাগের

চুলগুলি উঠিয়া গিয়া কতকটা জায়গা একেবারে বেশ ফাঁক হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট। দেহের বর্ণটা ঠিক পাকা তেঁতুল বীচির স্থায় কালো। জাতিতে মুচি। বহুদিন পূর্ব্বে কলিদের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করিত, কিন্তু এখন স্বাস্থ্যহীনতার কারণে আর পারে না, তাই ঘরে বসিয়া থাকে। কিন্তু, ঘরে বসিয়া থাকিলে ত' দিন চলে না অথচ স্বামী শশীটা একটা মদ্যপ, লম্পট, অত্যাচারী ; নিষ্ঠুর, স্ত্রীর প্রতি তাহার বলিতে গেলে এতটুকুও মায়া নাই, মমতা নাই, আছে শুধু পাশবিক অসক্তিটুকু। তিলপাড়া বাঁধের ওখানে একটা ঠিকাদারের নিকট কাজ করে সে। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটা দিন সেইখানেই অতিবাহিত করে,—মদ খায়, তাড়ি খায়, পচাই খায় এবং একটা প্রবীণা সমাজ-ভ্রষ্টা ব্রাহ্মণ ভিখারিনীকে লইয়া তাহারই ঘরে রাত কাটাইয়া থাকে—ইত্যাদি। বাকী দুইটা দিন স্ত্রীর কাছে আসিয়া থাকিয়া যায় এবং যখন থাকে তখন কোনো দিন বা তাহাকে তাহার ঐ অবস্থাতেই বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া মাদকতার বশবর্ত্তী হইয়া অজস্রভাবে আদর করিতে থাকে এবং করিতে করিতে দেহটীকে যেন তুলা ধুনা করিয়া ছাড়ে অথবা মেজাজ চড়িয়া গেলে সামান্য কারণেই তাহাকে প্রহার করে, বা মুখের আহার কাড়িয়া লয়।

অঘোরী বিশুষ্ক বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আনিয়া বলিল, কি গো ক'দিন ই বাগে আস নাই যে দিদিমণি, কী হইছিল, গো ?

কলি হাসিয়া বলিল. না কিছু হয় নি রে, এমনি সময় করে আসতে পারি নাই।

পুষ্কর একটু দুরেই দাঁড়াইয়া ছিল ; তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া অঘোরী মিট্ মিট্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, উটি জামাই নাকি ?

কলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—দূর পাগলি, আমার কী বিয়ে হয়েছে নাকি ? আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন। তা যাক্, তোর খবর কী বল্ ?

অকস্মাৎ অঘোরীর দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। একটা ঢোঁক গিলিয়া লইয়া কাতরস্বরে সে বলিল, উঃ কাল রেতে খুব মেরেছে গো দিদিমণি! উয়োর বদ অব্যেসটো ছাড়াইতে পার ?

—উঃ! পশুটা এখনো ঠ্যাঙাচ্ছে!—অঘোরী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, কী বলবো গো দিদিমণি এই পেটটর উপর একট লাথি মেরেছে।

কলি একেবারে আঁতকাইয়া উঠিল।

ধাক্কাটা যেন পুষ্করেরও মনের উপর গিয়া আঘাত করিল। স্তম্ভিত হইয়া সে সজলকে জিজ্ঞাসা করিল, কী হল, কাঁদছে কেন মেয়েটি ?

—ওর স্বামিটা নাকি বড্ড পচাই খায়। খুব মারে বউটাকে, আমাদের বাড়ীর ঝি ছিল বুঝলেন।

পুষ্কর এক মুহূর্ত্তে ব্যাপারটার সব কিছুই বুঝিয়া ফেলিল ; আর বেশী কিছু প্রশ্ন না করিয়া সজল-এর কাঁধের উপর ডান হাতটা রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কলি ইতিমধ্যে সেই ক্রন্দনরতা অঘোরীর ঝপ করিয়া একটা ছবি তুলিয়া লইয়া পুষ্করকে কাছে ডাকিয়া বলিল, দেখুন, এইত এদের জীবন ! কী দুঃখের জীবন ; আহা মেয়েটি বড় দুঃখী ! আমাদের বাড়ী কাজ করত, এখন আর পারে না, শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তার ওপর···(অর্থাৎ ছয়মাস গর্ভবতী) স্বামীটা কাজ করে, রোজগারও মন্দ করে না, কিন্তু ভীষণ নেশা করে। তার ওপর চরিত্রহীন।

হঠাৎ কথার মাঝে চোখ মুছিতে মুছিতে অঘোরী বলিয়া উঠিল, উ নেশা করে করুক, যেন এমনি করে আর না মারে বাবু, ইয়ের ব্যবস্তাটা করে দাও ; খুব মারে, খুব মারে, বাবু ! ঠাঙানিটা যদি থামায় দিতে পার ! খেতে না দ্যায় তাও ভাল, খেটে খাব ; পেটের এই ছেলে যেন না মরে। বলিতে বলিতে আবার সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কলি জিজ্ঞাসা করিল, গেছে কোথায় ?

—কী করে জানবো ? বলে ত' যায় না।

—রান্না করচিস্ ?

—না, চাল বেড়ে গেইছে (বাড়ন্ত)

—কতটা সুতো কেটেছিস্ ?

—এক টুকুনও লয়। পারি নাই গো দিদিমণি। বলিতে বলিতে পুনরায় সে কাঁদিয়া ফেলিল।

—তা, হলে' দুটো দিন খালি ঠ্যাঙানি খেয়েই গেল, বলিয়া পুষ্করের দিকে ডান হাতটা বাড়াইয়া বলিল, কাছে দুটো টাকা আছে ? দিন ত'। আনতে ভুলে গেলুম। বাড়ী যেয়ে দিচ্ছি।

—আঃ, দেওয়ার কথা পরে, দিয়ে দিন ওকে, বলিয়া পুষ্কর মণি ব্যাগ হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া কলির হাতে দিল।

টাকাটা হাতে পাইয়া অঘোরীর কান্নাটা যেন আরও বাড়িয়া গেল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার উহাই বোধ হয় তাহার একমাত্র ভাষা। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কাল একবার এসো দিদিমণি, সুতো কেটে রাখব।

—আচ্ছা আসবো!—দুঃখ করিস্ না অঘোরী, সব দুঃখ কেটে যাবে তোর, আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। ভগবান ওকে সুমতি দেবেন। তুই একটুও ভাবিস্ না। আইন করে মদখাওয়া বন্ধ করে দ'বো। বলিয়া কলি তাহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া তাহার গর্ভাবস্থার সংবাদ লইয়া এবং তৎসম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি দিয়া সে চলিয়া আসিল।

আচ্ছা, এর ছবিটা কেন নিলুম বলুন তো?

—তাইত, কেন যে নিলেন বুঝতে পারলুম না।

—এগুলো আমার collectiou; এই ধরণের অনেক ছবি আমি তুলে নিয়েছি।

—কী করবেন এগুলো দিয়ে?

—মাদকতা বর্জন এর idea নিয়েচি।

—বাঃ, বেশ idea ত, আপনার।

—এই মেয়েটিকে একটি চরখা কিনে দিয়েছি, বলেছি অবসর মত চরখা কাটবে, তা' থেকে কিছু কিছু রোজগার হবে। তা' ছাড়া, ঢেঁকিতে ধান কোটা তো একরকম বন্ধ হয়ে গেছে; তার জায়গায় কিছু শারীরিক ব্যায়াম করুক, তাহলে, স্বাস্থ্যটাও ভাল থাকবে।—অবশ্য ঘরে ঘরে আবার ঢেঁকি বসাতে হবে।

—আশ্চর্য্য, মাত্র এই কিছুদিন এসেছেন, এর মধ্যে এত কাজ করে ফেলেছেন।

—কুমোরদেরও আজকাল কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরও ঘরে ঘরে চরখার প্রচার করতে সুরু করেছি।—আচ্ছা, আসুন, আরও দেখবেন—বলিয়া ক্রমশই তাহারা হাঁটিয়া চলিল।

শস্যশূন্য ক্ষেত। উহারই উপর দিয়া একটা আঁকা-বাঁকা পায়ে-চলা পথ ধরিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। কলি আগে আগেই চলিতেছিল। তাহাকে হঠাৎ

দেখিতে পাইয়া বিরাট সর্দার হাল্‌টা থামাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে জমিতে লাঙল দিতেছিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝুমরিকে দেখতে যেছো বুঝি, হঁ্যাগো মেয়ে ?

হঁ্যা।

—উ বাবুটী কে গো ?

—জানা শুনো, আমাদের গাঁ দেখতে এসেছেন।

বিরাট একটু হাসিল।

—এসো সর্দ্দার, আমার সঙ্গে একবার এসো, দেখে আসি মেয়েটাকে।

—আচ্ছা চল যাই, বলিয়া বিরাট হুঁকাটা হাতে লইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল।

ঝুমরি একটা ঋজুকায় নিমগাছের নিচে বসিয়া অতিক্রান্ত প্রভাতবেলার স্নিগ্ধ রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল। দূর হইতে কলির সঙ্গে একজন বিদেশী যুবককে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ঝপ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সে গৃহাভ্যন্তরে পলাইয়া গেল।

—লাজ কিসের মা, আয়, বাইরে আয় ? বলিয়া বিরাট হঠাৎ চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

ঝুমরি লজ্জাবনত মুখে বাহির হইয়া আসিল। তাহারও বয়স প্রায় পঁচিশের উর্দ্ধে। চেহারাটা তামাটে। দেহ একটু হ্রস্ব। দুরারোগ্য-ব্যাধিগ্রস্ত দেহে বিধ্বস্ত যৌবনের নিষ্ঠুর লাঞ্ছন। অবিবাহিতা। কিন্তু হায় রে! যৌবনের উন্মাদনা, সে যে দুর্দম, অন্ধ, অশান্ত, অর্বাচীন, তাই সে যে অবুঝের মতো জীবনের মরুপথে প্রেমের মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলে—তাইতো, কে তাহাকে রোধ করিতে পারে ? দেহ ? সেও যে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দেয়। তৃষ্ণায় সে যে পাগল হইয়া আছে,—সে চায় শুধু তৃপ্তি, শুধু সম্পুর্ণতা তার কিছুই নয়। আজ ঝুমরির মধ্যে সেই অন্ধ সম্পূর্ণতা, তাই সে আজ তৃপ্ত হইয়াও রিক্ত,—যে তাহাকে পথ দেখাইল সে-ই তাহাকে পথহারা করিল। কেন ? সেটা যে একটি মত্তপ লম্পট নিষ্ঠুর পশুরও অধম। রোগজর্জ্জর দেহ তার! যৌবনব্যাধিতে আক্রান্ত লইয়া বহুদিন ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় ; তারপর ঝুমরিকে হঠাৎ একদিন ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া প্রায় সাত আট বছর স্বামী-স্ত্রীর মতো তাহার সহিত ঘর করে, কিন্তু বিবাহ

করে না। ইতিমধ্যে সেই সংক্রামক ব্যাধিটা ধীরে ধীরে ঝুমরির সুন্দর সুস্থ দেহেও সংক্রামিত হইয়া যায় এবং চিকিৎসার অভাবে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন বিষয়ে অজ্ঞতার ফলে ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতে থাকে। কিন্তু রোগের মধ্যেও সেই পশ্বধম এই অসহায়া নারীটির প্রতি দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিত না। মাঝে মাঝে সেই নির্য্যাতনের মাত্রাটা এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়া বসিত যে, মেয়েটি সেটা এড়াইয়া যাইবার জন্য প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কোনো বাঁশবনে অথবা প্রতিবেশীর কোনো গোয়ালঘরে বা থামারের মধ্যে আশ্রয় লইত। কিন্তু ক্রমশঃই যখন সেই নিষ্ঠুর নিগ্রহের মাত্রাটা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে গিয়া উঠিল, তখন আর সেই দুঃখিনী রমণী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না; হঠাৎ একদিন অমাবস্যার গভীর রাতে তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়া আশ্রয় লইল। সেই অবধিই সে পিতৃগৃহেই থাকে। সে আজ প্রায় তিন বছরের কথা।

—কি রে, কেমন আছিস ঝুমরি?

—একটুকু ভাল আছি, দিদিমণি।

—মুখের ফুলোটা একটু কমেচে না? দেখি, এদিকে সরে আয় ত'; হ্যাঁ, আস্তে আস্তে লালচে ভাবটা একটু একটু করে কমচে বলে মনে হয়! সে ওষুধ দুটো খাচ্ছিস ত?—বলিয়া তাহার মাথার উপর একটিবার হাত বুলাইয়া তাহাকে ভরসা দিল।

—হ্যাঁ, খেচি।

—লাল বড়িটা রোজ আটটা করে খাবি, আর ঐ সাদা বড়িটাও দুটো করে দিনে তিনবার খাচ্ছিস ত'?

—দু'দিন খেতে ভুলে গেইচি।

—আঃ—না—না, খবরদার ওষুধ কখনো বন্ধ দিবি না! ইনজেকসন্ নিচ্ছিস ত'?

—হ্যাঁ।

—কাপড় চোপড় যেমন ভাবে সব কেচেকুচে নিতে বলেছি সেইভাবে নিস্ ত'?

—সবান ফুরুয়েঁ গেইছে।

—তা, আমার কাছে আসিস নাই, কেন? বলিয়া বিরাটের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, কী গো সদ্দার আমার কাছে আস নাই কেন?

বিরাট কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আর কী বলব গো মেয়ে, সময় কই বল। আর পারছি না ছাই, একা একা খ্যেটে খ্যেটে মলম; বলিতে বলিতে হঠাৎ কেমন যেন সে একটু অস্থির হইয়া উঠিল। বিরাটের রাগের ও বিরক্তির কারণও আছে, কেননা বছর পাঁচেক হয় তাহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছে; অবশ্য পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু শুধু ব্যাধিগ্রস্থ মেয়েটার মুখ চাহিয়া সে ঐ কাজে আর অগ্রসর হয় নাই।

ফস্ করিয়া রাগিয়া উঠিয়া সে রুক্ষস্বরে বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, আর কী হবে উসব ওসুদ-টস্নুদ খেঁয়ে, উয়োর কপাল পুড়েছে গো মেয়ে কপাল পুড়েচে; মোলেও বাঁচি, আমাকে উ জালাইতে জন্মেচে। যেমন আমাকে ফেলে পাঁলাইছিলি ঠিক হইচে, মর্! মর্! আপদটা ম'লে বাঁচি! বলিতে বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে মাথায় হাত দিয়া সে মাটীতে বসিয়া পড়িল।

পিতার অবস্থা দেখিয়া কন্যা আর নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না, রুদ্ধ বেদনার অসহনীয় দুর্দমনীয় তীব্রতায় তাহার চোখের কোণ বাহিয়া বিগলিত ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিল! একটা দীর্ঘনির্শ্বাস ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু পারিল না। বৃদ্ধ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ছুঁস্নি, ছুঁস্নি আমায়, মেয়ে মানা করেছে।

কলি বুড়াকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, মেয়ের ওপর রাগ করো না সদ্দার। ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বলিয়া ইত্যবসরে ক্যামারাটা ঠিক করিয়া লইয়া স্নট করিয়া পিতাকন্যাকে লইয়া যে করুণ দৃশ্যটির উদ্ভব হইয়াছে তাহারই একটা ছবি তুলিয়া লইল। তারপর পুষ্করের কাছ হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট লইয়া ঝুমুরির হাতের কাছে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বাপের ওপর অভিমাম করিস্ না খুকী, রাগ করিস্ না। তোরই জন্য ত, ওর বেশী ভাবনা! তোকে খুব ভালবাসে বলেই তোর ওপর অত রাগ করেচে। সদ্দারের মাথার ঠিক নেই এখন। কিছু দুঃখ করিস্ না, খুকী। এখনই সব কিছু ভুলে যাবে ও!

ঝুমরি চোখের জল মুছিয়া লইয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া লইয়া বলিল, না আমি একটুকুও রাগ করি নাই দিদিমণি। বলিয়া টাকাটা সে যেইমাত্র হাতে

করিয়া লইতে যাইবে ঠিক সেই সময় সজল বলিয়া উঠিল, ওর হাতে কেন দিচ্ছিস দিদি? তুই ত ওকে সব কিছু ছুঁতে মানা করেছিস্! দিস্নি ওর হাতে!

—ও হ্যাঁ, তাইতো, ঠিকই বলেছিস তো, সজল।

সজলের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমরিও বলিয়া উঠিল, আমারও কিছু খ্যাল্ ছিল না দিদিমণি, মাথাটর তো ঠিক নাই।

কলি এইবার বুড়ার হাতের কাছে নোটখানা ধরিয়া লইয়া বলিল, এই নাও সদ্দার, ধর। মেয়ের ওপর রাগ ক'রো না। মা-মরা মেয়ে তোমার, তার ওপর অসুখ হয়েছে, ওর মনে দুঃখ দিও না। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন —আচ্ছা আসি এখন, বুঝলে সদ্দার। তোমাদের কারুকেই আর আমার কাছে আসতে হবে না, আমিই আসবো!

এতক্ষণের পর বিরাট যেন একেবারে ফাটিয়া পড়িল। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; যেন শুধু ঐ একটু সময়ের জন্য সকরুণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইবার নিমিত্ত এত বড় একটা অঙ্কের অভিনয় হইয়া গেল। যাক্, সে কাঁদিয়াও শান্তি পাইল। সব দুঃখ ভুলিয়া গেল।

টাকাটা হাতের মধ্যে লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিরাট বলিল, আমায় ক্ষ্যামা কর মেয়ে, আমারই ভুল হঁইছে।—আচ্ছা, এসো।

সতর

মেয়েটির কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে; অত্যন্ত দুঃখী মেয়ে; লোকটার venereal disease থেকে কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল। এর জীবনটাকেও খেয়েচে। আঃ, কী সুন্দর চেহারাটি ছিল এর।

কুষ্ঠ রোগের নাম শুনিয়া পুষ্করের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, কত দিন হয়েছে?

—খুব বেশী দিন নয়, এই মাস তিনেক হল ধরা পড়েচে, খুব একটা কিছু নয়; কিছুদিন treatment করলেই সেরে যাবে।

পুষ্কর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কলির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, leprosy কী করে বোঝা গেল?

—ঐ যে গালের ওপর একটা ছোট্ট patch দেখা দিয়েচে, তার ওপর এর পেছনে একটা history'ও রয়েছে। তা ছাড়া, এদেশে এ রোগটার incidence-ও কম নয়।

—তা' আপনি এ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে জানলেন কী করে?

—ওর চেহারাটা দেখে একটু সন্দেহ হ'ল, তারপর ওকে সঙ্গে করে দুবরাজপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকেই ওষুধের ব্যবস্থা হ'ল।

—পুষ্কর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল!—সত্যি, আপনি এদের এতো ভালবাসেন?

—ছোটবেলা থেকেই আমি সমাজসেবার কাজ ভালবাসি। এতে আমি খুব আনন্দও পাই। তা' ছাড়া, গান্ধীজীর আদর্শটাকেই গ্রহণ করে নিয়েছি। আমি স্বামীজীর ঐ একটা কথা হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি, "ভালবাসা অসম্ভবকে সম্ভব করে। প্রেমিকের কাছে পৃথিবীর সকল রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। গান্ধীজীর সর্ব্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার আঠারো দফা কর্ম্মসূচীর কয়েকটিকে আমি গ্রহণ করবার চেষ্টা করচি, এই আমার জীবনের সংকল্প। সমাজসেবাই আমার জীবনের ব্রত। জানি না আপনার এসব কথা শুনে ভাল লাগছে কিনা!

পুষ্কর শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিল, খুব ভাল লাগছে। খুব ভাল কাজ নিয়েছেন।

—নিইনি এখনো সে ভাবে, তবে জীবনের আদর্শ আমার এই।

—আপনার মনের জোর অসীম। মানুষকে আপনি এতো ভালবাসেন?

—বাইবেল পড়েছেন নিশ্চয়ই! "Thou shalt love thy neighbour as thyself."

পুষ্কর বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, আপনার প্রেমধর্ম্ম এত উঁচু! কল্পনাও করতে পারি না। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠছে। সত্যি আমি ভাবছি আজ যদি স্বামীজী ও গান্ধীজী বেঁচে থাকতেন, তা'হলে আপনাকে দেখে তাঁরা যে কত আনন্দিত হতেন।—না! আমিও চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে এ কাজে যোগ দ'বো।

কলি একটু হাসিল, বলিল, যে কাজের মধ্যে আনন্দ না পাওয়া যায় সে কাজ কখনই ভাল লাগে না পুষ্করবাবু। আবার এই যে আনন্দ পাওয়া এটার গোড়ার কথা হ'ল মানুষকে ভালবাসা। গান্ধীজী ও স্বামীজীর প্রেম-

ধর্ম্মের আদর্শ সামনে রেখে সমাজ সেবার কাজে এগিয়ে যেতে হবে,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আচণ্ডাল সব এক করে দিতে হবে।—যাক্', অনেক কথা বলে ফেললাম, চলুন এবার বাড়ী ফেরা যাক্। চলুন ঐ আমতেঁতুলের বাগানটার ভেতোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাই। ক্রমশই রোদের তাপ বাড়ছে, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।

—না, না, আমার এতটুকুও কষ্ট হচ্চে না; চলুন না নদীর ধারে যাই, ও দিকটায় তো যাওয়া হ'ল না।

সজল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, না, আবার কষ্ট হচ্ছে না,—ঐ তো বেশ ঘেমে গেছেন? আ-হা-হা লজ্জা হচ্ছে বুঝি বলতে! না রে দিদি, তুই আর এগোস্ নি রে, চলুন—ঘুরুন ঘুরুন।—ছোলা খাবেন, ছোলা?

—ছোলা? তা এখানে ছোলা কোথায়?

সজল অদূরস্থিত গাঢ় সবুজের মায়ায় আচ্ছন্ন একটা ছোলা খেত ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দেখাইয়া বলিল, আঃ আপনি কিছুই চেনেন না দেখচি, বাবা, অতবড় ছোলাখেত সামনে, তবুও চোখে পড়চে না··· হি হি হি ছ্যাখ্, ছ্যাখ্ রে দিদি ছ্যাখ্, পুষ্করবাবু ছোলাগাছ চেনেন না। বলিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া গিয়া একটা ছোলা খেতের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া কচি-কচি দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গাছ সমূলে উৎপাটন করিবার উদ্দেশ্যে লাগিয়া পড়িল।

সম্মুখেই একটা ছোট আমতেঁতুলের বন। বনটার এক প্রান্ত দিয়া কতকগুলি অর্জ্জুনগাছ সোজা হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, সেই গাছগুলির নীচ দিয়া তাহারা উভয়ে চলিতে লাগিল। উপরে অনন্তবিস্তৃত নীল আকাশ, নীচে ঘন সবুজের স্বপ্নভরা চাহনি, পায়ের তলে জীর্ণ মাটির উদাস দৃষ্টি, শুকনো পাতার নিঃশেষিত জীবনের ফেলিয়া-আসা রিক্ত কাহিনী। চলিতে চলিতে ক্রমশঃই তাহারা আমতেঁতুলের বনের ভিতরে আসিয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র বনানী, অপূর্ব্ব মায়া তার। কেমন আলোছায়ার ঝিলিমিলি, পত্র পুঞ্জের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনি, চুত মুকুলের স্নিগ্ধ মধুর সৌরভ, নিরস পল্লবের করুণ মৃদু গন্ধ, শেওলা ধরা কালচে পড়া বোবা মাটির অনাদিকালের অব্যক্ত ইতিহাসের অস্ফুট আনন্দ; ইহাদের অপূর্ব্ব মায়া কলির মনটাকে কেমন যেন একটু চঞ্চল

করিয়া তুলিল। উদাস কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলুন তো রবীন্দ্রনাথের কোন্ গীতি কবিতাটা মনে পড়ে, এ সময় ?

—আপনিই বলুন। আমার ত' মনে পড়ছে না কিছু।

—দেখুন না ভেবে, নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

—না আপনিই বলুন শুনি, আমার ঠিক মনে আসছে না।

—বেশ তবে আমিই বলি শুনুন।

দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাইনে কথা বলে
সে দিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে॥

—তাহলে আমিও একটা গদ্য কবিতা শোনাই। বলিয়া পুষ্কর শুনাইয়া গেল,—

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতালনারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এপারের সঙ্গে ওপারের কথা চলে সহজে।

…আর মনে পড়ছে না।

আর দরকার নেই। যাক্, দাঁড়ান তো গিয়ে একটিবার ঐ ছোট আমগাছটার নীচে, রোদাল জায়গাটাতে।

—কেন, কী হবে ?

—আপনার একটা ছবি তুলবো।

—পুষ্কর হাসিয়া বলিল, ছবি তুলবেন? কিন্তু চুলটা উস্কোখুস্কো যে।

—তা হোক, যান একটু এগিয়ে যান। ভাল দেখাচ্ছে।

পুষ্কর একটু পাশ ফিরিয়া তারপর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া গাছটার কাছাকাছি যেমন দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে যাইবে অমনি গুঁড়িটার অনতি-দূরে বর্ষার জলে ধুইয়া ধুইয়া যে একটা ছোট খাত পড়িয়া গেছে, উহার মধ্যে হঠাৎ ডান পা'টা পিছলাইয়া যাওয়াতে সে পড়িয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়ের গোড়ালিটা এমনভাবে মচকিয়া গেল যে, তাহার আর উত্থান শক্তি রহিল না—শুইয়া পড়িয়া অসহনীয় যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া করিয়া গোঙাইতে লাগিল।

দেখিয়া, কলির বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠল। দিশাহারা হইয়া সে ছুটিয়া গিয়া, তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু জোরে কুলাইল না। শেষ পর্যন্ত, তাহাকে সে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া লইয়া দেহের সর্ব্বশক্তি দিয়া চেষ্টা করিতে লাগিল—তবুও হিমশিম খাইয়া গেল।

এদিকে সজলেরও দেখা নাই। কলি উচ্চৈঃস্বরে সজল! সজল!! বলিয়া ডাকিয়া যাইতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া সজল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ঝপ্ করিয়া খাতের মধ্যে নামিয়া পড়িল। কলি আবার তাহার দেহটা বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া সজলের সাহায্যে তাহাকে কোনো রকমে টানিয়া উঠাইল, তারপর বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা দুই করতলের উপর ভর করিয়া লইয়া আপন উৎসঙ্গের উপর রাখিয়া কপালের উপর দিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। আঁচলের খুঁট দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে উহারই প্রান্তভাগ হইতে কতকটা অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া সেই টুকরাটা সজলের হাতে দিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ওয়াটার বটল্ থেকে চট্ করে একটু জল নিয়ে, শীগগির ভিজিয়ে দে, এটাকে! পায়ের গোড়ালিটা মচকে গেছে, জলপটি দিতে হবে।

সজল ঢক করিয়া বটল হইতে একটু জল ঢালিয়া লইয়া কাপড়ের টুকরাটা তাহাতে ভিজাইয়া অতি সন্তর্পণে আহত স্থানটি ছুঁইয়া যেমনি লাগাইয়া দিতে গেল অমনি পুষ্কর যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া উঠিয়া, কাতরস্বরে চীৎকার করিতে

করিতে কলির ডান হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রবল শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

কলি তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, একটু জলপটি দিয়ে দি', এক্ষুণি আরাম পাবেন।

—কিন্তু ভীষণ টন্ টন্ করছে যে—না, না, ছুঁয়ো না! ছুঁয়োনা সজল, লাগে! বলিতে বলিতে কলির হাতটা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ইতিমধ্যে জায়গাটা একটু ফুলিয়াও উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতযুক্ত পা'টাও নাড়িবার ক্ষমতা হইতেছে না, এমন কী সমস্ত দেহটাও ব্যথায় এমনি আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সামান্য একটু পাশ ফিরিতে গেলেও যেন সর্ব্বশরীর ব্যথায় বিষ হইয়া উঠে। তাই দেহটাকে জড়বৎ রাখিয়া সে একই ভঙ্গীতে শুইয়া রহিল।

কলি সাহায্যের জন্য মুখটা তুলিয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল —যদি কোনো পরিচিত মুখ দেখিতে পায়। দেখিতেও পাইল। দেখিল মণিশঙ্কর অদূরে একটা মরা আখের খেতের পাশ দিয়া যে উঁচু রাঙামাটির পায়ে-চলা পথটা চলিয়া গিয়াছে তাহারই উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে—বোধ হয়, ওদিক হইয়াই সে বাগ্দীপাড়ার দিকে যাইতেছিল।

সজল ছুটিয়া গিয়া অত্যন্ত অনুনয় করিয়া তাহাকে বলিল, দিদি একবার ডাকচে আপনাকে, একটু আসবেন?

মণিশঙ্কর দূর হইতে যে দৃশ্য দেখিয়াছে তারপরে, সজলের সে অনুনয় রাখিবার মতো সে মেজাজ আর তাহার নাই। রুক্ষস্বরে তাহাকে এক রকম ধমক দিয়াই সে বলিয়া উঠিল, কী করতে ডাকছে শুনি? আবার আমায় কেন? না, না, যাব না, যাব না, চলে যা, চলে যা। কী হয়েছে কী?

—পুষ্করবাবু প'ড়ে গিয়ে পায়ে লেগেছে।

তা আমি কী করব তার? বেশ হয়েছে পড়ে গেছে। পুষ্করটা আবার কে? কে সেটা? বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, যেমন প্রেম করতে যাওয়া। বলিয়াই সে যে পথ ধরিয়া চলিয়া যাইতেছিল ঠিক সেই পথ দিয়া না গিয়া একটা ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। এবং সে যে কাজে বাহির হইয়াছিল তাহা পণ্ড করিয়া সোজা ভুবনবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল,—অর্থাৎ ঘটনাটা ও দৃশ্যটা বেশ ফেনাইয়া সাজাইয়া সদ্য সদ্য গিয়া না বলিতে পারিলে যেন ঠিক বলার মতো

করিয়া বলা হয় না। এই ভাবিয়া সে আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল,—আরে রাম্! রাম্! ছি ছি ছি, দিন দুপুরে জঙ্গলে ঢুকে যা' তা! এদিকে আবার বন্ধুটারও মাথা খাচ্ছিস্—ছ্যাঃ! উঃ, বাউরি ছুঁড়ীগুলোর কাণ্ড দেখো.........দাঁড়াও ছুঁড়ি দেখাচ্ছি মজাটা......তা হলে আমরাই বা এমন কী দোষ করলুম—চেহারাটাই বা এমন কী খারাপ! না না না,— ও সব বাইরের ছোঁড়া টোড়া চলবে তা...কিন্তু কোত্থেকে জুটলো? চেহারাটা মন্দ নয় তো?

এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে সে যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডটার পরিণতি যে কোথায় গিয়া ঠেকে সেটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে তাহার কৌতূহলও জাগিল। তাই ভুবনবাবুর বাড়ী যাওয়াটা তখনকার মতো স্থগিত রাখিয়া সে আড়ালে আড়ালে থাকিয়া এদিক ওদিক উকি মারিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সজল ঘুরিয়া আসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, এলো না রে দিদি, এলো না, উল্টে আমাকে গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলে।

শুনিয়া কলি মনে বড় ব্যথা পাইল।

সজলের প্রত্যুৎপন্নমতি অত্যন্ত প্রখর; সে চট করিয়া বলিয়া উঠিল, কেরামতদা'কে ডেকে নিয়ে এলে তো হয় দিদি, ডেকে নিয়ে আসি না? কী বল্, যাব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেরামতদা'কেই ডেকে নিয়ে আয়!

আচ্ছা, বলিয়া সজল একেবারে প্রাণপণে ছুটিয়া গেল।

এদিকে যন্ত্রণাটা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে লাগিল, গলাটাও শুকাইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেহটা স্বেদাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্কর আর নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। নিতান্ত অসহায় বোধ করিয়া আবার সে কলির ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিল, একটু জল দাও ত!

কলি তাহার মুখে কয়েক ঢোক জল ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন বোধ হচ্ছে এখন?

—মাঝে মাঝে ভীষণ টন্ টন্ করে উঠছে—উঃ, একেবারে অসহ্য! কিন্তু তোমার উরু দুটো যে একেবারে ভেরে গেল, ঝিঁ ঝিঁ ধরে যাবে, একটু ছাড়িয়ে না নিলে পা ফেলতে পারবে না যে।

—পারবো, খুব পারবো, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। তুমি কিছু ভেবো না।—ঐ যে কেরামতদা এসে পড়েছে। ওঃ, অনেকটা ভরসা পেলুম।

কেরামত আসিয়া উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে কলির মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহা, কী হল? কেমন করে পড়ে গেল রে খুকী? তা তুই আগে খবর দিসনি কেন আমায়? বলিয়া ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া পুষ্করের ঘর্ম্মাক্ত কপালের উপর ডান হাতটা রাখিয়া বলিল, আপনার কিছু চিন্তার নেই আপনি আমার ঘরে চল বাবা, আপনাকে নিয়ে যাই।

পুষ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এখানে রিক্সা পাওয়া যাবে না?

কেরামত হাসিয়া ফেলিল, বলিল, না বাবা, এখানে রিক্সা পাবে কোথায় মানিক। তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে পারবেন, হাঁ বাবা? শোন্ খুকী, তুই এক কাজ কর—তুই ওর ডান দিকটা ধর, আর আমি বাঁ দিকটা ধরি—আর তাতে যদি চলতে ওনার কষ্ট হয় তো আমার গোরুর গাড়ীটা আনতে বলে পাঠাই খোকাকে দিয়ে। কী বল বাবা?

অবস্থায় পড়িয়া পুষ্কর দেহে যেন একটু বল পাইল, বলিল, না না, আমি হেঁটেই যেতে পারবো, কোনো কষ্ট হবে না।

কেরামতদা বলিল, পায়ের আঙুলগুলো নাড়তে পার কিনা দেখ তো মানিক! না, তেমন বেশী ফোলে-টোলে নি—যাক্ ভাল লক্ষণ।

পুষ্কর অতি সন্তর্পণে আহত পা'টার আঙ্গুলগুলি মৃদুভাবে নাড়াইয়া নাড়াইয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, মনে হচ্ছে ভাঙ্গেনি, মচকে গেছে।

—তা হলে এসো, এবার আমার গলাটা ভাল করে জড়িয়ে ধর মানিক, ধর, ধর, কিছু লজ্জার নেই।—ও খুকী, তুই ওর ডান পাশে যা!—আমার কাছে লজ্জা করার কিছু নেই মানিক—খুকী আমায় মেয়ের মতো।—আয় বেটী, আয়, ধর্ ওনাকে!

কলি এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ না করিয়া পুষ্করের ডান হাতখানা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া নিজের ডান কাঁধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, শক্ত করে ধর আমাকে, ভাল করেই ধর। ওঃ, আঁচলটায় একটু চাপ লাগছে বুঝি, না? আচ্ছা দাঁড়াও, আঁচলটাকে কোমরে জড়িয়ে নি, বলিয়া আচলটা পাকাইয়া লইয়া কোমরের সঙ্গে জড়াইয়া লইল।

কেরামতদ'ার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি তবুও তাহার দেহে প্রচুর শক্তি। পথ চলিতে চলিতে সে তাহার নিজের বিস্ময়কর দৈহিক শক্তির সামান্য একটু আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিতে লাগিল, আগের দিন হলে—হ্যাঁ, এই বেশী দিন নয়—বছর পাঁচেক আগের কথাই ধর না কেন, এরকম একটা মানুষকে কোলে ফেলে তা প্রায় দু'পোয়া পথ নিয়ে গেছি। এই তো খুকী দেখেছে—কী রে খুকি তাই না ? বল্ না, পারতুম না ?

কলি শুধু হাসিয়াই সে সব কথার জবাব দিল।

যাক্, আল্লার দয়ায় চোটটা তেমন লাগে নাই ; লাগলে কী যে হ'ত।—আরাম করে ধর বাবা আমায়, কিছু লজ্জা নেই। এই যে, এই এসে গেছি।

রাবেয়া ! রাবেয়া ! চট করে নোতুন চাদরটা পেতে দে তো মা।

রাবেয়া চক্ষের পলকে চাদরখানা পাতিয়া দিয়া দাওয়ার এক পাশে গিয়া এই আতুর আগন্তুকের চেহারাটা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল,—একটু সলজ্জভাবও।

কেরমতদা' কন্যার সলজ্জ মুখপানে তাকাইয়া হাস্যমুখে বলিল, তোর কিছু লজ্জা করার নেই মা। থাক্, মাথার বালিস আর আনতে হবে না। বলিয়া পুষ্করের দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, আমাদের এ চাষার ঘর বাবা, বালিশ-টালিস্ বড় নোংরা, তাই আপনাকে দিলাম না। তাই মেয়ে লজ্জায় চুপ করে আছে।

পুষ্কর বলিল, না না, কোনো দরকার নেই, দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ব'সবো।

—কষ্ট হবে না তো ?

—না না, কিছু না।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হক বাবা। -ওরে রাবেয়া যা তো মা, শোন্ চট করে গিয়ে একটু চুন-হলুদ গরম কয়ে নিয়ে আয়।

রাবেয়া ছুটিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বাঃ, বেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মেয়েটি তো। ষোড়শী। ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু অপূর্ব্ব মুখের শ্রীটি—যেমন স্নিগ্ধ, শান্ত, তেমন লাবণ্যময়। দেহের পরিপূর্ণ যৌবন যেমন ধীর স্থির, তেমন আত্মস্থিত। পরণে গৈরিক রঙের শাড়ী—কালো পাড়। কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়ে

তারপরে স্কুল ছাড়িয়া গৃহে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমানে দশম মানে পড়ে।

বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে চরখায় সুত কাটিবার অভ্যাসটিও আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে প্রতিদনই একটু আধটু করিয়া সুত কাটিয়া থাকে। তাহার এই নূতন কর্ম্মের প্রতি উৎসাহ যোগাইয়াছে কলি।

কলি পুষ্করের সহিত কেরামতদা'কে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, ইনি যে কী ধরণের মানুষ তার পরিচয় সামান্য এই একটা ঘটনা থেকেই পেলে। কিন্তু এনার চরিত্রের, এনার স্বভাবের সবচেয়ে বড় কথা হল, ইনি মানুষকে ভালবাসেন। নিজে না খেয়েও দান করে যান, নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অন্যের জীবন রক্ষা করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না, এই কেরামতদা'। এদিকেও একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবী, গান্ধী আদর্শে বিশ্বাসী। মেয়েকে গ্রামসেবিকা করবার ইচ্ছে এনার।

পুষ্কর শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। কেরামতদা'র এই উদার মনোবৃত্তি ও গান্ধীবাদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধার প্রশস্তি করিয়া বলিল, সত্যি এঁরা কত সরল লোক, এঁদের মনের সঙ্গে আমাদের সহুরে লোকদের মনের কোনো তুলনাই হয় না। আমাদের মনটা শুধু দুষ্টুমি বুদ্ধিতেই ভরা; আমরা লোককে যাচাই করেই আনন্দ পাই।

কেরামতদা' মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, না মানিক, তাই কী হয়? আপনারা হলেন গুনী, জ্ঞানী লোক। তোমরা আমাদের চাইতে অনেক কিছু বোঝেন, জানেন বাবা। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

—তবুও আপনারা সরল।

—তা যা বলুন বাবা। খোদা যা দিয়েছেন তাই নিয়েই খুশি আছি কখনো কারু টাকা পয়সায় লোভ করি না, কারু ক্ষতি করি না। সুখের দিনে সুখ ভোগ করতে হবে, কপালে দুঃখ থাকলে কেউ ঠেকাতে পারবে না,—এই ত সংসারের নিয়ম। বলিতে বলিতে কেরামতদা' ভিতরে ভিতরে একটা প্রবল উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া কলিকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, বাবা, এই যে মেয়ে এমন মেয়েটি আমার এই এতখানি জীবনের মধ্যে দেখি নাই। শরীরে এক ফোঁটা রাগ নাই, অভিমান নাই, হিংসা নাই, লোভ নাই—।

কতদিন পরে গাঁয়ে এসেছে অথচ এই কিছুদিনের মধ্যে কত লোকের মন কেড়ে নিয়েছে।

—আঃ, কেরামতদা! থামো, থামো।

—থামব কেন। বুঝলেন বাবা এ মেয়ে কী মশলায় গড়া জানি না,—রোগকে ভয় নাই, কুষ্ঠ রুগী, যক্ষ্মা রুগী তাদের কাছে টেনে নিয়ে ভরসা দেয়। বড় ভাল মেয়ে বাবা। বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কেরামতদার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মনের দৃঢ়তা কী অসীম! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া হাঁক দিয়া উঠিল, কৈ কোথা গেলি রে বেটী! আয়, আয় মা। লজ্জা নাই। পালালি কেন, কথা শুনে?

কলি ঘরের মধ্যে গিয়া রাবেয়ার সহিত কথা কহিতেছিল, আসিয়া বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আমি এ জানতুম কেরামতদা' তাই সরে গেছলাম। বলিয়া পুষ্করের দিকে তাকাইয়া বলিল, জাহানারা বলে এনার একটি মেয়ে ছিল, বড় ভাল ছিল, বছর ষোল বয়সের সময় মারা গেছে—বেচে থাকলে ঠিক আমারই মতো তার বয়স হ'ত। তাই আমাকে দেখলেই আর থাকতে পারে না, কেঁদে ফেলে কেরামতদা'।

বৃদ্ধের অদ্ভুত ক্ষমতা,—যেমন ছিল ঠিক আবার যেন তেমনটি হইয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া লইয়া সহৃদয় কণ্ঠে পুষ্করকে জিজ্ঞাসা করিল, তা বেদনাটা এখন কেমন বোধ করচেন বাবা? একটু কম পড়েচে কী?—কৈ চুন হলুদটো একটু লাগিয়ে দে খুকী!

কলি অতি সন্তর্পণে পুষ্করের পা'টা তুলিয়া লইয়া নিজের ভাজ করা স্কার্ফটা পাতিয়া উহারই উপর আলগোছে শোয়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রলেপটা লাগাইয়া দিল।

ইতিমধ্যে কেরামতদার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাইতো, দুবরাজপুরের কাছে যে নূতন সরকারী হাসপাতাল হইয়াছে সেখান হইতে পা মচকান'র একটা ঔষধ চাইয়া আনিলেই ত হয়। বলিয়া উঠিল, ও হো, এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, সরকারী হাসপাতাল থেকে একটু ঔষধ আনালেই ত হয়। দেখি, নিজেই যাই একবার। কটা বাজল এখন দেখ্‌ত কলি?

কলি নিজের কব্জিঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলিল, তা প্রায় দশটা হবে।

—তা হলে যাই একটু ঔষধ নিয়ে আসি। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তারের

উপর হইতে আধ- ভেজা গামছাটা টানিয়া লইয়া মাথায় পাক দিয়া লইবার উপক্রম করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

—কোথায় যাচ্ছ বল ত কেরমতদা’ ? তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে ?

—না থাক না, যাই নিয়ে আসি একটু ঔষধ।

—না, কোনো দরকার নেই। সে অনেক দূর, রোদ উঠেছে বেশ, যেতে হবে না তোমায়।

—তা হোক, ভিজে গামছাটা মাথায় দিয়ে চলে যাব।

সজল কাছেই বসিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল, আমি যাব কেরামতদা’, তুমি থাকো।

—তুই ছেলে মানুষ পারবি কী ?

—খুব পারব।

—আচ্ছা তাহলে হেতমপুরের ভেতোর দিয়ে যাস, তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু বড় রোদ। তা আমার গামছাটা মাথায় দিয়ে যা বাবা, মানিক।

—হাঁ, গামছা নেবে না আরও কিছু। কিচ্ছু দরকার নেই, দরকার নেই, আমি বোঁ বোঁ করে হেঁটে বেরিয়ে যাব, ফেরবার সময় সাইকেল রিক্সায় ফিরব।

বৃদ্ধ যেন একটু তাড়া দিয়াই বলিয়া উঠিল, থাম্ থাম্ আর ডেঁপোমি করতে হবে না, গামছাটা নে। একটু হেঁটে গেলে বুঝবি মাথার তেলো ফাটবে। আর বাহাদুরি নিতে হবে না, গামছাটা খুলে মাথায় দে বাপ্। কথা শোন্!

সজল বৃদ্ধের এই উপবোধ আর উপেক্ষা করিতে পারিল না, আধ-ভেজা গামছাটা মাথায় দিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গেছে এমন সময় কেরমতদা’ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিল, আরে শোন্! শোন্! একটা কথা শুনে যা বাপ! এক কাজ করবি, হেড কম্পাউণ্ডারের কাছে ঔষধটা চাইবি, বুঝলি, ওর নাম হল জগুবাবু। আমার নাম করবি তার কাছে তাহলে খুব খাতির করবে তোকে।

—কিন্তু চিনি না ত তাঁকে।

—এই আমার মতো লম্বা দাড়ি আছে, গোরাপানা—চোখে মোটা কাচের চশমা, রুপোর—খুব পান খায়।

আচ্ছা বুঝেছি, চল্লুম তাহলে।

—আর একটু শুনে যা মানিক। শোন্, ছাথ., খবরদার ঐ ছোকরা কম্পাণ্ডারের কাছে কখনো ওষুধ চাইবি না। ওর নাম কাসেম আলি, ভারী পাজি ওটা, বেটা কাউকেই ভাল ঔষধ দিতে চায় না, যেন ওর বাপের সম্পত্তি—বেইমান কোথাকার!—আচ্ছা আয়। বলিয়া পুষ্করের মুখপানে নম্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, মেয়ে একটু চা করেচে, বলচে খেতে। আপত্তি নেই ত বাবা? বলতে সাহস হয় না।

—আপত্তি আবার কী, হ্যাঁ নিয়ে আসুন। কিন্তু কী দরকার ছিল।

—হুঁ, তাই কী হয় বাবা, তা হয় না। বলিয়া কেরমতদা' আবার সুরু করিল, বুঝলি খুকী, একটা কথা মনে পড়ে গেল, বলি তোকে—এই যে কাসেম আলির কথা বলচি না, বড় শয়তান ওটা—যখনই কোনো ওষধ চাইতে যাব তখনই ও আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে।

কলি বলিল, কেন কারণটা কী?

—শুনলে রাগ হবে তোর, বলিয়াই বৃদ্ধ হঠাৎ ফোস্ করিয়া উঠিল, শয়তানটার আস্পদ্দা বড় কম নয়, বলে কিনা রাবেয়ার সঙ্গে আমার শাদি দাও। কেন আমি শাদি দিতে যাব রে, চোর বদমাস কোথাকার! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, মেয়েটাকে চুরির পয়সা খাওয়াব! কেন, কোন দুঃখে? অবশ্য চোর ঐ জগুটাও কম নয়, সেটাও পাকা চোর, তবে সেটা লোকটা ভাল। ডাক্তারটাও কম নয় বুঝলি কলি, বুঝলে বাবা, সেও ফাঁক পেলে বলে—আণ্ডা আন্, মুরগী আন্, হাঁস খাওয়া তবে ত ভাল করে দেখবো। কেন বাবা, গরমেণ্টর কী তোকে পয়সা দেয় না? যত জুলুম কেবল গরীবদের ওপর, কৈ, বাবুদিগে বলুক দেখি একবার, হ্যাঁ, দেবে এক নম্বর ঠ্যাকৃকে।

পুষ্কর শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া উঠিল, বলিল, হায় রে! ডাক্তাররা এত নীচ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ একটা ঘৃণার হাসি হাসিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল, সব চোর রে বাবা, সব মানুষই চোর! দোষ দিবি খালি কংগ্রেসকে, তোরা নিজেরা চুরি করবি অথচ দোষ হবে কংগ্রেস সরকারের—বট্যে!

—কলি বলিল, এইই তো হয়েছে আজকাল।—যাক্, কিন্তু মেয়েও যে তোমার শাদি করবে না বলে গো। ও বলে, ও সমাজসেবার কাজ করবে,

ভূদান যজ্ঞে যোগ দেবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, সর্ব্বোদয়-এর প্রচার করে বেড়াবে।

—কেরামতদা' শুনিয়া হাসিয়া খুন,—ছেলেমানুষ অথচ এরই মধ্যে সে এত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। বলিল, সত্যি সত্যিই কী আর বলচে, তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছে রে বেটী, ঠাট্টা করচে।

—আমিও তাই বলি।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কেরামতদা' আবার বলিয়া উঠিল, তা যদি ও শাদি না করতে চায় ত না করুক। দেশের কাজ করবে এ'ত ভাল কথা খুকি। তুই ওকে তোর সঙ্গে নিয়ে নে আমার একটুকুও আপত্তি নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরুক, চরখা আর খাদি চালু করুক।

—কিন্তু ও বলে ও আরও পড়বে, ঘরে বসে বসে পড়বে, এম. এ পাশ দেবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবার কাজও করবে। বিনোবাজী আর গান্ধীজী ওর জীবনের আদর্শ।

কেরামতদা' হাসিয়া বলিল, তা খোদার ইচ্ছে। ও মেয়েকে তোর কাছেই দিয়েছি, তুই উকে গড়ে পিঠে মানুষ কর, আমার কিছু বলবার নাই খুকি।—আচ্ছা, একটু ব'সো বাবা, আসছি—রাবেয়া আবার ডাকে কেন দেখি।—হ্যাঁ বাবা ব্যথাটো এখন কেমন মনে হচ্ছে, একটু কমেছে কী ?

—অনেকটা।

—যাক্ ভাল। তাহলে আমি একটুক আসি। বলিয়া কেরমতদা' বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া কলিকে একটু পাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, একটু মুরগীর মাংস আর ঘিভাত খাওয়াবে বলচে মেয়ে। খাবে ত বাবু ?

—হ্যাঁ খাবে, কেন খাবেনা, খুব খাবে। ও···সবের বালাই নেই ওনার। এতে তোমার কিন্তু মিস্তু করবার কিছু নেই কেরামতদা'। কিন্তু শুধু শুধু আবার এসবের কী দরকার ছিল ?

—হুঁ, মেয়ে কী আর ছাড়ে, ও সব ব্যবস্থা করে ফেলেচে।

পুষ্কর শুনিয়া কলির মুখের দিকে তাকাইয়া বিনয় করিয়া বলিল, আবার কেন এ সবের হেঙাম করতে গেলেন উনি।

—না মানিক, তাই কী হয়, মেয়ে আমার ছাড়বে না। গরীবের বাড়ী, দুটি ভাত খেয়ে যান বাবা।

পুষ্কর শুধু একটু হাসিল।

কেরামতদা আবার গামছাটা মাথায় জড়াইয়া লইবার উপক্রম করিয়া বলিল, তাহলে বিপিনভাইকে একটু খবর দিয়ে আসি!

—কোনো দরকার নেই তোমার যাবার, কেরামতদা। আমি নিজেই যেয়ে বলে আসছি। বলিয়া কলি নিজেই বাহির হইয়া পড়িল।

আঠারো

গাঁয়ের কংগ্রেসভক্ত বৃদ্ধ পণ্ডিত হৃদয়নন্দন চক্রবর্ত্তী সেদিন সকালে তাঁহার দুই ছেলে, ভজহরি ও রামহরি, উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন, কৈ রে! কোথায় গেলি দু'টোতে, আয়! নে, দাওয়ার ওপর মাদুরটা পেতে নিয়ে বোস্—আয় বোস্—আমার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ বল্। বলিয়া তিনি হুঁকাটা হাতে লইয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়া সুরু করিলেন—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বময়্যয়ঃ·········

এই রেমো! ও কী, ভুল বলে যাচ্ছিস কেন!—ঠিক করে উচ্চারণ কর্!

রামহরি অন্যমনস্ক হইয়া অন্যদিকে তাকাইয়া ভুল উচ্চারণ করিয়া যাইতেছিল। ধমক খাইয়া বাপের দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া এইবার সে সুর করিয়া করিয়া শুদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নি···

হঠাৎ পণ্ডিতমশাই দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সদর দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই থামতো! থামতো! যা তো, দেখে আয় তো ভজা, সকাল বেলা কে আবার এসে বিরক্ত করে!

ভজহরি, সঙ্গে সঙ্গে রামহরিও, ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখিল, বিলয়

ও গোপাল একদল সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দরজার কাছাকাছি বড় নোনাগাছটার নিচে দাঁড়াইয়া আছে।

গোপাল ভজাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে ভজা, বাবা বাড়ী আছেন ?

—হ্যাঁ আছে।

—আচ্ছা, বাবাকে গিয়ে বল্, আমরা এসেছি।

ভজহরি এক দৌড় দিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা বল্‌লে, বাবা এখন দেখা করতে পারবে না।

—বল না গিয়ে, বিশেষ কথা আছে।

ভজহরি আবার ছুটিয়া ভিতরে গেল কিন্তু এইবার সে একাকী আসিল না স্বয়ং পণ্ডিতমহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দেখিবামাত্র পণ্ডিতমশায়ের সর্ব্বশরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কতকটা সংযত অথচ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ তোদের জ্বালায় দেখছি গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে, সকাল হতে না হতেই এসে বিরক্ত করতে সুরু করেছিস্। যা' যা' চলে যা', বিদায় হ' এখনি এখান থেকে। দোবো না, কোনো মামুকেই ভোট দ'বো না।

বিলয় একটুতেই রগচটা, সুতরাং ঐভাবে ভৎর্সিত হইয়া সে রাগে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সে রাগ দেখাইবার মতো সে সাহস তাহার নাই, কেননা এরূপ ক্ষেত্রে পার্টির স্বার্থের খাতিরে ধৈর্য্যাবলম্বন করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই ; সেই বুঝিয়া সে আর মেজাজ দেখাইল না, শুধু গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল, ভোট চাইতে আসিনি আমরা, এখনও সময় হয়নি তার।

—তবে কী করতে সকালবেলা বিরক্ত করতে এসেছিস, শুনি ?

বিলয় নম্রভাবে বলিল, পরে এসে বলবো, এখন আপনার শোনবার মত সে মেজাজ নেই।

—আরে বাবা, সার কথা তো হল ভোট ! এই তো ?

গোপাল বলিল, যাক্, আমরা পরেই আসবো, পরে কথা হবে।

—পরে টরে আবার কী ! কোনো একটা কিছু আক্কেল বুদ্ধি তোদের হয়নি। এই করে করে তোরা ছেলেগুলোর শুদ্ধ মাথা খাচ্ছিস। এই ছাখ্, দেখলি তো, দুটোতে মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তোদের কথাগুলো

গিলচে। আরে ঐ হতভাগা ছুটো! যা' যা' পড়গে যা', চলে যা' এখান থেকে! এই ভজা! এই রেমো! ছুটোতে এখানে দাঁড়িয়ে কী শুনচিস্?

ভজহরি চলিয়া গিয়া পাঠে মন দিল; রামহরি কিন্তু দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আড়াল হইতে সব কিছু শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পণ্ডিতমশাই আবার বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিক তোদের জ্বালায় আর পারবার জো নাই বিলয়। কোনো মামুকেই ভোট দ'বো না, এই বলে দিলুম।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে রামহরি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বাবা! বাবা! আজ আমরা পড়বো না, বাবা!

—তার মানে? যা, শীগগির্ চলে যা' এখান থেকে। শ্লোকটা মুখস্থ হয়েছে?

—না।

—মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়া, দাঁড়া হতভাগা ছেলে!

—আজ আমরা ইস্কুলে যাব না বাবা, তাই পড়চি না।

—কেন?

—এস্‌ট্রাইক আছে, মিছিলে বেরোতে হবে।

—ষ্ট্রাইক! কিসের জন্য ষ্ট্রাইক শুনি? খবরদার! বাড়ী থেকে এক পা নড়েছিস তো ভাত বন্ধ করে দ'বো।

রামহরি শাসন মানিবার ছেলেই নয়। অত্যন্ত একগুঁয়ে, তার উপর ডান্‌পিটে। সে গোঁ ধরিয়া বসিল, যাইবেই যাইবে।

পণ্ডিতমশাইও নিজের জিদ বজায় রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন' ফের যদি অসভ্যতা করেছিস তো খড়মপেটা করব—এই বলে দিলুম রেমো! কিসের ষ্ট্রাইক শুনি?

এমন সময় বিলয় গায়ে পড়িয়া বলিয়া উঠিল, মাষ্টারমশাইদের মাগগীভাতা আর মাইনে বাড়ানো নিয়ে।

এইবার পণ্ডিতমশাই চড়া গলায় বলিয়া উঠিলেন, তোদের স্পর্দ্ধা বড় কম নয় দেখছি বিলয়। স্কুলের ছেলেগুলোকে পর্যন্ত দলে টানবার চেষ্টা করচিস্ মাষ্টারমশাইদের খেপিয়ে ছেলেগুলোকেও সুদ্ধ খেপাতে সুরু করেছিস্। রামহরি বলিয়া উঠিল, বিলয়দা আমাদের খেপায় নি বাবা, শিবনন্দনবাবু মাষ্টার বলেছে, তোরা সকলে ধর্ম্মঘট করবি, তা'হলে পাশ করিয়ে দ'বো।

শুনিয়া পণ্ডিতমশাই রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, দ্যাখো দ্যাখো মাষ্টারগুলো কত বড় আহম্মক, দেখো। নির্বোধগুলো নিজেরাও মরছিস্, ছেলেগুলোরও মাথা খাচ্ছিস্।

গোপাল বলিল, মাষ্টারমশাইরা কখনো একথা বলে নাই, রেমো বাজে কথা বলছে।—এই রেমো, রেমো, তুই ত ভারি দুষ্টু দেখছি—মাষ্টারমশাইদের নামে লাগাচ্ছিস্ কেন রে?

রামহরি ফোঁস করিয়া উঠিল, না আমি লাগাচ্চি না গোপালদা, শিবনন্দন-বাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

গোপাল চুপ হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই বলিলেন, থাক্, বুঝেছি সব ব্যাপার। বলিয়া রামহরির মুখের পানে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন যা, শীগ্‌গির বই নিয়ে বসগে যা, তা না হ'লে ভাত বন্ধ করে দ'বো। এই বলে দিলুম!

রামহরি মুখটা গম্ভীর করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই পুনরায় সুরু করিলেন, দেশটাকে তোরা একেবারে উচ্ছন্নে দিলি, বুঝলি বিলয়। তোরা যা মনে করছিস একটা ভোটও পাবি নি, এই বলে দিলুম।

বিলয় দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই পাবো।

পণ্ডিতমশাই একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ওই আনন্দেই থাক্! ভাবচিস্ বুঝি কংগ্রেসকে গালাগালি দিয়েই ভোট পেয়ে যাবি—অত সোজা নয়।

বিলয় বলিল, ভোট আমরা যথেষ্টই পাবো এবং পাবো যে তার প্রমাণও আপনি পাচ্ছেন। কংগ্রেসের ওপর কোন্ লোকটা খুশি আছে বলতে পারেন? কংগ্রেসকে কেউ ভোট দেবে না।

পণ্ডিতমশাই বলিলেন, কংগ্রেকে যারা ভোট দেবে না বল'ছে তারা কী তোদের ভোট দেবে বলছে?

গোপাল বলিল, হ্যাঁ, তারা বলচে।

—ঐ, মুখেই, কাজের বেলা দেখে নিস্। এই আমার কথাই ধর না কেন—রাগের মাথায় সেদিনে দলে পড়ে বলে ফেল্লুম, এবার কংগ্রেসকে কিছুতেই ভোট দ'বো না; অথচ এখন ভেবে দেখচি ধার করা বুদ্ধি নিয়ে

যারা চলে, যারা ইতিহাসের ধারাবাহিকত্ব ও সমাজের গতিশীলতা মানে না তাদের বুদ্ধির কোনো দাম নেই ; তারা কেবল অপরের কথাগুলো গেলে আর উদ্গীরণ করে ; সুতরাং আমার কংগ্রেস-ই ভাল।

রামহরি অত্যন্ত ডেঁপো ছেলে ; সে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাপের কথাগুলি কান পাতিয়া পাতিয়া শুনিয়া যাইতেছিল। কংগ্রেসের প্রতি বাপের আনুগত্যের কথা শুনিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; আবার সে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, কংগ্রেসকে ভোট দিও না বাবা, বঙ্কুদাকে দিও। মাষ্টাররা সব বঙ্কুদাকে ভোট দেবে ব'লেচে।

পুত্রের এইরূপ অশোভনীয় প্রগল্‌ভতায় পণ্ডিতমশাই অত্যন্ত বিরক্তি ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু পাছে ছেলে আরও বেশী রকম অভব্যতা প্রদর্শন করে এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে ঠিক সে ভাবে কড়া শাসনের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, বড় বেশী জ্যেঠা হয়ে গেছো! ফাজিল ছেলে কোথাকার! যা' চলে যা' এখান থেকে, যা! যা' বলছি।

দেখিতে দেখিতে সেখানে একদল স্কুলের ছেলে আসিয়া জুটিয়া গেল। তাহাদেরও মুখে সেই স্লোগান,—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ, মাষ্টারমশাইদের দাবী মানতে হবে, নইলে স্কুল বন্ধ হবে।

পণ্ডিতমশাই যেন তোপের মুখে পড়িলেন। সর্বনাশ! তিনি তাঁর গুণধর পুত্রকে আর কিছুই বলিবার সাহস করিলেন না। ছেলেও এদিকে সুযোগ পাইয়া দলের মধ্যে পড়িয়া হঠাৎ এমনই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, সে আর বাপকে বাপ বলিয়া মানিল না, যদৃচ্ছা অবাঞ্ছিত আচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যেন দলের দলপতি হইয়া উঠিল।

দলের মধ্যে বেচারাম বলিয়া ছেলেটি অত্যন্ত অশিষ্টাচারী এবং অর্বাচীন ও ডান্‌পিটে। সে ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, আজ সেক্রেটারী চোরাটাকে ঠাণ্ডা করবো—ঐ শালাই যত পাজি!

বিলয় পণ্ডিতমশাইকে দেখাইয়া দেখাইয়া বেচারামকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, আঃ, ও কী হচ্ছে কী বেচা? ও ভাবে কথা বলচিস্ কেন, ছিঃ।

থামো, থামো তুমি থামতো বিলয়দা', ভারি আমার সেক্রেটারী রে। মারের চটে ওসব চোরাদের ভূত ভাগিয়ে দ'বো। মাষ্টারমশাইদের মাইনে

বাড়াতেই হবে তা না হলে স্কুলে আগুন ধরিয়ে দ'বো। চালাকির জায়গা পেয়েছ শালা! নিজে চুরি করবি আবার মাষ্টারদের চোর বলবি।

বিলয় ও গোপাল উভয়ে নির্লজ্জের মতো এই সমস্ত অশ্রাব্য ভাষা শুনিয়া শুধু যে মনে মনে খুশি হইল তাহাই নহে, উপরন্তু, পরোক্ষে তাহাদের এইরূপ আচরণে উৎসাহ দান করিতে লাগিল।

এদিকে বেচারাম আস্কারা পাইয়া এমনই অশান্ত হইয়া উঠিল যে, তাহার মুখে আর কিছুই বাধিল না। বিলয়ের মুখের পানে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, বুঝলে বিলয়দা', এবার যে মামু বঙ্কুদাকে ভোট না দেবে ইঁটিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দ'বো, আগুন ধরিয়ে দ'বো সব মামুদের বাড়ী।

বেচারামের কথা শুনিয়া পণ্ডিতমশাই ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কী ছেলেকে কাছে ডাকিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বুঝাইয়া বলিবার সে সাহসও করিলেন না। সব কিছুই সহ্য করিয়া গেলেন।

বিলয় দেখিল বেচারাম বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন, এই ভাবিয়া সে বেচারামকে একটু ধমক দিয়া, কাছে ডাকিয়া বলিল, আঃ বেচা, ও কী বলচিস যা তা, যা এখান থেকে চলে যা—আমাদের কথা আছে। সেক্রেটারীবাবুর বাড়ীর সুমুখে গিয়ে দাঁড়া, আমরা আসচি।

বেচারাম উৎসাহ পাইয়া আনন্দে হৈ হৈ করিতে করিতে রামহরি ইত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া সেক্রেটারীবাবুর বাড়ির দিকে হাঁটিয়া চলিল।

বিলয় পণ্ডিতমশাইয়েয় দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, আমরা আপনার কাছে কখনই আসতুম না, শুধু আপনি আমাদের কথা দিয়েছিলেন বলেই তাই, ব'লেও ছিলেন বঙ্কুদ'ার হয়ে কিছু চেষ্টা করবেন।

হ্যাঁ, বলেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক উত্তেজনার বশে, কিন্তু এখন দেখছি খাল কেটে কুমীর এনেছি,—এতো গৃহবিবাদ লেগে গেছে দেখছি, আজ ছেলে দুটো বিগড়েছে, কাল মেয়ে বিগড়বে; পরশু স্ত্রী বিগড়বে, ব্যস্ তা হলেই পুরো উগ্রপন্থী হয়ে গেলুম। দেখলি তো, ছেলেটা কত বড় অসভ্য অবাধ্য হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী এই তোরাই বুঝলি বিলয়, বুঝলি গোপাল—আর এই শিক্ষকরা। ছিঃ, সত্যিকারের শিক্ষা তারা পায় নি তাই ছেলেদেরও শিক্ষা দিতে জানে না।

বিলয় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, এ আপনি অন্যায় বলছেন পণ্ডিতমশাই ; অবশ্য আপনার স্বাধীন মতামতের ওপর আমরা কেউ হাত দিতে চাই না।

—দিবি কোন সাহসে ? সে মুখ কী আছে ? কোন্ লোকটা সমাজে চোর নয় বলতে পারিস ? ছাই করবে তোর উগ্রপন্থী ! যা' যা' এসব ছেড়ে দিয়ে কাজ কর্, কাজ কর্।

বিলয়ের মেজাজ হঠাৎ গরম হইয়া উঠিল, বিকৃত মুখভঙ্গীতে পণ্ডিতমশায়ের শান্ত মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আপনার কাছ থেকে এসব সস্তার উপদেশ নিতে আসিনি আমরা। আপনার ইচ্ছে হয় আপনি কংগ্রেসের হয়ে খাটতে পারেন, কেউ আপনাকে বাধা দিতে আসবে না তবে এইটুকু জেনে রাখুন কংগ্রেসকে ভোট দিলে না খেতে পেয়ে মরবেন।

পণ্ডিতমশাই একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিলেন, দেখাই যাক্ না কী হয়। তোদের ভোট দিলে একেবারেই না খেতে পেয়ে ম'রবো।

—উত্তরে বিলয় কী যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সেখানে কলিকে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া বিলয় ও গোপাল আর সেখানে এক মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াইল না।

পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় চল্লে মা এখন ?

—বঙ্কুদার ওখানে।—কেমন আছেন আপনি, ভাল ?

পণ্ডিতমশাই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, না মা, ভাল আর কোথায় !

—কেন, কী হল ?

—রেমোটা একেবারে গোল্লায় গেছে ! কী যে করব তাই ভাবচি।

—কেন, পড়াশুনো করে না বুঝি ?

—এতটুকুও নয়। ঐ বিলয়টাই ওর মাথাটা খাচ্ছে।

—না ! আমি বঙ্কুদাকে ব'লব তার এসব খুবই অন্যায় !—এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, অথচ এদের জীবন নিয়ে খেলা করছেন এঁরা !

—সে কথা বোঝে কে মা। ঐ তো দেখলি বিলয় আর গোপালকে, ওদের সামনে রেমোটা ত বটেই—ঐ অসভ্য ছেলেগুলো পর্যন্ত যা তা ভাবে আমাকে অপমান ক'রল। ওদের দুজনের আস্কারাতেই তো ওরা অতটা বেয়াদবি করতে সাহস পেল।

—এদের কোনো দোষ নেই পণ্ডিতমশাই। দোষ শিক্ষকদের, দোষ

উগ্রপন্থীদের। শিক্ষকরা নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এদের কাজে লাগিয়েছেন। দুঃখ হয়, যাঁদের ওপর ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার ভার তাঁদের মধ্যে এমন নিষ্ঠুর দুরভিসন্ধি থাকতে পারে! আপনি রেমোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন একটিবার। আচ্ছা, আমি নিজে এসে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, লেখাপড়ায়ও খারাপ নয় সুতরাং ওকে মানুষ করে তুলতে হবে।

পণ্ডিতমশাই আনন্দে গদগদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তাহলে ত ভালই হয় মা। ভগবান ওকে একটু সুমতি দিন।—তা, এখন বঙ্কুর ওখানে কেন?

—ডেকে পাঠিয়েচে, ক'দিন পর এখানে ওদের যে সম্মেলনের অধিবেশন হচ্চে সেই সম্পর্কে।

শুনিয়া পণ্ডিতমশাই একটু বিচলিত হইলেন; ব্যাপারটা তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; মনের মধ্যে তাহার প্রবল একটা সন্দেহের উদ্রেক হইল। ভাবিতে লাগিলেন, তাইতো, হয়তো এই মেয়ে বঙ্কুর দলের গুপ্তচরও হইতে পারে? তাহা না হইলে উগ্রপন্থীদের সম্মেলনে যোগ দিবার তাহার এ ব্যগ্রতা ও উৎসাহ কেন? শুধু তাহাই নয়, মণিশঙ্কর ও কেরামত উহারা দু'জনেও তো ইহাকে সন্দেহ করে। এই ভাবিয়া তিনি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, তাহলে তুমি কী মা কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছ?

কলি হাসিয়া বলিল, আপনি ত জানেন পণ্ডিতমশাই আমি কোনো দলেই নেই, তবে হ্যাঁ, আমি কংগ্রেসকে ভালবাসি।

—তবে তুমি বঙ্কুর ওখানে যাচ্ছ কেন?

—আমার তো কোনো পক্ষেরই সঙ্গে ঝগড়া নেই। তা'ছাড়া যারা কংগ্রেসের সমর্থক নয় তাদেরই ত জয় করে নিতে হবে কংগ্রেসকে। যে শত্রু তাকে মিত্র করে নিতে হবে, কংগ্রেসের আদর্শ তাদের কাছে পৌছে দিতে হবে যুক্তি দেখিয়ে। তাই বঙ্কুদ'ার কাছে যাচ্চি। বঙ্কুদ'ার দ্বারা দেশের কিছু কাজ হতে পারে এটা আমার ধারণা—ওর মধ্যে জিনিস আছে। কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিতমশাই রাজনীতি বা সমাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, সুতরাং তিনি আর এ বিষয়ের তর্ক তুলিলেন না, কেবলমাত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, তা তুমি ত মা বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমাকে তর্কে পরাজিত করা

বঙ্কুর মতো ছেলের পক্ষেও শক্ত তা আমি বুঝি, তুমি বুদ্ধিমত্তর। তবুও—।

এমন সময় ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। কলিকে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর কলির সহাস্থ মুখপানে তাকাইয়া বলিল, কী দিদিভাই, এখানে?

বঙ্কুদার বাড়ী যাচ্ছি পথে দেখা হল পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে। তা আজ ভিক্ষেয় বেরোও নাই।

—ভিক্ষে লয়, বল, মা শক্তিরূপিনীর নাম করতে।

—হ্যাঁ ভুল হয়েচে। তা আজ আর মায়ের নামে বেরোয় নাই?

—নিশ্চয়ই, এই ত জীবনের সম্বল। যে যতই চেষ্টা করুক কেউ কিছু করতে লারবে। আজ একটো কথা বলি, যে পাপ দেশে ঢুকেছে এই পাপকে আর লাই দিও না। যাতে কংগ্রেস বেঁচে থাকে সেই চেষ্টাই কর দিদিভাই। দুদিকে থেকো না।

কলি দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, বুঝলে সন্ন্যাসীঠাকুর আমাদের মূল জায়গাটায় কেউ কোনো দিন হাত দিতে পারবে না। উগ্রপন্থীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পণ্ডিতমশাই মাথা নাড়িতে নাড়িতে হাসিয়া বলিলেন, ঠিক বলছো মা, ঠিক বলছো। আমরা সত্যের সন্ধানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে বেরিয়েছি এবং চিরকাল করেও যাবো তাই—শান্তি চাই, সুখ চাই না আমরা।—আচ্ছা তাহলে এসো মা।

ভৈরব বলিল, যতই যাই কর দিদিভাই কংগ্রেসের মর্য্যাদাট যেন রেখো। তা আজ আর গান শুনবে না?

—আচ্ছা শোনাও তাহলে।

—তাহলে আজ আমার নিজের বাঁধা একটো গান শুনোই, বলিয়া সে গান ধরিল :—

আমার মনের আঁধার মাগো
দে ধুয়ে ও আলোয়,
তোর ঐ রূপের বিমল জ্যোতি
দিক মুছে মা কালোয়!
... ...

—বাঃ, বাঃ, সুন্দর গান বেঁধেচিস তো ভৈরব।—আচ্ছা, তা হলে এসো মা।

উনিশ

যাক্, এই যে, এসেছিস্—এই একটু আগেই তোর কথা ভাবছিলুম বলিয়া বঙ্কু একটা মোড়া আগাইয়া দিয়া বলিল, ব'স্ এটাতে!

কলি মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কী খবর বল?

—ক'দিন দিন পরে অধিবেশনের তারিখ, মনে আছে বোধ হয়, যেন গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে থাকিস না।

—বাঃ, বেশ বল্লে যা হোক বঙ্কুদা'। সে কী হয়?

—কেন! সেদিন তো বলেছিলি, দরকার হলে তুই চাকরি ছাড়তে পারিস্।

—সে কথা তো আজও বলছি।

—তবে ভয় কিসের?

—কিছুরই নয়।

—তবে?

—তুমি আমাকে আজও বুঝলে না বঙ্কুদা', এটাই আমার দুঃখ। যখন সমাজসেবার কাজ নিয়েছি তখন কোনো কিছুরই ভয় রাখি না, অর্থেরও লোভ করি না। দরকার হ'লে চাকরি আমাক ছেড়ে দিতেই হবে।

বঙ্কু আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, তাই যদি বলিস্ তবে আসবি না কেন?

কলি ধীরকণ্ঠে বলিল, তোমাদের ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার মধ্যে আমার দিক দিয়ে তো বটেই এমন কী তোমাদেরও কোনো লাভ নাই।

—সেটা আমি তোর থেকে বেশী বুঝি।

—কিন্তু আমি তো তোমার হয়ে একটুও কাজ করতে পারব না।

—প্রয়োজন নেই।

—তবে কেন আমায় টানছ?

—কংগ্রেসের হয়ে তোকে কাজ করতে দ'বো না।

—কিন্তু আমি তো কংগ্রেসের হয়ে কোনো কাজই করছি না।

—প্রত্যক্ষ ভাবে না করলেও পরোক্ষে করছিস্, কেননা আমি শুনতে

পাচ্ছি যে, যে লোকই তোকে জিজ্ঞেস করছে তাকেই তুই কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বলছিস্।

কলি স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, না, তা মোটেও নয়। তাহলে একটা প্রশ্ন তোমায় করি—আচ্ছা বলতে পার বন্ধুদা'—লোকের মনে আজ কেন এ কথাটা জেগেছে—উগ্রবাদ না কংগ্রেস ?

—কংগ্রেস যে গণচেতনাকে বিভ্রান্ত করে তুলছে—তাই।

—এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তোমাদের মতবাদই তাদের বিভ্রান্ত করে তুলছে বেশী; তাই তারা দিশাহারা হয়ে আছে। কংগ্রেসকে তারা বহুদিন ধরেই জানে এবং এর সঙ্গে যেন এদের একটা নাড়ির যোগ হয়ে আছে; কিন্তু তোমাদের তারা এতটুকুও জানে না, তাই তোমাদের বৈমাত্রেয় প্রীতিতে তারা ভয় পায়, মনে তাদের সন্দেহও জাগে।

সহসা কলির এইরূপ প্রত্যক্ষ আক্রমণ বন্ধুকে যেন তীরের মতো গিয়া বিদ্ধ করিল; সে যেন ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া নীরবে, সঙ্কুচিত্তে মাথাটি নীচু করিয়া কুটিল ভ্রূভঙ্গিমায় ঘরের মেঝের উপর একটা বিকৃত দৃষ্টি ফেলিয়া কী যেন চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ কলিকে ঘিরিয়া মণিশঙ্কর প্রচারিত যে সত্য এবং শ্রুতিকটু কাহিনীটার সংবাদ পরোক্ষে তাহার কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল উহারই একটা কাল্পনিক কঠিন পীড়াদায়ক ছবি তাহার চক্ষের উপরে আসিয়া যেন স্বচ্ছর রেখা ভাসিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, পুরুষের জীবনে ইহার চেয়ে বড় পরাভব আর কিছুতে নাই; অথচ ইহার চেয়ে মধুময়, হ্লাদময় সফলতা বোধ হয় নারী পুরুষের এককনিহিত জীবনে আর কিছুই থাকিতে পারে না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বিহ্বল চক্ষের সম্মুখের সমস্ত পৃথিবী যেন কোথায় বিলীন হইয়া গেল; এবং সে যাহা কিছু দেখিতে লাগিল তাহার মধ্যে শুধু একটা নিষ্ঠুর নারীপ্রকৃতির নির্লজ্জ প্রতারণার নগ্ন মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। গভীর উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ একটা জোর ধাক্কা খাইয়া উঠিল, সে যেন কেমন হইয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্ধ উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অকস্মাৎ সে কলির ডান হাতটা নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কঠিন ভাবে নিষ্পেষণ করিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার ছাড়িয়া দিয়া, বলিয়া উঠিল, উঃ! এত কঠিন তুই আমি জানতুম না। কী নিষ্ঠুর! কী হৃদয়হীন তুই! বলিয়াই আবার তাহার

ঐ হাতখানা দুই মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ব্যর্থকাম হইয়া দূরে সরিয়া গিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল।

বঙ্কুর এই বিস্ময়কর চিত্তবিকৃতির স্থৈর্যহীন মাধুর্যকঠিন আচরণে কলি তিলমাত্র বিহ্বল বা হতবুদ্ধি হইল না; বরং মোড়া ছাড়িয়া শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার ঐ বিকারগ্রস্ত মুখপানে তাকাইয়া একটা স্নিগ্ধ অর্থহীন হাসি হাসিয়া বলিল, কী হল, বঙ্কুদা'? এতো অস্থির হয়ে পড়লে কেন?

বঙ্কু কম্পমান কণ্ঠস্বরে বলিল, জেনে শুনেও এ প্রশ্নটা করছিস্?

কলি প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, ও, এই কথাগুলো বলবার আর নিজেকে এ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করবার উদ্দেশ্যেই বুঝি আজ তাই ডেকে পাঠিয়েছিলে?

বঙ্কু অধোমুখে নীরব রহিল। তাহার আজ অনেক কিছুই বলিবার ছিল, শুনিবারও ছিল, কিন্তু তাহার ভিতরের বাস্তব মানুষটা তাহাকে এমনই এক দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া জঘন্য ভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিল যে, কলির ঐ সরল প্রশ্নটার একটা সহজ উত্তর দিয়া কিছু বলাও হইল না বা শোনাও হইল না।

কলি মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমার মধ্যে যে হঠাৎ আজ এতটা চপলতা আসতে পারে, এটা আমি একটা মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করতে পারি নি, বঙ্কুদা'। আজ বুঝতে পারলুম তোমার দুর্বলতা তোমাকে কী নিষ্ঠুর ভাবেই না প্রতারণা ক'রল। যাক্, ওঠো, অমন ক'রে ব'সে থেকো না। যে কাজের ভার নিয়েছ তাকে তোমার সুসম্পন্ন করে তুলতেই হবে, এবং সে ক্ষমতা তোমার মধ্যে আছেও। অথচ আমাকে বাদ দিয়েও তো তোমার সমস্ত কাজ তুমি করে যেতে পার।

কলি আজ এ কি কথা বলিতেছে?—তাহার এইরূপ হৃদয়হীন, দ্বিধাহীন, নির্লজ্জ নির্লিপ্ত মনোভাবের অতি সহজ অথচ অসহনীয় উলঙ্গ মূর্ত্তিটা দেখিয়া বঙ্কু পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কলির ডান হাতখানা আবার চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে অস্বীকার করে আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেআমার কাজ করার শক্তিকে উপেক্ষা করতে এতটুকুও কী কষ্ট হয় না তোর? আমায় কাজ করার শক্তি দে কলি, কাজ করার শক্তি দে! সেদিনও তুই বলেছিলি, বঙ্কুদা', আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াব; কিন্তু আজ আমি দেখছি তুই যেন আমার কাছ

থেকে বহুদূরে সরে গেছিস, বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া সে আবার পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল।

কলির দেহের উপর দিয়া, তাহার মনের উপর দিয়া, এবং তাহার চক্ষের উপর আজিকার এই স্নিগ্ধ রবিকরোজ্জ্বল অতিক্রান্ত প্রভাতে যাহা কিছু ঘটিয়া গেল তাহা তিলে তিলে সত্য হইলেও মিথ্যা এবং নিষ্ঠুর, এবং তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া কলির পক্ষে এক দিক দিয়া যেমন কঠিন, তেমন সহজ সরল ও অতি সত্য! তাই সে নির্বিকার চিত্তে ক্ষণকাল মৌন ও শান্ত রহিল, তারপর মোড়াটা বঙ্কুর কাছাকাছি টানিয়া লইয়া ধীর ভাবে বসিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বঙ্কুদা' শোনো, বলিয়াই সে থামিয়া গেল।—হঠাৎ মণিশঙ্করের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ঘরের দরজার ওপার হইতে মণিশঙ্কর বঙ্কুর নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ধীরে ধীরে একেবারে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সঙ্গে' সঙ্গে থতমত খাইয়া দরজার মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। বুকের ভিতরটা তাহার হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং চোখের চাহনিটাও যেন কেমন হইয়া গেল। কলিকে দেখিবামাত্র তাহার মুখখানা যেন এক অপোক্ত অপরাধীর ন্যায় ভয়ে, লজ্জায় ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল! সহজভঙ্গিতে কথা বলিবার শক্তিটাও হারাইয়া ফেলিল।

অবশ্য সে কোনো কথা পাড়িবার আগেই বঙ্কু তাহার এই আকস্মিক আগমনে চমকিয়া উঠিয়া অস্বাভাবিক দেহভঙ্গিতে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া পড়িয়া মণিশঙ্করের কাছে আগাইয়া গিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে তাহার মুখপানে তাকাইয়া সহাস্য মুখে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, আরে! কী খবর, মণিদা যে! এসো এসো। তা হঠাৎ কী মনে করে?

মণিশঙ্কর ধৃত তস্করের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া কলির হাস্যোদ্দীপ্ত প্রশান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে একটা এলোমেলো দৃষ্টি ফেলিয়া বঙ্কুর দিকে চাহিয়া শুধু একটা কথা বলিল, একটু দরকার আছে। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া যেন কোনো কাজে খুব একটা ব্যস্ত এবং তজ্জন্য বড়ই উতলা এইরূপ একটা ভাব দেখাইয়া বলিল, একটু সময় বাহিরে আয় একটা কথা আছে। বলিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

—তা, ভেতোরে এসো না ?

—না, এখুনি যাবো।

—একে তুমি চেনো না ? (কলিকে চোখ দিয়া দেখাইয়া)

—হ্যাঁ, খুব চিনি।

কলি বলিয়া উঠিল না, না, কেন বাইরে যাবার দরকারটা কী, আপনি ভেতোরে এসে ভাল হয়ে বসে কথা বলুন, মণিবাবু। আমি তো উঠছিই।— বঙ্কুদা তোমরা ব'সো আমি এখন আসি, পরে কথা হবে।

মণিশঙ্কর লজ্জিত হইয়া বলিল, আরে না, না, ছি, আপনি বসুন।

—আমার তো কাজ হয়ে গেছে সুতরাং আমি তো উঠছিই। আপনি বসুন মণিবাবু, বলিয়া সে মোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া দোরগোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কু দেখিল কলি এখন চলিয়া গেলেই ভাল হয়। তাই তাহাকে আর না আটকাইয়া বলিল, আচ্ছা আয় তাহলে। ঐ দিনের কথাটা মনে থাকে যেন ?

কলি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে একটা মিনিটের জন্য বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, শোনো, একটু বাইরে এসো বঙ্কুদা।

তাহাকে বসাইয়া বঙ্কু কলির সঙ্গে বাহিরে চলিয়া আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল।

কলি স্মিতমুখে বলিল, আজ রাতে একটি বার এসো আমাদের ওখানে ?

মরা নদীতে এ যেন বান ডাকিয়া গেল। বঙ্কু উল্লাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

—আজ তোমায় খাওয়াবো। সে দিন রাতে তো এলে না, ভয়ঙ্কর ব্যথা পেয়েছি। অথচ তুমি আমার হাতে খেতে ভালবাস। তা ছাড়া অনেক কথাও ছিল, শেষ তো আর হল না। শুধু তর্কই ক'রে গেলে।

কনফারেন্সএ আসবি কথা দে, তাহলে যাব।

কলি হাসিমুখে বলিল, কেন না এলে কী যেতে নেই ? বঙ্কু হাসিয়া বলিল না, সে কথা নয়,—এলে বুঝব আমার পার্টি বেঁচে থাকবে।

—আচ্ছা আসবো। কিন্তু তুমি যদি না আস তাহলে আমিও মনে বড় ব্যথা পাব।

শুনিয়া বঙ্কুর ভিতরের মানুষটা যেন অকস্মাৎ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল,

একটা প্রবল বাসনা তাহাকে এমন ভাবে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে, ক্ষণ কালের জন্য সে তাহার নিজের বৈক্তিক সত্তা ভুলিয়া গিয়া কলির ঐ স্নিগ্ধ শান্ত চিন্ময় দেহটির উপর একটা দৃষ্টি ফেলিয়া তাকাইয়া রহিল, এবং তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—আর একটি বার সে কলির ঐ অপচল সুকোমল হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলে, কলি, ইহাই ইহজীবনের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র দর্শন—ইহার আগেও কিছু নাই, পরেও কিছু নাই, ইহাই জন্ম-মৃত্যুর শেষ কথা—মানবজীবনের করুণ কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ। ভাবিতে ভাবিতে আচম্বিতে কম্পমান ডান হতখানা তুলিয়া কলির পিঠের উপর একটা মৃদু ভীরু আঘাত দিয়া হাস্যমুখে বলিল, আচ্ছা, তাহলে আসছি রাতে।

—এসো কিন্তু। আচ্ছা চলি এখন—চলি, হ্যাঁ, বঙ্কুদা'।

—আচ্ছা আয়।

কুড়ি

কি খবর, মণিদা' ?

—নাঃ, আমি আর ভুবনদার কংগ্রেসে নেই।

বঙ্কু একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে ?

—সত্যি বলছি।

—এটা আমি জানতুম মণিদা। মাঝে ত ছেড়েও দিয়েছিলে, আবার গেলেই বা কেন ?

—গেলুম মানে, কংগ্রেসের ওপর বরাবরই তো একটা টান আছে তাই! তা ছাড়া কংগ্রেস তো আর কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, সুতরাং প্রত্যেকেরই তাতে যোগ দেবার অধিকার যথন তথন।

—তা আবার ছাড়লে কেন ?

—ভেবে দেখলাম এ কংগ্রেসের মধ্যে থেকে দেশের কোনো কাজ করা যাবে না। এ শুধু সমাজকে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—একথা তো তোমায় বহুদিন আগেই বলেছিলাম মণিদা।

—বলেছিলি ঠিকই। তবুও ভেবে দেখলাম এই সত্তর বছরের পুরনো কংগ্রেসকে যদি সত্যিকারের একটা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত ক'রে সর্বোদয় সমাজ গঠন করবার সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু

এখন দেখছি সব বাজে, একেবারেই ধাপ্পাবাজি। শুধু ধোকাবাজি দিয়ে ভোট আদায় করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বঙ্কু একটু হাসিয়া বলিল, এত দেরীতে বুঝলে মণিদা? এ জিনিস তোমার আগের ইলেকসনের সময়ই বোঝা উচিত ছিল।

—সেটাই ভুল করে ফেলেছি।

—তা, কী মনে করে হঠাৎ একেবারে ইলেকসনের মুখে?

—সে সব অনেক কথা। না শোনাই ভাল।

—না না, বল না, কী ব্যাপার শুনি।

—শুনলে অবশ্য তুই হয়তো আমায় অনেক কিছু বলবি,, তা আমি জানি; কিন্তু চেপে রেখেও লাভ নেই। আমার ওসব বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না ভাই, ভুবনদা বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচে। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাউরি, বাগ্‌দি নিয়ে অত মাতামাতি আমার ভাল লাগে না—আমি একটু সেকেলে—সে ত তুই জানিসও।

বঙ্কুর বিপ্লবধর্ম্মী মন হঠাৎ ভিতর হইতে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, ফস্ করিয়া মণিদার মুখের উপর বলিয়া উঠিল, এ আবার বড় অদ্ভুত কথা বলছ তুমি মণিদা'—দু'দিন আগেও তো তুমি এ কথা বল নি, তুমি তো গান্ধী আদর্শে পুরোপুরিই বিশ্বাস কর।

মণিশঙ্কর একটা ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, পলিটিকস্ করতে গেলে ও সব চাল চালতেই হয়। প্রত্যেক মানুষই সমান, সমাজে অস্পৃশ্যতা থাকা উচিত নয়, এ সব কথ মিটিংএ দাঁড়িয়ে বলা চলে, কাগজে লেখা চলে, শুনতেও ভাল, পড়তেও ভাল, তাই বলে কী আর বাস্তব ক্ষেত্রে এসব স্বীকার করা যায়? যে যতই বলুক না কেন হাজার হলেও ধর, বামুনের মেয়েকে কেউ কখনো বাউরি বাগ্দী বা মুচির ছেলের হাতে তুলে দেবে না বঙ্কু; স্বেচ্ছায় যদি কোনো মেয়ে বেরিয়ে যায় তো সে কথা আলাদা। এখনো আমাদের সংস্কারে বাধে। আমি গান্ধী আদর্শে বিশ্বাস করি ঠিকই, তাই বলে রাতারাতি জাতিভেদ তুলে দিতে রাজি নই। যদি কোনো দিন কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে ও জিনিস মুছে চলে যায় যাক্, তাতে সমাজের কোনো হাত নেই। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না আমার, তাই এই নিয়েই ভুবনদার সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া। তাছাড়া এই জন্যই তো আমি আগে তোদেরও দলে আসতে চাই নি।

বন্ধু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মণিশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, তাহলে হঠাৎ আবার আমাদের দলে এসে যোগ দেবার কারণটা কী? তুমি তো তাহলে দেখছি কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

—উপায় নেই। ভুবনদা'কে আমার হারাতেই হবে।

মণিশঙ্করের চিত্তের এইরূপ হীন ও ঘৃণ্য ঔদার্য্যহীনতার কঠোর নির্ম্মম নির্লজ্জ পরিচয় পাইয়া বন্ধু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মনে মনে মণিদা'র প্রতি তাহার একটা ঘৃণাও আসিয়া গেল। এবং ইহার বিরুদ্ধে তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিল না। মৌন রহিল,—আজ যে মণিদা ভুবনবাবুর পরম শত্রু।

মণিশঙ্কর একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, আমার কথাগুলো শুনে ভাবছিস্ বুঝি কত বড় বেইমান এ লোকটা, না? সত্যিই আজ ভুবনদাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তোর কাছে এসেছি। হ্যাঁ—আমি কংগ্রেসের বেইমান—দেখিয়ে দ'বো! ওই বাউরি ছুঁড়িটা বড্ড বাড় বেড়েচে।

বন্ধুর মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না; মাথাটা হেঁট করিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মণিশঙ্কর আবার একটু দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল, এই বলে রাখি তোকে, পলিটিক্স অতি নোংরা জিনিস—এখানে চুরি, জুচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, ইতরামি, বেইমানি, মিথ্যার আশ্রয় সব কিছুরই দরকার হয়। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রকে এখানে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। তোমাকে হৃদয়হীনও হতে হবে, দরকার হলে, এমন কী খুন জখমও করতে হবে।

বন্ধুর সর্ব্বশরীর যেন রাগে ফুলিয়া উঠিতেছে তত্রাচ তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতেছে না!

মণিশঙ্কর আবার একটু হাসিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, সমস্ত দাগান ভোটার্স লিষ্টটা বাগিয়ে নিয়ে এসেছি। আঃ, ভুবনদাকে একেবারে পথে বসিয়ে দোবো। হঠাৎ বন্ধুর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মণিশঙ্করের হাস্যময় প্রফুল্ল মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল, বল কী মণিদা! সমস্ত দাগান লিষ্টগুলো বাগিয়ে এনেছো? তাহলে ত কাজ গুছিয়েছ।

—গুছিয়েছি কী না দেখতে পাবি।—আচ্ছা একটা কথা বলব, রাগ করবি না ত?

না না রাগ করব আবার কী ? বল না।, কী বলবে, শুনি।

—কোনো রকম ভাবে যদি excited না হ'স্ তাহলে একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি,—আচ্ছা কলি মেয়েটি কী রকম প্রকৃতির বল ত ?

বঙ্কুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মণিদা' যে কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া হঠাৎ এরূপ একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন করিয়া বসিল তাহার একবর্ণও সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, হঠাৎ এ কী রকম একটা প্রশ্ন করলে মণিদা ? ঠিক ধরতে পারছি না তো ?

মণিশঙ্কর একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, যদিও তার সঙ্গে আমার খুব একটা আলাপ হয় নি, অবশ্য তাকে জানি খুবই। তবুও তাকে দেখে আমার সন্দেহ হয়। সে তো দু'দলেই আছে কিনা—ভুবনদা'র ডান হাত হয়ে আছে।

—এটা আমি জানি মণিদা', কিন্তু সে তো কংগ্রেসের হয়ে কোনো কাজ করবে না বলেছে।

—আমার বিশ্বাস হয় না বঙ্কু। সে বলে সে কংগ্রেসের কেউ নয় অথচ লোককে বলে জোড়াবলদের বাক্সেই ভোটটা দিও।

কথাটা বঙ্কুকে ভীষণ ভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিল,—না না এ কথা তাহার এতটুকুও বিশ্বাস হয় না।—একথা তুমি নিজের কাছে শুনেছ মণিদা ?

—বহুবার বহু লোকের কাছ থেকে শুনেছি।

—কিন্তু নিজের কানে তাকে বলতে শুনেছ কী ?

—তা অবশ্য শুনিনি।

—তাহলে জোর দিয়ে তুমি একথা কী করে বল ?

—বলি তার হাব-ভাব দেখে।

—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেসের সঙ্গে তার কিছু নেই। অবশ্য যদিও আমাকে সে সাহায্য নাও করে তবুও আমার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করবে না সে।

মণিশঙ্কর ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা দেখা যাক। অল্প দিনের মধ্যেই টেরটি পাবে ভাই, টেরটি পাবে! বাউরি বাদ্দীদের মেয়ে, তাতে খ্রীষ্টান মিশনে মানুষ—এতটুকুও বিশ্বাস নেই।

—ছিঃ মণিদা।, জাত তুলে কথা বলছ কেন ?

—জাত আছে বলেই জাত তুলে কথা বলতে হয়। ষ্টালিনকে যদি কেউ মুচির ছেলে বলে তাতে দোষের কী আছে? মুচিকে মুচি বলবে না তো কী?

—দোষের কিছু নেই বটে, দোষ আছে শুধু বলার ভঙ্গীটাতে, অবজ্ঞায় বলা চলে আবার সরল ভাবেও বলা চলে। এটা তো অবজ্ঞার উক্তি।

—একে অবজ্ঞা বলে না, সত্য কথা বলার সাহস বলে।

—আজকের দিনে একে সাহস বলে না মণিদা', বলে সঙ্কীর্ণতা। সমাজ তাদের ঘৃণায় এক দিকে ফেলে রেখেছে, তাই সমাজের দুর্বিচার, অত্যাচার, সহ্য করতে না পেরে তাদের অনেকে হয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে আর নয় তাদের মিশনে মানুষ হয়েছে। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ তাদের কোনো দিন ভালবেসে কাছে টেনে নেয় নি, তাই তারা অস্পৃশ্য হয়ে ছিল। কিন্তু আজ আর তারা অস্পৃশ্য নয়; তারাও মানুষ।

কথাগুলি মণিশঙ্করের এতটুকুও ভাল লাগিল না। সে যেন কতকটা বিরক্ত হইয়াই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, যাক্‌গে, আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে একটা কথা বলে দি, ও মেয়েকে বিশ্বাস করলে তুই মস্ত বড় ভুল করবি বঙ্কু।—আচ্ছা, আসি তাহলে এখন।

—কেন, চল্লে কেন, আর একটু বসে যাও না, কিছু তো কথা হল না।

—কথা সবই ঠিক। ভোটার্স লিষ্টটা দিয়ে যাব এক সময়। কংগ্রেসকে হারাতেই হবে। ভুবনদার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিতে হবে।

—ভরসা দিচ্ছ মণিদা?

—নিশ্চয়ই।—কাল তোদের কন্‌ফারেন্স আছে না?

—না, পাঁচ দিন পরে।

—ও, তা'হলে তো ভালই। পাঁচ-ছ হাজার ক্ষেত মজুরদের এক মিছিল বার ক'রব। এতদিন কংগ্রেসের হয়ে শুধু মিথ্যা কথাই বলে এসেছি, আজ থেকে সত্য কথা বলা সুরু করলুম।—ছেলে-চ্যাঙড়া কিছু হাতে আছে ত?

—তা আছে। এখন যে টিচার্স ষ্ট্রাইক চলেছে কিনা—ছেলেগুলোও খুব ক্ষেপে আছে—ওদের হাত করে নিয়েছি—কোনো ভাবনা নেই।

—তবে ত ভালই।

—আচ্ছা, আসি তাহলে এখন, আবার দেখা হবে। বলিয়া মণিশঙ্কর বিদায় লইল।

একুশ

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাত বাজে প্রায় আটটা। আকাশে চাঁদ নাই, শুধু অগণিত ক্ষীণজ্যোঃতি নক্ষত্র। পুষ্কর এতক্ষণ ধরিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া সজলের সহিত গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সে উঠিয়া গিয়া উন্মুক্ত বাতায়নের ধারে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া গিয়া বসিল। তারপর অন্ধকার নীরব আকাশটার দিকে একবার চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া সজলকে ডাকিয়া বলিল, হারিকেনটা টেবিলের ওপর থেকে একটু নামিয়ে রাখ ত সজল।

—কী, চোখে লাগছে বুঝি আলোটা ?

—না, তেমন লাগছে না বটে, সে জন্য নয়, অন্ধকার আকাশটাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্চে কিনা, দেখবো বলে—লণ্ঠনের আলোটা যেন চোখ দুটোকে চেপে ধরচে।

সজল হাসিয়া বাঁচে না,—পুষ্করবাবুর এ আবার কী খেয়াল! তাড়াতাড়ি করিয়া হারিকেনটা টেবিলের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার শীত করচে না ? আকাশে ত চাঁদ নাই। কী দেখবেন ?

এমন সময়ে কলি এক কাপ চা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, কী ব্যাপার হঠাৎ জানলার ধারে গিয়ে বসেছো যে ?

—তারাভরা অন্ধকার আকাশটাকে দেখচি।

—বাঃ, অদ্ভুত খেয়াল তো তোমার।

—সত্যি ভারী ভাল লাগছে দেখতে। কোলকাতার রাতের আকাশের দিকে একটা দিনের জন্য তাকাতে ইচ্ছে হয় না, অথচ এখানকার আকাশটাকে বার বার দেখেও আশ মেটে না।

কলি একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ তো কবি আমার।

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, না না কবি নই আমি।

—কী জানি, যে ভাবে আকাশটাকে ভালবাসছো।

—হঠাৎ খেয়াল হল, তাই তাকিয়ে দেখলুম।—তা আজ একটা গান শোনাতে হবে।

—বেশ তো, শুনবে। আচ্ছা আসছি, একটু দাঁড়াও মাংসটা নামিয়ে রেখে আসি, হয়ে এসেছে। বলিয়া কলি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোন্ গানটা গাইব বল।

—"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ............।

—ও, রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা? ওটা আমারও খুব ভাল লাগে। খালি গলায় কিন্তু...।

—ভালই শোনাবে।

—আচ্ছা বেশ, বলিয়া কলি পালঙ্কের উপর এক ধারে বসিয়া গান গাহিতে সুরু করিল,—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি
ধরায় আস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো।

নীরব নিশীথিনীর অতন্দ্র আকাশের বুকের উপর দিয়া সেই ভাবগম্ভীর সঙ্গীতের মধুর রাগিনী যখন ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, ঠিক সেই সময় বন্ধু বাহির হইতে আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া সেই গানের প্রথম লাইনটি ভাঁজিতে ভাঁজিতে আনন্দের হাসিতে প্রাণ ভরিয়া লইয়া, সেই সঙ্গীতমুখর ঘরে ঢুকিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ চমৎকার, সুন্দর গাইচিস তো, বলিয়াই একটা মোড়া টানিয়া লইয়া যেমনি বসিতে যাইবে অমনি ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালাটার দিকে চোখ পড়িতেই দেখে সেই অনভিপ্রেত অনুজ্জ্বল আলোকে দুর্নিরীক্ষ্য মানুষটি একটা হাতাওয়ালা চেয়ারের উপর এক কাপ চা হাতে লইয়া কেমন সহজে—স্বচ্ছন্দে—প্রফুল্লচিত্তে—বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এমন করুণভাবে হতভম্ব হইয়া গেল যে, তাহার ঐ অসহায় অবস্থাটা উহাদের উভয়েরই দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া যাইতে পারিল না। কলি গান থামাইয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার বাঁ পাশ হইয়া দাঁড়াইয়া, হাসিমুখে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, যাক্ তবু যে এসেছ মনে করে; তোমার জন্যে আমরা anxiously অপেক্ষা করছিলাম। দেরী দেখে ভাবছিলাম বুঝি ভুলেই গেলে।—তা ব'সো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বন্ধুর ঠিক সেই সহজভঙ্গীতে কথা বলিবার মতো সে শক্তি আর নাই।

লজ্জায়, অভিমানে, অপমানে, ক্রোধে তাহার ভিতরের আহত বিমূঢ় মানুষটি তাহাকে যেন বার বার নিষ্ঠুর পরাভবের তীক্ষ্ণাঙ্কুশ দ্বারা আঘাত দিতেছিল এবং সেই আঘাত সে নীরবে সহ্যও করিয়া যাইতেছিল, তবুও সে তাহার স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে একটা হিংস্র হাসির রেখা টানিয়া বলিল, ব'সছি, তবে বেশী ক্ষণ বসতে পারব না, বুঝলি, এখনই চলে যেতে হবে, বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফেলিয়া সম্মুখের স্বল্পালোকিত দেওয়ালটার দিকে তাকাইয়া রহিল,—ক্রুসিফিকসনের ছবিটাকে না-দেখার মতো করিয়া দেখিতে লাগিল।

কলি লণ্ঠনটা বাঁ হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, থাক, আর বাজে কথা বলতে হবে না, ঢের হয়েছে। সে দিন তো আর এলে না—এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি, বলিয়া উভয়ের দিকে পর পর তাকাইয়া পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, এনার নাম শ্রীপুষ্কর চাটার্জি; একই অফিসে আমরা কাজ করি—একজন গান্ধীভক্ত লোক। আর এনার নাম শ্রীবঙ্কু ব্যানার্জি—এঁর কথাই সেদিন বলছিলাম। একজন উগ্রপন্থী—a misguided intellect.

পুষ্কর দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিয়া হাস্যমুখে বলিল, আপনার কথা আগেই শুনেছি।

বঙ্কুর প্রত্যভিবাদন জানাইবার মতো সে মন এবং স্পৃহা এতটুকুও নাই; বরঞ্চ প্রতি মুহূর্তেই তাহার মনে হইতেছিল যদি কোনো রকমে সেখান হইতে সে ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে বোধ হয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, অথচ প্রতিনমস্কারটি না জানাইয়া শুধু মাথাটি নাড়িয়া ইহার উত্তরটা দেওয়া যে রীতিমতো একটা অশিষ্টতা ইহাও সে ভাল করিয়াই বুঝে; তাই নিতান্ত নিস্পৃহতার সহিত হাতটা জোড় করিয়া তুলিয়া তাহাকে একটা প্রত্যভিবাদন জানাইয়া চোখ মুখের হাব-ভাবের ভিতর দিয়া এমনি একটা চপলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, যেটা দেখিয়া মনে হইতেছিল সে যেন অনেক কিছু কাজ ফেলিয়া রাখিয়া কেবলমাত্র নিমন্ত্রণটা রক্ষা করিতেই আসিয়াছে এবং যত সত্বর সম্ভব হয় উঠিয়া পড়িতে পারিলেই যেন তাহার পক্ষে ভালই হয়।

—তাহার ঐ উঠি উঠি ভাব দেখিয়া কলি বলিল, ব'সো বঙ্কুদা, ততক্ষণ বসে বসে ওনার সঙ্গে গল্প কর, আমি তোমার জন্যে চা তৈরী করে নিয়ে আসি।

—না না এইমাত্র খেয়েছি কিছু দরকার নেই, এখুনি উঠবো।

কলি বিস্মিত হইয়া বলিল, উঠবে মানে! খুব লোক ত যা'হক, বলিয়া মুহূর্তকালও সেখানে না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে যাহাদের বসাইয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হঠাৎ এমন একটি বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহারা উভয়ে কোনো এক যাত্রীবাহী চলন্ত যানের মধ্যে পরস্পরের কাছে অপরিচিত হইয়া বসিয়া আছে—কাহারো মুখে কোনো কথাটি নাই। বিচিত্র ব্যাপার! এমন সময়ে সজল বলিয়া উঠিল, বঙ্কুদা' জান, আমি পুষ্করবাবুর সঙ্গে কোলকাতা যাচ্ছি।

বঙ্কু নিস্পৃহতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল হঠাৎ এ সখ্ কেন?

—আমি যে কখনো কোলকাতা দেখিনি, তাই।

—মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া বঙ্কু বলিল, তা এত কী দেখবার পড়ে গেল? দিদি যাচ্চে কবে?

—বাঃ, দিদি যাবে কেন? দিদি তো ছুটি নিয়েছে। তাছাড়া দিদি তো চাকরি ছেড়ে দিচ্চে।

কথাটা বঙ্কুকে সহসা একেবারে একটা বিরাট প্রশ্নের জালে জড়াইয়া ফেলিল। তবুও সে নিস্পৃহকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তার মানে?

—হ্যাঁ সত্যি, দিদি বলছিল দিদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে গ্রামে গ্রামে কাজ করবে। কেন, দিদি তোমায় বলে নি?—ঐ যে দিদি এসে গেছে, জিজ্ঞেস কর।—বুঝলি দিদি, বঙ্কুদা' বিশ্বাস করচে না।

কলি ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সজলের শেষ কথাটা তাহার কানে গিয়াছে; চায়ের কাপটা বঙ্কুর হাতের কাছে ধরিয়া সজলকে জিজ্ঞাসা করিল, কী রে, কী বলছিলি রে সজল?

—বুঝলি দিদি বঙ্কুদা' বিশ্বাস করচে না যে তুই চাকরি ছেড়ে দিবি।

শুনিয়া কলি কেবল একটু হাসিল।

কিন্তু এ হাসি তো শুধু হাসি নয়। বঙ্কুর কাছে ইহা যেন একটা বিরাট প্রশ্ন, একটা বিস্ময়, একটা রহস্য, একটা তীব্র বেদনা! একটা মধুর আনন্দময় কল্পনাও; ইহা যেন তাহার কাছে অনাগত কালের গত গভীর সফলতার, অথবা বেদনাময় ব্যর্থ জীবনের একটা তিক্ত ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইল। ক্ষণকালের জন্য সে যেন কেমন হইয়া গেল--আর এক মুহূর্তও সঙ্খুব্ধ ব্যথিত মন লইয়া

সেখানে বসিয়া থাকিতে এতটুকুও ভাল লাগিতেছে না। মনে মনে ভাবিল, এখনি উঠিয়া পড়িবে, কিন্তু কী করিয়াই বা উঠে? উপায়টা কী? মুখ দিয়া কথা সরে না, অথচ চা-টা না খাইলে কী রকম যে দেখায়, ভাবিয়া যেন একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো হাতটা বাড়াইয়া চায়ের কাপটা ধরিয়া লইয়া একটা উদ্‌ভ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, কী দরকার ছিল মিছি মিছি আবার, এই মাত্র তো খেয়ে এলাম!

হঠাৎ এই কথার উত্তরটা আসিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে পুষ্করের কাছ হইতে, এবং সে এমনি একটা ভাব দেখাইয়া কথা বলিল, যেন সে নিজেই এ বাড়ীর আপনার জনের একজন; তাই সে বিনয়ের সঙ্গে বলিল, তা হোক খেয়ে নিন এমন কিছু নয়, ঠাণ্ডার দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়া চলে, তাছাড়া এখনও তো খেতে একটু দেরী আছে। বলিয়া রুপোর তৈয়ারী সিগারেট কেশটা টিপ দিয়া খুলিয়া লইয়া বঙ্কুর হাতের কাছে ধরিয়া বলিল, আসুন।

বঙ্কু একটা মরা হাসি হাসিয়া নিজের কথাগুলি যেন নিক্তির ওজনে মাপ করিয়া বলিল, এইমাত্র খেয়েছি—thanks!

—তা হোক না, নয় আর একটা খেলেনই।

—ভাল লাগচে না।

—লাগবে, ধরিয়ে নিন।

—আমি ত এখুনি উঠবো, বলিয়া সিগারেটটা লইয়া ডান হাতের আঙুলের ফাকে ধরিয়া রহিল।

কলি বলিয়া উঠিল, পাগল নাকি। ছাড়, ছাড়, ওসব বাজে কথা ছাড় এখন, এসো, পালঙ্কের ওপর উঠে ব'সো আরাম করে, তাশ খেলবো।

—হ্যাঁ! আমার বলে মরবার সময় নেই, তাশে ব'সবো!

কলি যেন একটু শাসনের সুরেই বলিয়া উঠিল, রেখে দাও তোমার পলিটিক্স এখন, ঢের হয়েছে! অনেক পলিটিক্সই ত করছ, নয় একটা দিন বাদই দিলে।

এ রস আস্বাদন করিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিবার মতো বঙ্কুর সে মনও নাই সে মেজাজও নাই তবুও তাহাকে একটা মন-মরা হাসি হাসিতেই হইল, বলিল বাঃ, খুব বল্লি যা হক। কনফারেনসের কথাটা কী একেবারে ভুলে গেলি নাকি?

—ভুলবো কেন, এতটুকুও নয়। কিন্তু এত কিসের তাড়া?

—তাড়া নয়, কাজ আছে। যাঁরা আসবেন তাঁদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর মণিদার ওখানেও একটু যেতে হবে।

—হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিলে—আচ্ছা বঙ্কুদা', বলতো, মণিবাবু হঠাৎ কংগ্রেস ছেড়ে তোমাদের দলে গিয়ে ভিড়লেন কেন ?

—সে অনেক কথা, পরে বলবো। এখন আমায় ছেড়ে দে, একটু পরেই আবার ঘুরে আসছি। বলিয়াই সে একেবারে মোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, সে কী উঠে পড়লেন যে ? বাঃ, আর একটু ব'সে যান মিঃ ব্যানার্জী। সে কী, সিগারেটটা ধরালেনই না যে, এই নিন আসুন, বলিয়া একটা কাটি ধরাইয়া লইয়া বঙ্কুর মুখের কাছে আগাইয়া ধরিল।

অদ্ভুত, বঙ্কুর ডান হাতটা যেন আপনা হইতেই কাজ করিয়া গেল। সিগারেটটা ধরাইয়া লইয়া মুখ দিয়া ভক্ করিয়া খানিকটা ছন্দবিহীন ছন্নছাড়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, না, না, আমাকে আর আটকাবেন না স্যার, আমি বরং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

কলি সহৃদয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক আসছ তো ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—না এলে আমাদের খাওয়া হবে না কিন্তু, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে ব'সে থাকব। এসো কিন্তু বঙ্কুদা'।

বঙ্কু একটু কৃত্রিম অমায়িকতার হাসি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ ঠিক আসবো, বলিয়া সোজা দরজার চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া দিল।

দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! অত হুড়োহুড়ি করে যাচ্চ কেন, অন্ধকারে হুঁচট্ খাবে যে। চল, আজ টর্চ আছে, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—দরকার নেই, চলে যাবো ঠিক।

—না না, টর্চটা নিয়েই যাও না, আবার তো ঘুরে আসছই।

—এমনি চলে আসবো, বলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সে একেবারে সদর দরজা পার হইয়া সরু পায়ে-চলা পথটার উপর আসিয়া পড়িল। কলিও চলিল তাহার পিছন পিছন জ্বলন্ত টর্চটা হাতে লইয়া।

এতক্ষণের পর বঙ্কু যেন হাঁপ-ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রবঞ্চনার যে হিংস্র নিষ্ঠুর ক্রূর দানবীটা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বার বার তাহাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া মারিতেছিল সেই ভয়ঙ্করী দানবীটা যেন হঠাৎ

ব্যাগটা খুলে ?—বাঃ, খদ্দরের পাঞ্জাবিটা বেশ সুন্দর মানিয়েছে ত। তেমন ভাল কাটতে পারি না ত, ভেবেছিলাম বুঝি গায়ে হবে না। ধুতিটা অবশ্য একটু মোটা হল।—মা দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবেন কী বল ? জিজ্ঞেস করলে কী বলবে ?

—বলবো, সত্যি কথাই বলব, বলব তোমার হাতের তৈরী।

লজ্জা করবে না ত ?—যাক্, তোমার চিঠিটাও কী এরই সঙ্গে সাবমিট করছ ?

—ক'দিন পরে করবো।

—তাই ক'রো তা হলে।—ঐ যে গাড়ী এসে গেছে।

রিক্সা এসে গেছে দিদি।—চলুন পুষ্করবাবু ওঠা যাক্। আসি দিদি। বলিয়া সজল আনন্দ করিতে করিতে রিক্সায় উঠিয়া পড়িল।

—আয়। যেয়ে চিঠি দিস! বলিতে না বলিতে কলির দুই চক্ষু আবার জলে ভরিয়া গেল।

তেইশ

অণ্ডাল ষ্টেসন্। রাত্রি গভীর। প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। দুই জনেই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ একটা চেঁচামেচিতে দু'জনেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সজল জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া পুষ্করকে জিজ্ঞাসা করিল, এটা কোন্ ষ্টেসন ?

চারিদিক অন্ধকার বলিলেই হয় কেবলমাত্র দুরে দুরে দুই একটা ইলেকট্রীকের আলো জ্বলিতেছে। পুষ্কর এদিক ওদিক তাকাইয়া কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিল না, গাড়ী কোন ষ্টেসনেএ আসিয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিল। দরজাটা ঝট করিয়া খুলিয়া ফেলিল। ·খুলিয়াই দেখিল সুমুখে কোনো প্ল্যাটফরম নাই শুধু কতকগুলা আঁকাবাঁকা রেল লাইন মন্ত্রমুগ্ধ নির্জীব কৃষ্ণকায় কতকগুলা উরঙ্গের মতো পাতা রহিয়াছে; স্তিমিত বৈদ্যুতিক আলোকে সেগুলি অল্প অল্প চক্‌চক্‌ও করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া পুষ্করের আর বুঝিতে বাকি রহিল না ব্যাপারটা কী দাঁড়াইয়াছে,—গাড়ী সান্টিংএ পড়িয়া আছে। কিন্তু এমনটা

তো সচরাচর বড় একটা ঘটে না। বড়ই দুর্ভাবনা হইল, কেননা এই গভীর রাত্রে প্ল্যাটফরম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। তাই বিছানা ও সুটকেশটা হাতে করিয়া সজলকে সঙ্গে লইয়া সত্বর সে ফার্ষ্টক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট হইতে নামিয়া পড়িয়া স্লিপারের উপর দিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া ফেলিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের ঘরের দিকে হাঁটিয়া চলিল। একে ঝাঁপসা অন্ধকার তার উপর পথও অনেকটা। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐভাবে আরও অনেকে হাঁটিয়া চলিয়াছে। অত লোকজন দেখিয়া সজলের অনেক কিছু জানিবার কৌতূহল হইল। প্রশ্ন করিয়া উঠিল, এত লোক সব কোথায় যাচ্ছে ?

—ষ্টেসন মাষ্টারের কাছে, ব্যাপারটা কী হল তাই জানতে !

—ষ্টেসন মাষ্টার কোথায় আছেন ?

—চল না দেখতে পাবে।—ঐ যে, ঐ লাল ঘরগুলো সব দেখা যাচ্ছে টানা একতলা বারান্দাওয়ালা বাড়ীটা, ওখানেই তাঁর আফিস, বলিয়া মুখটা ষ্টেসনের দিকে করিয়া ইসারায় দেখাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে তাহারা একেবারে ষ্টেসন্ মাষ্টারের ঘরের সম্মুখে বারান্দাটার উপর আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। সজলকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া পুষ্কর ষ্টেসন মাষ্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়া খবরাখবর করিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিরক্তিকর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আপনাদের ট্রেন আসতে late হয়েগেছে আমি তার কী করবো ? কোলকাতার ট্রেনটা আগেই বেরিয়ে গেছে, তাই গাড়ী shuntএ পড়ে আছে। বাজে বকবেন না ! বার বার আর বিরক্ত করবেন না !

তাঁর কথায় সকলেই এক সঙ্গে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল , জোর কথা কাটাকাটি চলিল—এমন কি হাতাহাতি হয় আর কী। কোনো পক্ষই ক্ষান্ত হয় না। ইতোমধ্যে একজন প্রভাবশালী ধনী যাত্রী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, চেয়ারে বসে বসে খুব যে গরম দেখাচ্ছেন মশাই। মেজাজ দেখাবেন না মশাই, মেজাজ দেখাবেন না, বুঝলেন ; ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন !

—মশাইরাও ভদ্রভাবে কথা বলতে শিখুন।

ভদ্রলোক ভীষণ ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আপনার নামে রেল মন্ত্রীর কাছে এখুনি complaint দ'বো, বুঝে সুজে কথা বলবেন,—লাট-

সাহেবের মতো ব'সে ব'সে জবাব দিচ্চেন বাবু—অসভ্য কোথাকার!

মাষ্টার মহাশয় ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ খুব দিন, এই যে, কাগজ কলম এগিয়ে দ'বো না!ক ?—বেরিয়ে যান এখান থেকে!

রাগে, অপমানে ভদ্রলোকের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া আগুন হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, অভদ্র ইতর কোথাকার! মজা দেখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও তো! দাঁড়াও তো! বলিতে বলিতে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া যাত্রীদের মধ্যে অনেককে জড়ো করিয়া লইয়া তিনি তাহাদের দু'চার জনের নাম ঠিকানা লইতে লাগিলেন, অর্থাৎ অভিযোগ পত্রে যাঁহারা যাঁহারা নাম ও ঠিকানা দিয়া উপকার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সাক্ষী হিসাবে নামোল্লেখ থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই সাক্ষী হইতে সম্মত হইলেন না। ভদ্রলোক নিরাশ হইয়া, সমস্ত বাঙালী জাতটাকে তিরস্কার করিতে করিতে নিজের কম্পার্টমেণ্টের দিকে হাঁটিয়া চলিলেন।

ষ্টেসন মাষ্টারের আচরণ লক্ষ্য করিয়া পুষ্কর বুঝিল আর তাঁহার সহিত বাক্যব্যয় করিয়া কোনোও লাভ নাই, তাই সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া আর সে নিজের কম্পার্টমেণ্টের দিকে গেল না, স্থির করিল, ফার্ষ্ট-ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া আশ্রয় লইবে, কেন না গভীর অন্ধকার রাতে প্ল্যাটফরম্ হইতে বহু দূরে অবস্থিত অন্ধকারময় কামরার মধ্যে শুইয়া বা বসিয়া থাকাটা সে খুবই বিপজ্জনক মনে করিল। এই মনে করিয়া সে সজলকে সঙ্গে লইয়া স্যুটকেশ ও বিছানাটা হাতে করিয়া লইয়া ওয়েটিং রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়াই সে প্রথমে একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোফার উপর উপবিষ্টা দুইটি তরুণীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে আগাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, উঃ, একেবারে চমকে উঠেছি!

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, কেন, চমকে ওঠার কী হল? বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?

পুষ্কর পঞ্চমীর ঠিক ডান পাশের গদি অ।টা চেয়ারটায় উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, বাবা! একেবারে যে ভোল ফিরিয়ে ফেলেছেন দেখচি, হ্যাঁ দিদি! চমকে উঠবো না তো কী! তারপর এই গভীর রাতে এরকম একটা

জায়গায় যে দু'জনে বসে থাকবেন সেটা তো কল্পনাও করতে পারি নি। চিনে ওঠাই দায়।

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, কেন, কী এমন ভোল ফিরিয়েছি যে, চট করে একেবারে চেনা যায় না ?

—মনে তো হচ্ছে সে রকম।

পঞ্চমী চোখটা ঘুরাইয়া দৃষ্টি ভঙ্গীতে একটা অপরূপ ছন্দ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, চেনা ত যায় না, আবার এক নজরে ঠিক চিনেও ত ফেলা হ'ল দেখলুম। আহা, কত ঢঙই শিখেছেন বাবু। বলি, কোথা থেকে এত রাতে শুনি ?

পুষ্কর মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিল, বলব সবই আস্তে আস্তে। তা তোমরা দু'জনে চল্‌লে কোথায় এত রাতে ? সাড়ি ছেড়ে লঙপ্যাণ্ট ধরেছ, তার ওপর বুশসার্ট; ববড্ হেয়ার ত আছেই।

বৌদি মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ঠাট্টা হল বুঝি ? কেন খুব খারাপ দেখাচ্ছে ? এতে কাজে agility আসে, স্ফূর্তি আসে, সাহসও আসে, শুধু তাই নয়, দশ বছর পরে আপনি দেখতে পাবেন ভারতের অধিকাংশ শিক্ষিত নারী সমাজ এই পোষাককে সাদরে গ্রহণ করেও নেবে। এটার প্রয়োজনও আছে কেননা অদূর ভবিষ্যতে, যেমন রাশিয়ায় আজ হয়েছে ভারতে নারী-পুরুষ যখন পাশাপাশি ব'সে, দাঁড়িয়ে ফ্যাক্টরীতে পোর্টে, air serviceএ জাহাজএ কাজ করবে তখন এই পোষাকেরই প্রয়োজন হবে।

—সেটা যা বলেচেন। তবে চট করে চিনে উঠতে পারলুম না, এই যা।

বৌদি বলিলেন, এ পোষাকটা আমি বিয়ের আগে থেকেই পরি। বিয়ের পর অবশ্য কিছুদিন পরিনি। অবশ্য আপনি আমায় এই প্রথম এই পোষাকে দেখলেন কিনা তাই একটু ধোকা লাগছিল।

—কিন্তু আপনার ঠাকুরঝিটিকে ত কখনো এর আগে এমন মধুর ললিত ছন্দে ভরা পোষাকে দেখিনি। অদ্ভুত মানিয়েচে কিন্তু ওকে। সত্যিই খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে—এই তো চাই!

কথাটা শুনিয়া পঞ্চমী ভিতরে ভিতরে অকস্মাৎ এমনি একটা উত্তেজনা অনুভব করিয়া বসিল যে, হঠাৎ সে একটা দুর্দমনীয় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পুষ্করের যে হাতটা চেয়ারের হাতলের উপর শোয়ান ছিল সেই হাতের উপর ঝট্ করিয়া একটা চাপড় মারিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, দুষ্টুমি হচ্ছে না ? ঠাট্টা হচ্ছে ?

—না ঠাট্টা নয়, সত্যি, ভালই দেখাচ্ছে।

বৌদি পরিহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিলেন, তবে আপনাকে কিন্তু আজ ততটা স্মার্ট দেখাচ্ছে না, কবি কবি মনে হচ্ছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'রংরেজিনী' কবিতাটার মতো, ছন্দ আছে আবার নেইও অথচ মধুর ভাবে ভরা। আজকে দেখচি আপনাকে ধুতি আর চুড়িদার পাঞ্জাবিতে তাও আবার খদ্দর! হঠাৎ গান্ধীভক্ত হয়ে উঠলেন যে, ব্যাপারটা কী?

—আপনার ঠাকুরঝি যে হঠাৎ উগ্রপন্থী হয়ে যাচ্ছে বলে ভয়ে দেখিয়েছে কিনা তাই।

পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, খুব ঠাট্টা হচ্ছে না? দোবো পাঞ্জাবিটা ফড়্ ফড়্ করে টেনে ছিঁড়ে? বলিয়াই পাঞ্জাবিটার বাঁ পকেটের সুমুখের কোণটা খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া ডান হাতের মুঠোর মধ্যে করিয়া লইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বেশ সেটাকে রগড়াইয়া রগড়াইয়া অনুভব করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল।

বৌদি বলিলেন, ও যা করবে, আপনি কী তার উল্টোটা করবেন, এটাই কী আপনাদের চুক্তি নাকি?

পুষ্কর বলিল, ওইই ভাল বলতে পারবে ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না?

—আপনিই বলুন না শুনি।

পুষ্কর বলিল, এমন চুক্তি টেকে না, জানেন ত দিদি?

বৌদি বলিলেন, কে বল্লে টেকে না খুব টেকে। আপনার বন্ধু, দেবকুমার তো ঐ চুক্তিতেই এখনো পর্যন্ত আবদ্ধ।

—দেবকুমারের সাহস আছে আর আছে মনের জোর।

পঞ্চমী মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, দাদার মতো সাহস নেই কিন্তু তার মতো রোগটাতো পেয়েছ দেখচি। বলিয়া, হঠাৎ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ডান হাতের মুঠোটা শক্ত করিয়া পাকাইয়া লইয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি পুষ্করদা তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে দি' একটা ঘুঁষি মেরে!

—তা মার না, ভালই তো হয়।

পঞ্চমী বলিল, থাক্ ঢের হয়েছে আর কথা বলতে হবে না। আজ পর্যন্ত একটা চাকরি ত দেখে দিতে পারলেন না বাবু, আবার কথা।

—কেন এই তো বেশ life বেছে নিয়েচ।—কী বলেন দিদি আপনি তো মনে হয় বেশই আছেন ?

বৌদি বলিলেন, সত্যিই ভাল আছি—মুক্তজীবন—ফ্রি লাইফ!

—তাহলে আপনার ঠাকুরঝিটি চাকরি চাকরি করে এখনো এত আফসোস করে কেন ?

—সেই কথাই তো আমিও ভাবি। এমন মুক্তজীবন থাকতে কে যেচে পায়ে শেকল পরে ? যাক্, সে কথা। তা এখন আসচেন কোথা থেকে ?

—আপনারাই আগে বলুন। আপনারাই বা হঠাৎ এখানে কী করে ?

—যাচ্ছি দুবরাজপুর, সেখান থেকে যাব হেতমপুরের কাছাকাছি। কিন্তু আপনি এত রাত্তিরে কোথা থেকে ? আমরা নয় ট্রেন ফেল করে বসে আছি।

—হঠাৎ হেতমপুরে যাচ্ছেন যে ?

—All Parties' Conference আছে। বলিয়া প্যাণ্টের পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করিয়া লইয়া অল্প একটু খুলিয়া পুষ্করের হাতের কাছে আগাইয়া ধরিয়া স্মিতহাস্তে বলিলেন, আসুন।

পুষ্কর বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ না করিয়া মৃদু ভঙ্গীতে বাঁ হাতের তিনটি আঙুল খেলাইয়া প্যাকেট হইতে একটা সিগারেট বার করিয়া লইয়া বলিল, বাবাঃ, বাঁচালেন—অনেকক্ষণ খাই না। তাড়াতাড়িতে কিনতেই ভুলে গেছি।

—তা রেখে দিন না প্যাকেটটা নয়, আমার কাছে চার প্যাকেট আছে, ওর কাছে পুরো এক টিন আছে। বলিয়া প্যাকেটা এক রকম জোর করিয়াই বলিতে গেলে, তাহার পাঞ্জাবির বুক পকেটে পুরিয়া দিল।

পুষ্কর একটু হাসিয়া পঞ্চমীর দিকে মুখটা ঘুরাইয়া শুধু একটু চোখের ইঙ্গিত করিল—অর্থাৎ আর সঙ্কোচে প্রয়োজন নাই।—চলে ত ?

বৌদি বলিলেন, খুব। আপনাকে দেখে হঠাৎ লজ্জা হল কেন বুঝলাম না।

—লজ্জা কিসের, চলুক। তা ছাড়া আজ একটু ঠাণ্ডাও পড়েচে। এর সঙ্গে একটু চা হলে মন্দ হ'ত না।

বৌদি বলিলেন, দাঁড়ান দেখে আসি বাইরে কোনো ভেণ্ডর দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

পুষ্কর বলিল, না না আমিই দেখে আসচি আপনারা বসুন দিদি, বলিয়া আড় চোখে সে একবার সজলের দিকে তাকাইয়া দেখে, সুটকেশটা মাথায় দিয়া, সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরের একটা উত্তরীয় দ্বারা মুড়ি দিয়া একটু দুরে একটা বেঞ্চের উপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, আমিই যাচ্ছি বরং তোমরা বসে বসে গল্প কর বৌদি।

বৌদি শুনিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, না না আমিই যাচ্ছি। প্রদীপবাবুকেও দেখে আসি—তিনি সেই যে গেলেন এখনো ত ফিরলেন না দেখচি।

বলিতে বলিতে প্রদীপবাবু আসিয়া গেলেন। প্রিয়দর্শী এক যুবক; বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। নাতিদীর্ঘ দেহ; হৃষ্টপুষ্ট। সমস্ত চেহারাটির ভিতর দিয়া অম্লান আভিজাত্যের একটা স্নিগ্ধ সুকোমল ছাপ পরিস্ফুট। মুখে নিয়তই একটা মোটা জ্বলন্ত চুরুট, চোখে মোটা কালো সেলফ্রেমে আঁটা এক জোড়া পুরু কাচের চশমা। পরণে সাদা পায়জামা, গায়ে ভায়েলার ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমটা তিনি একটু চমকিয়া উঠিলেন তারপর নিমিষকাল মধ্যে নিজেকে সহজ করিয়া লইয়া বলিলেন, সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেল, না? এই যে শ্রুতিদি' শুনুন, বাইরে আসুন একটু কথা আছে।

—আসছি একটু বসুন পুষ্করবাবু বলিয়া বৌদি প্রদীপবাবুর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইনি কে পঞ্চমী?

পঞ্চমী কম্প্যানিয়নের পরিচয় দিতে গিয়া যেন একটু গর্ব করিয়াই বলিল, অগাধ পয়সার মালিক, বাবা তিনটে বড় বড় কম্পানির ডিরেকটর, এদিকে নিজেও ব্যারিষ্টার যদিও প্রাক্‌টিস করেন না। বছর দুয়েক হল আমাদের এই পার্টিতে এসে যোগ দিয়েছেন। পার্টির জন্য অনেক পয়সা ব্যয় করে থাকেন। লোকটি বড় ভাল। এদিকে চিরকুমার।

—তাহলে উনি সখের পলিটিক্স করেন বোধ হয়?

—না, না, সখের কেন? বস্তুর মতো দুঃখীর জন্ম দরদ আছে ওনার। এর প্রমাণও আমি পেয়েছি! এই ত সেদিন ওনার সঙ্গে এস্প্ল্যানেডের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেচি, সন্ধ্যা প্রায় হয় হয় সেই সময় এক দল ভুখা-মিছিল আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তারা সকলেই চাষা—নিজ হাতে জমি চাষ করে,—অথচ দেখলুম তাদের সকলেরই সব না-খেতে-পাওয়া চেহারা, তার ওপর কারুরই গায়ে শীতের জামা কাপড় নেই। অদ্ভুত জিনিষ একটা দেখলুম, বাচ্চা বাচ্চা শিশুরাও পর্যন্ত দলের সঙ্গে হেঁটে চলেচে, এমন কি দুই একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকেও তাদের মধ্যে দেখা গেল। মনটা কেঁদে উঠল আমাদের দু'জনেরই! কিন্তু কি বিচিত্র ব্যাপার,—ও দিকে গ্রাণ্ড হোটেলে নাচের আর নৈশ আমোদ-প্রমোদের মহড়া চলেচে, মেট্রো সিনেমা ভিড়ের ঠেলায় ভেঙ্গে পড়চে। প্রদীপবাবু আর আবেগ রাখতে পারলেন না, তিনি যেন সত্যিই একেবারে বিচলিত হয়ে উঠলেন; বলতে লাগলেন—হায় রে, এদেরই রক্ত দিয়ে তৈরী এই জিনিস অথচ এদেরই পেটে ভাত নেই, গায়ে কাপড় নেই! ইস্, আমরা পশুরও অধম হয়ে গেছি, আজকালকার তরুণ তরুণীদের শরীরে এতটুকুও তেজ নেই, মানুষকে ভালবাসার প্রবৃত্তি নেই, তারা আজ অমানুষ তৈরী হয়ে গেছে, তারা আজ ধ্বংসের পথে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম সত্যি কথাই বলেচেন স্যার, সত্যি কথাই বলেচেন, চারিদিকেই ক্ষুধিতের আর নিপীড়িত সমাজের রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হয়! আজ আমাদের মধ্যে লেলিন বা ষ্টালিনের মতো লোকের দরকার।—ওঃ, অনেক বাজে কথা বলে ফেল্লুম।

—না বাজে কথা নয়, খুব সত্যি কথাই ব'ল্লে পঞ্চমী। তোমার কথাই ঠিক, জাত ধ্বংসের পথে। যদি সত্যি করেই দেশে মানুষ গড়ে উঠত তাহলে এই গান্ধীবাদের ভেতোর দিয়েই তোমাদের লক্ষ্য পথে দেশ পৌঁছে যেতে পারত, উগ্রবাদের প্রয়োজন হত না। অনেক দুঃখে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।—যাক্ ওসব বাজে কথা থাক এখন। তা তুমি কী করছ এখন বল, শুনি?

—আমি কোলকাতার আশে পাশে ছোটোখাটো ফ্যাক্টরীতে যে সমস্ত মেয়ে মজুররা খাটে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করচি, Vital statistics বলতে পুরো যে সমস্ত জিনিস বোঝায় তা'ও সংগ্রহ করচি।

আর তাদের অভাব অভিযোগ শুনচি। এ কাজ নিয়েছি এই মাস খানেক হ'ল।

—থাক্ ভালই করেছ।—তা এঁরা দুজনে গেলেন কোথায়?

—Vendorএর খোঁজে। আমরা গাড়ী ফেল করে প্রায় দশটা থেকে এখানে বসে আছি। প্রদীপবাবু গিয়েছিলেন আমাদের আর এক কম্‌প্যানিয়নের খোঁজে, তিনি অণ্ডাল ইসটেসনের কাছাকাছিই থাকেন।

—তাহলে আমি এসে তোমাদের একটু বেকায়দায় ফেললুম মনে হচ্ছে।

—আরে না, না, তোমার সঙ্গে ত হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সত্যি, তোমাকে আজ বড্ড ভাল লাগচে পুষ্করদা'। আঃ, তুমি যদি আমাদের পার্টিতে এসে যোগ দিতে—দাও না?

—কিন্তু তাতে কী লাভ?

—পার্টির তরফ থেকে যথেষ্ট লাভ; তা ছাড়া আমার নিজের কথাটা বাদ দিচ্চ কেন? এস না, দেশের কাজ করি পুষ্করদা'—কংগ্রেসকে সাপর্ট ক'রো না।

—বাঃ, বেশ কথা বল্লে তো।

—না, সত্যি পুষ্করদা', তোমাকে কাছে পেলে এ কাজে আমি অনেক উৎসাহ পাবো।

—তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আমাকে বাদ দিয়ে এ কাজে তোমার তেমন উৎসাহ নেই।

—কী করে থাকতে পারে বল, তুমিই ত বলতে গেলে জোর করে ঠেলে আমাকে এ কাজে নামিয়েছ। ভেবে দেখো তো, আজ যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারতে আমায় তাহলে জীবনের গতি আমার অন্য পথে ঘুরে যেত। কেমন সরল স্বচ্ছ ছন্দে-ভরা জীবন হত আমাদের—এ ভূতের বোঝা বয়ে' আর বেড়াতে হ'ত না।

পুষ্কর একটু হাসিয়া বলিল, তা'হলে কী আমাকেও এই বোঝাটা বয়ে বেড়াবার জন্য দলে টেনে নেবার চেষ্টা করছ?

—তুমি এসে যোগ দিলে, এ বোঝা তখন আর ভূতের বোঝা নয়—তখন হ'ল কাজের আনন্দ। এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে তৈরী করে নোবো।

—বেশ তাই যদি হয়, তা'হলে তোমার বৌদি কী করে এ কাজে আনন্দ পাচ্ছেন? তিনি তো শুনেছি বিয়ের আগে থেকেই উগ্রপন্থী দলে ভিড়ে আছেন।

বৌদি যে তাহার দাদার জীবনের কতখানি অংশ দখল করিয়া আছে তাহা একমাত্র তাহার দাদাই তিলে তিলে অনুভব করিতেছে এবং সেই অনুভূতির ভিতর দিয়া তাহাদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মধুরিমাময় পটভূমিকাটি প্রতিনিয়তই যে কতদূর নির্লজ্জ ও নির্ম্মম ভঙ্গিমায় উপহসিত উপেক্ষিত ও কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে তাহারই একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া পঞ্চমী বলিল, বৌদির কথা বাদ দাও পুষ্করদা'। বৌদি বলে, আজ আমাদের সমাজে নারীপুরুষের সমান অধিকার, সুতরাং আজকের দিনে দাম্পত্য জীবনের প্রেম অনাবিষ্কৃত নয়। তার আসল রূপটা আজ ধরা পড়েচে তার স্বতন্ত্র সত্তার উদারতার ভেতোর দিয়ে। নিজেকে যাচাই করে দেখাই জীবনের বড় কাব্য, বড় দর্শন, বড় আনন্দ, সুতরাং পুরুষের স্বভাবধর্ম্মীয় নিষ্ঠুর মুরব্বিয়ানা আজকের দিনে ঘৃণার বস্তু!

পুষ্কর শান্ত কণ্ঠে বলিল, অতি সত্য কথা বলেছেন বৌদি, যেচে পায়ে শেকল পরা মেয়েদের ধর্ম্ম, তাদের স্বভাব, তাতেই তাদের আনন্দ অথচ তোমার বৌদি যে এই চিরাচরিত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে অসি ধারণ করে বসেছেন এটা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রেমের কঠোর এবং নিষ্কলুষ পরীক্ষা নারীপুরুষের উভয়ের শৃঙ্খলবিহীন সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। নিক্তির ওজনে আজ ভালবাসাকে মেপে নেওয়া চলে, এটা একটা বড় কম কথা নয় পঞ্চমী।

পঞ্চমী পরিহাসচ্ছলে মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিল, খুব যে বৌদির হয়ে, দেখো, ভয় হচ্ছে তোমাকে। যাক্‌গে, ও সব বাজে কথা এখন থাক।

—তা হলে কাজের কথা কোনটে?

—তোমার চেহারাটা আজ অদ্ভুত ভাবে সুন্দর দেখাচ্ছে।

—বাঃ, বেশ বল্লে, এটাই বুঝি কাজের কথা তোমার?

—শোনো, চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে এসো, বড্ড দূরে। একটা কথা বলব।

—কেন বেশ তো আছি, বল না কী বলবে শুনি।

—এখন কোথা থেকে আসছ বল তো?

—তোমরা যেখানে যা'চ্ছ আমি সেখান থেকে আসছি।

পঞ্চমী একটু অবাক্ হইয়া গেল। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, হেতমপুরে তোমার আবার কে আছে, হঠাৎ ওখানে যে?

—বেড়াতে গেছলাম।

—বাবা, এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ওখানে?

—খেয়াল হ'ল চলে এলুম।

অদ্ভুত খেয়াল তোমার দেখ'চি। তা' হঠাৎ এখানে আটকা পড়লে কী করে'? আমাদের মতো train ফেল করলে নাকি?

—না, না, কোলকাতার ট্রেনটা আগে বেরিয়ে গেছে, সেটার সঙ্গে আমাদের বগিটা জুড়ে দেওয়ার কথা ছিল, তা আর হল না, তাই বাধ্য হয়ে আটকা পড়লুম।

—সে কী! এরকম তো বড় একটা হয় না।

—আরে সেই কথাই তো station masterকে বলতে গেছলাম, শুনে তিনি তো মহা খাপ্পা। কিছুই ফল হল না। গাড়ী সান্টিংএ পড়ে আছে। তাই এখানে এসে বসে থাকব বলে মনে করেছি।

—যাক, তোমার সঙ্গে যোগাযোগটা হবে বলেই বোধ হয় এরকমটা ঘটেচে বলিয়া, উঠিয়া গিয়া পুষ্করের চেয়ারের ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর দুই শুভ্র সুকোমল করতল দ্বারা পুষ্করের মার্জিতশ্মশ্রু মসৃণ কপোলদ্বয় গভীর আবেশ ও উত্তেজনার সহিত মৃদুকঠিন স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিতে করিতে তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে একটা স্নিগ্ধোচ্ছল হাসির রেখা টানিয়া বলিল, তোমাকে আজ বড্ড ভাল লাগছে পুষ্করদা'! কী সুন্দর চেহারাটা তোমার! তুমি এসো আমাদের দলে চলে এসো, কী হবে ছাই কংগ্রেস করে'। এসো, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে উগ্রপন্থী দলে যোগ দাও।

পুষ্কর জড়ের মতো হইয়া হাসিয়া বলিল, বেশ কথাই বললে।

—কেন, ঠিক বলি নি? বলিতে বলিতে পুষ্করের সমস্ত মুখখানা গভীর উচ্ছ্বাসের সহিত নিজের বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার বলিয়া উঠিল, পুষ্করদা! পুষ্করদা'! আমার চোখের দিকে একটি বার তাকিয়ে দেখো, তাকিয়ে দেখো একটি বার।

পুষ্কর অভিভূতের মতো তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আঃ, এ কি করছ পঞ্চমী? আশ্চর্য তোমার এতটুকু লজ্জা নেই। ছি ছি ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! লোকে দেখলে কী বলবে বল তো? ছেলে-মানুষী করছ।

—বলুক্‌গে।

—আ! কী যে কর! বৌদিকেও তোমার এতটুকুও ভয় নেই দেখচি!

পঞ্চমী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, হুঁ, বৌদির কথা আর না বলাই ভাল। ওঠো বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি। চা আর আসবে না।

—তবুও ভাল, ঘরের মধ্যে বসে থাকার চেয়ে। কিন্তু এত চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন হঠাৎ। বসো না একটু সময়, একটু কথা বলি ততক্ষণ।

—না ঘরের মধ্যে বসে কথা হয় না। তুমি ভয়ঙ্কর frigid, অথচ কোনো অন্যায় তো তুমি করচ না।

—তোমার মতো চঞ্চল হয়ে ওঠা আমার পক্ষে কত যে শক্ত তা তুমি বুঝবে না পঞ্চমী, তাই আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ছিঃ, এ কি হচ্ছে!

—পঞ্চমী এইবার যেন আরও বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়া তাহার ডান হাতখানা নিজের ডান মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইয়া একটা মৃদু হেঁচকা টান দিয়া বলিয়া উঠিল, চল, ওঠো, বাইরে যাই তা না হলে বুঝতে পারছি তুমি অজড় হতে পারছ না—কেমন যেন কূর্ম্মভাব এসে গেছে তোমার মধ্যে।

—আমি যে বরাবরই একটু shy সে তো তুমি জান।

—জানি; কিন্তু এ জিনিসটা যে তোমায় বড় বেশী রকম পেয়ে বসেচে। সত্যি, আজ তোমাকে কেমন কবি কবি মনে হচ্ছে, যা বল্লে বৌদিও। খদ্দরের ধুতি আর চুড়িদার পাঞ্জাবিতে মন্দ দেখায় না তো।

না, তুমি দেখছি অসম্ভব রকম দুর্বল করে দেবে আমায়। একটু সুস্থির হয়ে বস না কেন!

—আমি বস'বো না, তুমি উঠে বাইরে চল। নির্জন জায়গায় নীরব রাতের রূপটা একবার চোখে দেখে আসি চল, বলিয়াই, তাহাকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়াই, তড়িৎপ্রভার ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত পুষ্করের বিহ্বল বিভ্রান্ত শান্ত দেহটাকে প্রগাঢ় আসক্তিতে নিজের তনু দেহটির মধ্যে টানিয়া লইয়া এক রকম উন্মাদনার সহিত তাহাকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে

বাহির হইয়া আসিল।

আসিয়াই বলিয়া উঠিল, এবার ত আর লজ্জা নেই. এখন ত ইচ্ছে হলে প্রাণ খুলে কথা বলতে পার।

পুষ্কর একেবারেই হতভম্ব! সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন আপনা হইতেই একটা প্রাকৃতিক চির-সত্য-ঘটনের মতই সরল শান্তভাবে ঘটিয়া গেল; অথচ ইহার একবিন্দুও সে কল্পনাও করে নাই বা করিবার মত অবসরও পায় নাই। পুরুষ প্রকৃতি নারী প্রকৃতির কাছে কত যে দুর্বল, কত অসহায়, কত নির্বোধ, কত আত্মঘাতী তাহা আজ সে নিজের মধ্যে তিলে তিলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ফেলিল। কিন্তু তথাপি সে যে কোমল হইয়াও কঠিন, অধীর হইয়াও শান্ত—এই উপলব্ধিটাই তাহাকে একদিক দিয়া যেমন বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল তেমন আবার অন্যদিক হইতে একটা অমোঘ মুক্তির পথনির্দ্দেশও করিয়া দিল। সে একটু হাসিয়া ফেলিল। তারপর তরল তমসলিপ্ত বোবা আকাশটার পানে শূন্য দৃষ্টি ফেলিয়া ক্ষণকালের জন্য তাকাইয়া মনে মনে কত কথাই না ভাবিতে লাগিল। পঞ্চমী বলিল, কী, অমন করে ফাঁকা আকাশটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছ কেন? আশ্চর্য! তুমি এত লাজুক!

—না এতটুকুও লাজুক নয়। আজকের এই তারা ভরা আকাশটাকে ভারী ভাল লাগছে তাই তাকিয়ে দেখছিলুম। দুদিন আগে ঠিক এইভাবে আকাশ-টাকে দেখছিলাম।

—তা' যা' বলেছ, সত্যি। কী অপূর্ব দৃশ্য—তারাগুলো যেন তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করবে বলে আকাশের বুক জড়িয়ে পড়ে আছে।

—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলুম।

—ওঃ, দ্যাখো তাহলে, আমরা দুজনে নিশ্চয়ই একই কল্পনা শক্তি নিয়ে জন্মেছি। আজ শিউড়ির কথাটাই মনে পড়ে।

—তা নয় পঞ্চমী, তা নয়। এটা কী জান, এটা হল প্রত্যেক মানুষের স্বভাবধর্ম্ম। আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃতির কোলে মানুষ, তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ আছে, তাই সময় সময় আমরা তাকে অত্যধিক ভালবেসে ফেলি, সেই ভালবাসাটা আবার গভীরতম হয়ে ওঠে এক এক সময় যখন আমাদের প্রেমাস্পদকে আমরা অতি নিকটে পাই অথবা তার

বিরহে, তার কথা মনে হওয়াতে আমাদের মন ব্যথায় ভরে ওঠে ; আবার তখন মানুষের চেয়ে প্রকৃতিকে আমরা বেশী করে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করি। কী বল তাই তো ?

—সত্যি তুমি কী সুন্দর কথা বলতে পার। আচ্ছা পুষ্করদা, বলতে পার আমাদের এই দু' দিনের জীবনে সবচেয়ে মধুর জিনিস কোনটি ?

—তুমিই বল।

—চল, আর একটু এগিয়ে যাই।

—আর না এগিয়ে বরং চল ঘরে গিয়ে বসে বসে,কথা বলা যাক।

—তা হলে ফেরাই যাক চল। বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবাবেগের সঙ্গে পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, আমাদের এই দু'দিনের হাসা কাঁদার, আসা যাওয়ার জীবনে শুধু একটা কথাই সত্য পুষ্করদা,—ভালবাসা ! আমরা দু'জনেই যে কত অনাদি কালের, কত কোটি কোটি আলো-বছরের ধ্যানের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছি তা তুমিও জান না, আমিও জানি না। আবার দু'জনে সেই অনাদিকালের ধ্যানের মধ্যেই মিলিয়ে যাবো, আমরা দু'জনে কেউ কাউকেই চিনি না, জানি না ; আবার এই দেহ পরিবর্ত্তনের পর হয়ত ভুলেও যাব ঠিক দু' জনে দু' জনকেই ; কিন্তু কী অপূর্ব। মনে হয় তোমাতে আমাতে যেন কতকালের জানাশুনো, যেন দু'দিন আমরা এই পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছি, আবার বেড়ান শেষ করে ফিরে চলে যাব। আমরা কেউ কাউকে কোনদিনও ভুলে থাকতে পারবো না। তাই গীতার কথাটাই বার বার আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়,—নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। যা ছিল না, তা কখনই নেই, যা আছে তার বিনাশ নেই। এই প্রেম সত্য, আত্মার মতোই সত্য, নিত্য, অবিনশ্বর—আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে, এর কোনও দিনও বিনাশ নেই। বল, বল, ঠিক বলিনি।

প্ল্যাটফরমের স্তিমিত আলোকে পুষ্করের মুখখানা সহসা নির্মল নির্লিপ্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; ধীরকণ্ঠে সে বলিল, সত্যি অদ্ভুত কথা বলেছ তুমি পঞ্চমী। আমার আমিত্বের সম্পূর্ণ অনুভব, তার স্থিতি, তার দর্শন, তার অভিব্যক্তি শুধু যেন ঐ একটা আনন্দময় সফলতার মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে। মানুষ পৃথিবীতে যেন শুধু বেঁচে থাকতেই আসেনি, এসেছে ভালবাসা পেতে ও বিলোতে, তাই ব্যর্থতাই জীবনের সব চেয়ে বড় এবং অসহনীয় আঘাত।

কী বল, তাই নয় কী ?

—চমৎকার বললে। আচ্ছা পুষ্করদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? বলিয়া পঞ্চমী চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—তুমি আমায় সেদিন ও ভাবে অপমান করলে কেন বলতো ঐ মেয়েটির সামনে ? আমার মনে সেদিন তুমি বড্ড দুঃখ দিয়েছো। বলিতে বলিতে তাহার বাঁ হাতখানা নিজের ডান বগলের মধ্যে শান্তভাবে টানিয়া লইয়া হাঁটিতে লাগিল।

—এটা তোমার ভুল ধারণা পঞ্চমী বরং তুমিই সেদিন সে মেয়েটির মনে এমন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিলে যে, ঐ কথা শোনার পর সে আর একদণ্ডও সেখানে দাঁড়াতে পারল না। একবার চিন্তা করে দেখ ত'।

অকস্মাৎ পঞ্চমীর মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন বনানীর মতো পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। এত বড় একটা আঘাত সে কখনই মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতে পারিল না। ভিতরে ভিতরে রীতিমতো একটা কল্পনাতীত হৃদয়হীন পক্ষপাতিত্বের নিষ্ঠুর আঘাত অনুভব করিতে লাগিল, বুকের ভিতর কে যেন তাহার একটা বিষাক্ত সূচ্যগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিল। মুখ দিয়া যেন কোনও কথা বাহির হইতে চায় না, তবুও ইহার একটা কঠিন প্রত্যুত্তর না দিয়াই বা সে কী করিয়া চুপ করিয়া থাকে ? ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একথা তুমি বলতে পারলে পুষ্করদা ?

—দাঁড়াও, excited হয়ো না পঞ্চমী। ঐ স্কার্ফটা নিয়ে তুমি যা করলে না সেদিন, ছিঃ আমার নিজেরই অত্যন্ত লজ্জা করছিল। একটা বাচ্চা ছেলে শীতে হি হি করে কাঁপচে আর তুমি তখন ঐ রকম একটা কাণ্ড করে বসলে, বলিয়া তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে শান্তকণ্ঠে বলিল, অবশ্য আমি কোনো কিছু mean করে বলিনি, কথাটা তুললে বলেই বললুম, তা না হলে কখনই বলতুম না, জানি তুমি মনে ব্যথা পেতে তাতে। কিছু মনে ক'রো না পঞ্চমী। মনে করলে নাকি ? ও কী অমন করছ কেন ? ছিঃ একি কেঁদে ফেল্‌লে তুমি !

পঞ্চমীর কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হইয়া আসিল। ছল ছল চোখে পুষ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, অবশ্য জান না কিছু mean করেছ কিনা !

কিন্তু একটা জিনিস তুমি তো ভেবে দেখলে না, পুষ্করদা।

ভেবে দেখেছি বৈকি, নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছি পঞ্চমী।

কী ভেবে দেখেছ বল ত?

আমার জন্ম সেদিন তোমার উৎকণ্ঠা বেশী ছিল।

—তাই যদি বুঝে থাক তবে এমন দাগা দিয়ে কথা বল কেন? অনুরাগ যে মানুষকে অন্ধ ক'রে, স্বার্থপর ক'রে তোলে; সেটা কি তুমি জান না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

জানি পঞ্চমী জানি। তবে একটা কথা কী জান, ভালবাসা অন্ধ হলেও তা' অনুদার, নিষ্ঠুর হবে কেন! তুমি সেদিন নিজেকে এমনভাবে ছোটো ক'রে ফেল্‌লে যে আমার নিজেরই তখন তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছিল, বলিয়া তাহার জলভরা চোখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওকি! ছিঃ আশ্চর্য সামান্য এই একটা কথায় তুমি এখনো কাঁদছো! তুমি এত touchy, এত weak তুমি! সত্যি যদি জানতুম যে তুমি নিজের সম্বন্ধে এতটা সচেতন, তা'হলে নিশ্চয়ই কথনো এভাবে কথা বলতুম না। ছিঃ কাঁদতে নেই পঞ্চমী!

পঞ্চমীর সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; এবং সেই সঙ্গে সে এমন বিশ্রীভাবে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, এক জঘন্য উন্মাদনার সহিত এক নাটকীয় ভঙ্গীতে সে যেন জগতের প্রত্যেকটি নারী প্রকৃতির হিংস্র রূপটাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্লজ্জের মতো প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ক্ষিপ্রহস্তে রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, দরকার হলে তোমার জন্যে আমি যে কোনো মানুষকে খুন পর্যন্ত করতে পারি! অতি তুচ্ছ তো ঐ স্কার্ফের ব্যাপারটা! ও ছেলেটা আমার কে? ও আমার কেউ নয়! কেউ নয়! কেন আমি ওর জন্য দরদ দেখাতে যাব! বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া আবার টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পুষ্কর ঠিক ততটা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে সামান্য ঐ একটা কথাতেই পঞ্চমী নিজেকে এতদূর হীন নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করিয়াও তাহার নির্মল নারী প্রকৃতিকে এত সুন্দরভাবে অকপট ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিবে। সত্যই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু এ মোহ ত সে মোহ নয়, ইহা অন্ধও নয়। ইহা

চক্ষুষ্মান্ হইয়াও নিজেকে অটল করিয়া রাখিল—ধাতু গলিয়া গিয়াও যেন আবার কঠিন পিণ্ড হইয়া উঠিল। তবুও তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া নিস্পৃহতার সহিত তাহার পিঠের উপর একটা মৃদু করাঘাত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ কী, এ কী করচ পঞ্চমী। ছিঃ একটা scene create ক'রে ফেল্‌লে দেখচি। চল, চল, এগিয়ে যাওয়া যাক, বলিয়া সে দ্রুত পদবিক্ষেপে ওয়েটিং রুমের দিকে হাঁটিয়া চলিল। করুণ রসের অভিনয় যেন শেষ হইয়া গেল। পঞ্চমী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, শোনো, শোনো যাচ্ছ কোথায়? একটু দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও। ভয় কিসের শুনি? কাউকেই গ্রাহ্য করি না। দাঁড়িয়ে যাও আর একটু।

পাছে আবার একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসে এই ভয় করিয়া পুষ্কর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পঞ্চমী লঘুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে যে ছেলেটাকে এনেছ, ওটা কে বল তো? দেখে একটু সন্দেহ হচ্ছে। সেই ছেলেটা না? কী রকম মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়েছিল. অতটা খেয়াল করতে পারিনি।

—হ্যাঁ ঠিক ধরেচ, সেই ছেলেটিই।

পঞ্চমীর মুখের উপর দিয়া যেন আবার একটা কালো ছায়া পড়িয়া গেল। দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বলি এটিকে পেলে কোথা থেকে?

—আসচি তো এদেরই বাড়ী থেকে। বেড়াতে গিয়েছিলাম, বলিয়া এমনি একটা ভঙ্গী করিয়া হাসিল যেন যাওয়ার তাহার এতটুকুও গরজ ছিল না শুধু উপরোধ এড়াইয়া যাইতে না পারিয়াই যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

—ও বুঝেচি! বুঝেচি! থাক, থাক, আর লুক'তে যেয়ো না! যথেষ্ট হয়েচে। উঃ! তুমি কী নিষ্ঠুর! কী পাষাণ তুমি! এর থেকে আমায় খুন করে ফেলো, আমায় মেরে ফেল পুষ্করদা! আমি ম'রব! আমি ম'রব! বলিতে বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থির পদবিক্ষেপে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ওয়েটিং রুমের দিকে না গিয়া অন্ধকারে অন্য পথে চলিয়া গেল।

চব্বিশ

সমগ্র উগ্রপন্থীদের মহামিলন; সত্যই, বড়ই বিস্ময়কর, বড়ই বিচিত্র ব্যাপার;

তবুও ত মিলন। কিন্তু এ মিলন ত সে মিলন নয়। ইহা যেন পরম আত্মীয়ের বিয়োগে আত্মীয়গণের শোকোচ্ছ্বাসের মিলন, অথবা পিতা বা মাতার মৃত্যুতে বিবদমান বিচ্ছিন্ন ভ্রাতাগণের মধ্যে গলা জড়াজড়ি করিয়া কান্নাকাটি করিবার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গত আত্মার শান্তি ও মুক্তির উদ্দেশ্যে মিলন। অথবা, এ মিলন যেন নৌকাডুবি যাত্রিগণের করুণ আর্ত্তনাদ ও ত্রাহি ত্রাহি চীৎকারের ভিতর দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত মিলন; অথবা, এ মিলন যেন প্লাবনের মধ্যে বুভুক্ষু বন্যাপীড়িতদের হাহুতাশের মিলন। যাক্, তবুও যে উগ্রপন্থিগণ পাকে পড়িয়া মিলিত হইবার জন্য এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত। আজ প্রত্যেকেরই মুখে উল্লাসের হাসি ও হৃদয়ে অফুরন্ত আবেগ ও অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজ প্রত্যেকেরই মুখে আসন্ন নির্ব্বাচনে উগ্রপন্থীদের বিপুল ভোটে বিজয়াশংসের ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্ম্মান্তিক ও হাস্যকর পরাজয়ের ঘোর আশঙ্কার অতিরঞ্জিত কাহিনী শোনা যাইতেছে; এবং সভার আড়ম্বর ও সভ্যগণের ও মোড়লদের কর্ম্মব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া সকলেরই মনে এই ধারণাই পাকা হইয়া উঠিয়াছে যে এবারকার নির্ব্বাচনে কংগ্রেস একেবারে হারিয়া ঢোল হইয়া যাইবে। বস্তুত, দেখাও যাইতেছে তা'ই—হাওয়াটাও সেই দিকে। তা'ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এটাও দেখা যাইতেছে যে, ইহার সমর্থকদের সংখ্যা যেমন লঘু তেমন কর্ম্মীরও অভাব। তবে কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র ভরসা এই যে, ইহার ঐতিহ্য, ইহার স্থায়িত্বের মর্য্যাদা ও একনিষ্ঠা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় অধিকাংশ দেশবাসীরই হৃদয়কে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

সভার প্রথম দিনের অধিবেশন সকাল আটটা হইতে আরম্ভ হয়; বেলা বারোটা পর্যন্ত চলে; তার পরে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হইয়া আসে। ভোজন-কালের কিছুক্ষণ আগে মণিশঙ্কর আসিয়া বন্ধুকে একটু ফাঁকা জায়গায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ত্যাখ্, দেখলি ত, কৈ এল তো না। বলেছিলাম না যে, ও মেয়ে বড় সাংঘাতিক মেয়ে। যাক্, ভালই হয়েচে।

বন্ধু নিস্পৃহতার সহিত মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, না এসেছে দরকার নেই। অবশ্য আমাদের এতে এতটুকু ক্ষতি নেই, ও তো আর কংগ্রেসের হয়ে কাজ করচে না।

বঙ্কু মনে মনে তবুও যেন আশা রাখে এবং শুধু তাহাই নয়, তাহার এখনো দৃঢ় বিশ্বাস কলি কথনই তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না—শুধু শুধুই পরের কান ভাঙানি ও লাগানিতে বিশ্বাস করিয়া সে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটা কথা এই, তাহার নিজের সে রাত্রের ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সে নিশ্চয়ই নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং সেই কারণেই, অভিমান করিয়া, আজিকার এই সভায় আসে নাই। ভাবিতে ভাবিতে অনুতাপে তাহার বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করিয়া উঠিতে লাগিল, তত্রাচ নিজেকে সে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, বলা যায় না মণিদা, করতেও পারে; তবে একটা জিনিস ওর মধ্যে আমি কী লক্ষ্য করেচি জান, ও চায় শুধু কাজ, আর কিছু নয়—কাজ—সত্যিকার—পেশাদারী নয়,—সমাজসেবা, সুতরাং কংগ্রেসের ওপর খুব একটা টান নেই ওর। এটা অবশ্য আমার নিজের ধারণা—ভুলও হতে পারে। তুমি ভুবনদা'র সঙ্গে কাজ করেছ সেটা তুমিই বলতে পার।

মণিশঙ্কর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিল, ও মেয়ে বড় সাংঘাতিক মেয়ে; আমাদের দলে না এসে মঙ্গল হয়েছে, এখানকার কথা ওখানে ফাঁস করে দিত'। দরকার নেই ওর থেকে ভাল কর্মী আমরা পেয়েছি।

বঙ্কুর বুকখানা ভাঙ্গিয়া যায়। তবুও হাসিমুখেই তাহাকে বলিতে হইল, পেয়ে থাকলে ত ভালই। কিন্তু কৈ সে রকম মেয়ে কৈ?

আচ্ছা তাহলে এসো, আলাপ করিয়ে দি তোমার সঙ্গে, বলিয়া তাহাকে—পঞ্চমী একটু দূরেই দাঁড়াইয়াছিল—তাহার কাছে লইয়া গিয়া তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, এঁরই কথা বলছিলুম তোমায় বুঝলে, এনারই নাম পঞ্চমী গাঙ্গুলি।

পঞ্চমী তাহার লঘু দেহটী একটু নত করিয়া জোড় হাত করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কথা অনেক আগেই শুনেছি।

বঙ্কুও একটু হাসিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার কাছে শুনলেন?

প্রদীপবাবুর কাছ থেকে।

—ও, প্রদীপবাবুর কাছ থেকে। হুঁ, প্রদীপবাবুও সেদিন বলছিলেন বটে আমরা সম্প্রতি দু' একটি ভাল ওয়ারকার পেয়েছি। এখন বুঝছি, বোধ হয় আপনাদের কথাই বলছিলেন।

মণিশঙ্কর বলিল, ইনি কে জানিস্ ত'? আমাদের দেবকুমারের বোন্।
দেবকুমারকে চিনতে পারলি তো?

—না, ঠিক ধরতে পারচি না ত'।

—আরে আমাদের অশ্রুজিতবাবুর ভাইয়ের শালা, ইরিগেসন্ অফিসার, এখন সিউড়িতে আছে।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝেছি বুঝেছি। তিনি ত একজন পুরো কংগ্রেসী।
অশ্রুজিতবাবুও তো কংগ্রেস ভক্ত।

পঞ্চমী বলিল, আবার আমার বৌদি কিন্তু পুরো উগ্রপন্থী জানেন ত'?

—আপনার বৌদি? কে বলুন ত?

মণিশঙ্কর বলিল, আরে মিসেস্ শ্রুতি গাঙ্গুলীর কথা বলছেন। প্রদীপবাবুর সঙ্গে যাঁকে দেখলে।

—ও, উনিই দেবকুমারবাবুর স্ত্রী! ওনার সঙ্গে একটু আগেই তো আলাপ হল। শুনেছি উনি নাকি ভাল বলতে কইতে পারেন।

পঞ্চমী বলিল, তা পারেন। ঐ বৌদির কাছেই ত আমার হাতে-খড়ি।
দাদা তো এইজন্তেই আমার ওপর ভীষণ খাপ্পা।

বঙ্কু বলিল, এটা কিন্তু দেবকুমারবাবুর অন্যায়। না না, পলিটিক্স করতে গেলে উগ্রবাদ ছাড়া পলিটিক্স করাই উচিত নয়। দেবকুমারবাবু বোধ হয় আপনাকে কংগ্রেসে ভেড়াতে চান, না?

মণিশঙ্কর বলিল, আরে ঐ নিয়েই ত এনার দাদার সঙ্গে বৌদির রোজই খচাখচি।

—না, না, আপনি ঠিকই করেচেন। সত্যি আপনার মতো একজন সত্যিকারের কর্মী পেলে আমরা আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতুম।

মণিশঙ্কর বলিল, সত্যি আমি তাই ভাবছিলাম আপনি যদি আমাদের এখানে এসে আমাদের কাজে দু'চার দিন সাহায্য করে যান তাহলে অনেক উপকার হতে পারে। ভাল ওয়ারকার পাচ্ছি না আমরা।

—কেন আপনারা ত একজন ভাল কর্মী পেয়েছেন, শুনেচি।

কথাটা বঙ্কুর বুকের ভিতরটায় যেন বিষের প্রলেপ লাগাইয়া দিল। সে যেন একটু কেমন হইয়া গেল। তবুও মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শক্ত করিয়া

লইল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কোনো কথাই বাহির হইল না।

মণিশঙ্কর বলিল, পেয়েছিলাম কিন্তু তার ওপর আর আমাদের এতটুকুও বিশ্বাস নেই।

—কেন, তিনি এমন কী করলেন?

মণিশঙ্কর বলিল, সে যে দু'দলেই থাকতে চায় কিনা তাই।

—তা আগে সেটা বুঝতে পারেন নি বুঝি?

বঙ্কু বলিল, কী করে বুঝবো বলুন, যাকে ছোটোবেলা থেকে জানি, যার সঙ্গে দিনের পর দিন ধরে পলিটিক্স করেচি সে যে এ ভাবে সরে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত, সেটা বুঝতেই পারিনি। অথচ মজা এমন কংগ্রেসের হয়ে সে এতটুকুও কাজ করচে না। অথচ আবার কংগ্রেসকে অস্বীকারও করছে না।

পঞ্চমী বলিল, তা আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিন না, দেখিনা তিনি কী বলেন।

বঙ্কু বলিল, বড় শক্ত মেয়ে তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারবেন না।

—চেষ্টা করতে দোষটা কী। অনেক কংগ্রেসীকেই ত ঘায়েল করলুম।

বঙ্কুর বুকের ভিতরটা আবার যেন কাঁদিয়া উঠিল—এমন কথা শুনিবার জন্য সে তো প্রস্তুত হয় নাই। যাহাকে তাহার মত লোকও বুঝাইয়া দলে টানিয়া আনিতে পারে নাই তাহাকে এ হেন লঘু প্রকৃতি তরুণী যে কোন মায়াছলে রাতারাতি উগ্রপন্থী করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। তবুও মনে মনে ভাবিল, আর যাহাই হউক না কেন, কলি কিছু না করিয়া ও যদি আজিকার এই সভায় শুধু একটিবার আসিয়া চলিয়াও যাইত তাহাতেও তাহার শান্তি ছিল, উৎসাহও আসিত, তাহাকে ইহাদের সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াও মনে মনে সে কত গর্ব, কত আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু আজ সে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—তাহার সঙ্গে সব কিছু সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া সে তো একরকম চিরদিনের মতো বিদায় লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে আর ত সে আসিবে না। নিদারুণ অনুশোচনায় তাহার বুকের ভিতরটা যে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইতে লাগিল,—নাঃ, সে একটা মস্ত বড় ভুল করিয়াছে—এ ভুল আর বোধ হয় জীবনেও সে করিবে না—সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তাহার সহিত ঐ ভাবে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার পক্ষে নিতান্তই

নির্বোধের কাজ হইয়াছে। যাহাই হোক, পঞ্চমীর একথাটা তাহার এতটুকুও ভাল লাগিল না, তবুও ভাল লাগিতেই হইল, উপায় যে নাই। তাই একটা নিস্পৃহ হাসি হাসিয়া বঙ্কু বলিল, কোনো ফল হবে না। দরকারই বা কী!

নারীকে শুধু একটা রক্তমাংসের সুন্দরতার প্রতীক বলিলেও যেন তার সব কিছুই বলা হয় না। সে যে পুরুষ হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে অণু পরামাণুতে ভাগ করিয়া করিয়া তাহার মূল সত্তাটিকে সমীক্ষা করিয়া দেখিবারও একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিশেষ ইহা বলিলেও বোধ হয় মনস্তাত্ত্বিক অঙ্ক সমীক্ষায় ভুল হইবে না। পঞ্চমী বঙ্কুর ঐ ভাবে কথা কহিবার সুর হইতেই বুঝিয়া ফেলিল তাহার ব্যথা কোথায়; কিন্তু নিজেকে সে কিছুতেই ধরা দিল না, শুধু এই কথাটাই বলিল, তবুও তাঁকে পেলে ভালই হ'ত। হাজার হলেও তিনি এখানকার মাটি জলের সঙ্গে মিশে আছেন, তাঁর মূল্য আমার থেকে অনেক বেশী।

মণিশঙ্কর রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, না না, মিস্ গাঙ্গুলী আপনি তাকে জানেন না বলেই একথা বলচেন, যদি জানতেন তাহলে আপনি আমাদের আগে থেকেই সাবধান করে দিতেন। বরং, আপনি আমাদের মধ্যে এসে কয়েক দিন গ্রামের মধ্যে কাজ করুন।

বঙ্কু বলিল, মণিদা' ঠিকই বলেচে মিস্ গাঙ্গুলী, তাকে আর আমাদের দরকার নেই। আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয় ত', এখানে এসে একটা মাস অন্ততঃ আমাদের কাজে যদি একটু সাহায্য করেন?

পঞ্চমী শুধু একটু হাসিল!

মিসেস্ গাঙ্গুলী একটু দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ ধরিয়া বিলয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। আগাইয়া আসিয়া বঙ্কুর মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, হাওয়াটা খুব ভাল বলেই মনে হচ্চে, যথেষ্ট কাজ করেচেন।

বঙ্কু বলিল, না না, কী আর এমন কাজ করেচি। কাজ ত' এখন থেকেই সুরু হবে। আপনাদের মত দু'চার জন কর্মী পেলে আর আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। তারপর আপনার এই ঠাকুরঝি, এনার সম্বন্ধে সব কিছুই শুনলুম, আপনার কথাও শুনলুম। এ ছাড়া প্রদীপবাবু ত' আছেনই।

মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিলেন, জানি না মিঃ ব্যানার্জি আমরা আপনার কাজে

কতখানি কী রকম সাহায্য করতে পারব, তবে বিজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে যা' বুঝলুম, ভুবনবাবু, অর্থাৎ কংগ্রেস খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। আজ আমাদের আর কোনো সন্দেহ নেই, আমরা জিতবই! আজকের দিনের এই যে উগ্রপন্থী ঐক্য, এই যে পরস্পরের দোষ ত্রুটি ভুলে গিয়ে আমরা মিলিত হ'তে পেরেছি এটা কম কথা নয়! এই ইলেকসনে ভুবনবাবুকে আমরা একেবারেই মাথা তুলতে দ'বো না! বলিতে বলিতে তাঁহার রক্ত যেন ক্রমশই গরম হইয়া উঠিতে লাগিল, বিপুল আবেগের সঙ্গে তিনি আবার দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কংগ্রেসকে আমাদের defeat দিতেই হবে। আজ যে আন্দোলন আমরা গড়ে তুলেচি এবং যে আন্দোলনের ফলে গণচেতনা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, সেই আন্দোলন আমাদের চলমান শক্তি এবং সেই শক্তিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র যা দিয়ে আমরা কংগ্রেসকে ঘায়েল করবো, এটা আপনি জেনে রাখুন বঙ্কুবাবু।

কথাগুলি বঙ্কুর ভারী ভাল লাগিল। সে হাসিয়া উঠিল। মণিশঙ্করও হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আরে ঐ দেখে শুনেই ত আগে থেকেই সরে পড়লুম। স্রেফ্ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। যত চোর পুষচে।

পঞ্চমী বলিল, ভালই তো হচ্চে। এক দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এতে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হচ্চে না কিছুই। এই করে করেই ত' কংগ্রেসের ওপর জনসাধারণের ঘৃণা এসে যাবে, যাচ্চেও। 'জার' যদি অতটা অত্যাচার না ক'রত, তা হলেই রাশিয়ায় দুঃখটা মানুষের গা সওয়া হয়ে যেত, আজকের দিনে যা হচ্চে আমাদের দেশে। যাক্, ওসব কথা এখন থাক। আমরা চাই কাজ আর কিছু নয়, আমরা চাই কংগ্রেসের defeat! এই হল সার কথা।

মণিশঙ্করের আর সময় নাই; সে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না, হাতে অনেক কাজ। বলিল, চল্লুম, এবার এঁদের সঙ্গে কথা বল বঙ্কু আমি আসি। বলিয়া মণিশঙ্কর অন্যত্র চলিয়া গেল।

মিসেস্ গাঙ্গুলী আবার সুরু করিলেন, সত্যি আপনি অদ্ভুত কাজ করেচেন বঙ্কুবাবু—এটা একটা পাবলিক মিটিং নয় অথচ কী লোকই হয়েচে। আশ্চর্য আপনি এত সুন্দরভাবে অরগ্যানিজেসন্ তৈরী করেচেন, ভাবতেও পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমীও বলিয়া উঠিল, আমি ত অবাক! সত্যি, এ আপনি কী করেচেন। একটা লোকও কেউ কংগ্রেসের হয়ে কথা বলচে না, আশ্চর্য! সত্যি, আপনার ক্ষমতা আছে বটে। না, আপনার কৃতিত্ব আছে বন্ধুবাবু। মনে মনে বলিয়া উঠিল, আশ্চর্য মেয়েটা রত্ন চিনল না।

এ কী? এ যে আবার কলির কথা মনে করাইয়া দেয়। এতক্ষণ সে তো তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। কলিও ত একদিন ঠিক এই রকমই বলিয়াছিল, বন্ধুদা তোমার মধ্যে জিনিস আছে,—you are a misguide intellect! কিন্তু আজ এ কী হইল, পঞ্চমীর কথার ভিতর দিয়াও যে সেই একই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিস্ময় লাগে! প্রশ্ন জাগে, নারীপ্রকৃতি কী এমনি করিয়াই পুরুষের মনীষাকে শ্রদ্ধা দিয়া আসে? যাক, সে কথা বিচার করিয়া দেখিবার সময় এখন নয়। হঠাৎ সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল; সে-ঘোরটা চট করিয়া কাটিয়াও গেল। হাসিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না, মিস্ গাঙ্গুলী। এটা আমার একার চেষ্টায় কখনো সম্ভব হয়নি, যারা আমাদের এই পার্টিকে ভালবাসে এ কাজ শুধু তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আমি কে? আমি ত—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"—বলিয়া বন্ধু নিজেকে অনেকটা হালকা করিয়া লইল।

পঞ্চমী বলিল, না, না এটা আপনি বিনয় করচেন। বীজ মাটিকে আঁকড়ে থাকে; তার অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার শক্তি ঐখানেই নিহিত। শূন্যে তার কোনো বিকাশ নেই। আপনাকে আঁকড়ে ধরেই গণশক্তি পরিপুষ্টি লাভ করছে, এ কথা মানতেই হবে। মানুষ তার নিজের ধ্যানকে, তার ধারণাকে স্বচক্ষে কখনো দেখতে পায় না; কিন্তু পায়, যখন বিশ্বমানবের মনের মুকুরের সুমুখে যেয়ে সে দাঁড়ায়। আজ এখানকার প্রতিটি অবহেলিত, নিপীড়িত নরনারীর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং পুঞ্জীভূত শক্তির দর্পণের মধ্যে দিয়েই আপনার এই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের তেজোময় মূর্ত্তিটা যেন জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে উঠছে। লেনিন মরে' গেছে; কিন্তু, তার জীবনের আদর্শটা আজও যেন রাশিয়ার প্রতিটি নারী-পুরুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে, চিন্তাধারার ভেতোর দিয়ে, প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে।

জীবনের চলার পথের পরীক্ষা বন্ধুর যেন আজও শেষ হয় নাই। এ যেন কোন্ এক অদৃশ্য মায়াবিনী শক্তি পুনর্বার তাহার ক্ষুব্ধ মনের নিভৃত নিকুঞ্জের

তরুচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া তাহাকে-নিবিড় আশ্লেষের সঙ্গে কাছে টানিয়া লইয়া বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, কী অদ্ভুত! কী অপূর্ব! বাঃ, বেশ মেয়েটি ত! হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্কও হইয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া মিসেস্ গাঙ্গুলীর দিকে মুখটা ফিরাইয়া স্মিত-মুখে বলিল, আপনার ঠাকুরঝির কথাটা শুনলেন?

মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিলেন, শুনলুম তো, কিছু ত বাড়িয়ে বলে নি। যা দেখছি এখানে এসে তার পরে আর আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু অত্যুক্তি করা হয় নি। সত্যি করেই আপনি কংগ্রেসের কবর তৈরী করেচেন।

—সে কথা জোর করে বলতে পারি না, নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিলেন, সে কথা যা বলেচেন, কোনো লোকটাই সত্যি কথা বলে না।

পঞ্চমী বলিল, অবশ্য আমার চোখের সামনে আমি যা দেখছি তাতে করে' মনে হয় কংগ্রেস রীতিমতো হেরে যাবে, বঙ্কুবাবু। এই সব গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে মনে হয়, এরা আপনাদের কখনো প্রতারণা করবে না। এরা আপনাকে সত্যি করেই ভালবাসে। দুই একদিন কাজে নামলেই অবশ্য বুঝতে পারবো। আমি এই conference শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দিনের জন্য কোলকাতায় যাব, আবার ফিরে আসবো। যাক্—আজ এই পর্যন্তই থাক। এখন, আসি আমরা।

—আসুন, একটু চা খেয়ে যান। খাবার হতে এখনো একটু দেরী আছে।

পঞ্চমী বলিল, আমাদের জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই, বঙ্কুবাবু; বরং আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন। সকাল থেকে নিশ্চয়ই পেটে কিছু পড়েনি বলে মনে হচ্ছে—ইস্, মুখটা বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে! অনবরত খালি ঘুরচেন দেখছি, এক ফোঁটা চাও বোধ হয় জিবে ঠেকান নি? না, কিছু খেয়ে নিন—মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গেছে সত্যি।

বঙ্কুর হৃদয়বীণার রাগিনীহারা নীরব তন্ত্রীটায় অকস্মাৎ নিঃশব্দে যেন এক অপূর্ব রাগিনীর ঝঙ্কার স্পন্দিত হইয়া উঠিল,—কথাটার মধ্যে কত প্রাণ যেন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। মনে মনে ভাবিল, সত্যিই কী বিধাতা জগতের সমস্ত নারীকেই এক ছাঁচে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়াছে, তা' না হইলে এমনটাই বা

কেন হইবে? একটু হাসিয়া বলিল, না না ওতে কিছু না, বরং আপনারা একটু চা খেয়ে নিন, আসুন। এ রকম আমার বহুদিন না খেয়ে চলে গেছে, তাতে এমন কিছুই কষ্ট হয় না। চলুন, আসুন মিস্ গাঙ্গুলী। প্রদীপবাবু কোথায় গেলেন, প্রদীপবাবু?

মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিলেন, উনি প্রোফেসর ভট্টাচার্যের সঙ্গে বুক ষ্টলে দাঁড়িয়ে কথা বলচেন।

—ও, উনি বুক ষ্টলে আছেন।—আচ্ছা প্রোফেসর ভট্টাচার্য তো আগে কংগ্রেসে ছিলেন না? উনি কবে এসে এ দলে যোগ দিলেন?

পঞ্চমী বলিল, এই হালে; বেশী দিন নয়। কংগ্রেসের সঙ্গে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে শুনেছি, অবশ্য নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে।

—বঙ্কু বলিল, কিন্তু এই সব লোকগুলোকে সবচেয়ে বেশী ভয়, অথচ উপায়ও নেই। তবুও যাই হক, anti congress ত'।

ইতিমধ্যে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া তিন গ্লাস চা ও খান কতক ক্রিম্ ক্র্যাকার বিস্কুট একটা প্লেটে করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চমী এক চুমুক চা খাইয়া একখানা বিস্কুট চিবাইতে চিবাইতে বলিল, না বঙ্কুবাবু, এই ধরণের লোকগুলো মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এরা যখন তখন betray করতে পারে। এরা সমাজসেবা করতে আসে নি, এসেছে নাম করতে আর নিজেদের পেট ভরাতে। এগুলো দু'পক্ষেরই বেইমান। এই ত' ধরুন না সুধা দাস বলে যে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন, মেয়েটি কী বলুন? এর বাপের অগাধ পয়সা, তিনখানা চা-বাগানের মালিক, কোলকাতায় প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, এ ছাড়া চালু কারবার। ইংরেজীতে এম, এ পাশ করে' ঘরে বসে ছিল, হঠাৎ পলিটিক্স করবার সখ হল, অর্থাৎ নাম করবার ইচ্ছে, রাতারাতি তাই একেবারে উগ্রপন্থী হয়ে গেল, কংগ্রেসে বিশেষ পাত্তা পায়নি তো। পয়সা আছে অতএব উগ্রপন্থীরাও খাতির করতে বাধ্য হল।

মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিলেন, এই ত' হয়েচে গণ্ডগোল, বুঝলেন না—এইজন্য মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় এই উগ্রপন্থী party শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কিনা? প্রত্যেক লোকটাই দেখছি খালি স্বার্থের তালে ঘুরচে। এ দেশের যে কী হবে, তাই ভাবি। যারই একটা ভোট আছে সেই যেন মাথা কিনে বসেচে, অথচ নিজেদের ভাল নিজেরা বুঝবে না এরা।

—তা' হলেও, কাজ আমাদের করে যেতেই হবে, মিসেস্ গাঙ্গুলী—চুপ করে কী করে বসে থাকি, বলুন? যাক্ আর দেরী করবেন না। এখন খাওয়া দাওয়া করে একটু rest নিন।

—আচ্ছা, আসি তাহলে বন্ধুবাবু, বলিয়া মিসেস্ গাঙ্গুলী পঞ্চমীকে সঙ্গে লইয়া ক্যাম্পের দিকে চলিয়া গেল।

পঁচিশ

নির্বাচনের দিন আগত প্রায়। আজ গ্রামে গ্রামে যেন একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, প্রত্যেকেই ব্যস্ত, প্রত্যেকেই কর্মতৎপর; প্রত্যেকেরই মুখে চোখে যেন অদম্য উৎসাহ ও অফুরন্ত আনন্দের উচ্ছল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। উভয় পক্ষই তাহাদের দলীয় প্রচারকার্য দ্বারা আসন্ন নির্বাচনের তাৎপর্য উদ্দেশ্য, ও উপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগকে অবহিত করাইবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু উগ্রপন্থীদের পক্ষে সমর্থকের সংখ্যা অধিকতর বলিয়া ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহাদের অপপ্রচারের রীতি-কুশল থাকার কারণে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে লাগিল যেন প্রতিযোগিতায় কংগ্রেস কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। ফলতঃ ধারণাটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যা নয় কেননা ভুবনবাবুর, তথা কংগ্রেসের, প্রচারকার্য তেমন আশপ্রদ ভাবে চলিতেছে না, উপরন্তু তাহাদের পক্ষে এতদিন ধরিয়া যাহারা সমর্থনের আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া অপর পক্ষের সহিত মিশিয়া গেছে। বস্তুত এই জাতীয় শত্রুরা কোনো পক্ষেরই মিত্র নয় বা শত্রুও নয়, ইহারা হয় নিন্দুক, নয় হিংসুক আর নয় স্বার্থান্বেষী, ইহারা উগ্রপন্থীও নয় বা কংগ্রেসপন্থীও নয়,—ইহারা এক কথায় এ্যান্টি-কংগ্রেস। এইরূপ অবস্থায় ভুবনবাবু বড়ই চিন্তায় পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন তাইতো এ যাত্রা বোধ হয় কংগ্রেস আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, অথচ নির্বাচনের দিন ত' ক্রমশই আগাইয়া আসিতেছে। এদিকে আবার যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক এবং সমাজসেবকেরা অহরহঃ নানা কাজকর্ম্ম লইয়া নিরত রহিয়াছে তাহারাও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে। ভুবনবাবুর মনটা একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িলে ত চলিবে

না, তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত লড়িয়া দেখিতেই হইবে, কেননা কংগ্রেসের গরিমা, মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে।

এইভাবে ঘরে বসিয়া যখন তিনি চিন্তা করিয়া যাইতেছেন সেই সময় শক্তিপদ একটা সুসংবাদ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শক্তিপদর হাস্যোদ্দীপ্ত ও উৎসাহব্যঞ্জিত মুখপানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভুবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কী শক্তিপদ ?

শক্তিপদ এক ঘর লোকের মধ্যে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, খুব ভাল খবর ভুবনদা, আমাদের ভোট সব solid ; কংগ্রেসকে যারা ভোট দেবে তারা দেবেই—এটা আমি খুব ভাল ভাবেই জানতে পেরেচি। তারা মুখে হয়ত কিছু বলচে না, কিন্তু কাজের বেলা ঠিকই আছে। তাহার কথা শুনিয়া ঘরসুদ্ধ লোক এবং ভুবনবাবু স্বয়ং আনন্দে ও উৎসাহে রীতিমত ফুলিয়া উঠিলেন। ভুবনবাবু বলিলেন, আমারও সেই ধারণা।—আচ্ছা, শক্তিপদ, বল ত' হৃদয় পণ্ডিত, ভৈরব, দেবানন্দ মাষ্টার, এই সমস্ত লোকেরা কী করবে ? মুখে ত' এরা খুব বলচে অথচ বিপিনের মেয়ে ত এদের একেবারে মুঠোর মধ্যে করে রেখেছে শুনচি।

শক্তিপদ একটু চিন্তায় পড়িল, বলিল, বলা কঠিন তবে—একটা কী সুবিধে হচ্চে জান, এই যে সব লোকদের কথা বল্লে না—এরা সকলেই গান্ধীবাদী, তা ছাড়া বিপিনদার মেয়েকে এরা সকলেই একটু আধটু মানে ; কেবল, ঐ দেবানন্দ মাষ্টার হালে যা একটু বিগড়েচে, সে শুধু মণির লাগানি ভাঙ্গানিতে।

—কিন্তু ওরা ভোট দেবে কাকে ?

—মনে হয়, কংগ্রেসকেই। কিন্তু যা'র কথা এরা শোনে তাকে আর আমরা পাচ্চি না, সে ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেল, আর আসেও না। মণিই এই সর্ব্বনাশটা করে গেল। তবে একটা খুব ভাল খবরও শুনতে পেলুম।

—কী খবর ?

—বন্ধুর সঙ্গে, শুনতে পাচ্চি, তার আর সে সদ্ভাব নেই।

—কে বল্লে ?

হঠাৎ কেরামত্ বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা বড়বাবু। সে মেয়ে বড় অদ্ভুত মেয়ে। আমি তা'কে জানি ; সে না এলেও, কংগ্রেস ছাড়া আর কিছু সে জানে না। বলিতে বলিতে হঠাৎ বৃদ্ধের মেজাজটা একটু চড়িয়া

গেল, বলিয়া উঠিল, ঐ মনেটই সব সর্বনাশ করেচে, লাগানি ভাঙ্গানিতে ওস্তাদ। যাক্, চলে গেছে না আপদ গেছে! তোমার কিছু ভাববার নাই বড়বাবু, আমি আছি।

কেরামতের কথায় ভুবনবাবু স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, তুমি তাকে এতটা কী করে চিনলে, কেরামত?

—তা চিনি, চিনি বড়বাবু। গাঁয়ের গরীব দুঃখী সব তাকে চেনে।

শক্তিপদ বলিল, তাতে আমাদের কী কিছু সুবিধে হবে? আসল কথা ভোট। পারবে কিছু ভোট জোগাড় করে দিতে, সেইটা বল শুনি?

কেরামত একটা সামান্য লোক, এমন কথা সে কী করিয়া বলে যে সে, ভোট যোগাড় করিয়া দিতে পারে, তাহার পক্ষে তো এটা অসম্ভব ব্যাপার। তাই সে ইতস্তত করিয়া বলিল, পারব কিনা সেটা কী করে অত জোর দিয়ে বলি বল, তবে হ্যাঁ খুকীকে বলে দেখতে পারি।—তা' তাকে একবার ডেকে পাঠালে হয় না? ওরা বাইরে থেকে যে দুটী মেয়ে এনেছে তারা ত বেশ কাজ করে যাচ্ছে দেখচি, মুচিপাড়া, পণ্ডিতপাড়ার মেলাই ভোট ভেঙ্গে নিলে।

ভুবনবাবু একটু বিচলিত হইলেন, বলিলেন, কেরামত কী বলে শুনলে ত শক্তি? আমি তোমাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম না ঐ মেয়ে দুটির কথা।—নাঃ, মণিশঙ্করই এ সর্ব্বনাশটা করলে আমাদের,—ভেতোরের সমস্ত খবরগুলো ওদের কাছে ফাঁস করে দিয়েচে।

শক্তিপদ বলিল, মণি যে এ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ কথা ত গোড়ায় অত বুঝি নি। ওকে আমি অনেক দিনই জানি, শুধু তুমিই ওকে বেশী পাত্তা দিয়ে ওর কাজে সুবিধে করে দিয়েচ।

কেরামতের মনের জোর অসীম, সে ভুবনবাবুকে ভরসা দিয়া বলিল, এ কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি বড়বাবু, তবে হ্যাঁ ওরা যতই যা করুক খুব সুবিধে করতে পারবে না; ভোট আমরাও ভাঙ্গাতে জানি।

শক্তিপদ বলিল, কিন্তু মণি যে সব কিছু মাটি করে দিল, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যা' তা' বলতে শুরু করেচে।

কেরামত যেন একেবারে খেপিয়া উঠিল, বলিল, বলতে দাও না, বলতে দাও ওকে। কত বলতে পারে ও বলুক। আমরা খুকীকে আমাদের কাজে নিশ্চয়ই পাব। মণিটা কিছুই করতে পারবে না, বড়বাবু। কেরামতের কথায়

ভুবনবাবু আবার কতকটা মনে বল পাইলেন। তবুও তাঁহার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগিতেছে। তিনি আরও একবার কেরামতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কী বিপিনের মেয়েকে আমাদের হয়ে কাজ করবার জন্ত পাব কেরামত? সে ত' উগ্রপন্থী দলে মিশে গেছে শুনচি।

—না—না, বড়বাবু, ভুল কথা। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে দেশের কাজ করবে বলেচে, ভূদান যজ্ঞে যোগ দেবে। আমার মেয়ে রাবেয়াকেও একটা চরখা কিনে দিয়েছে; মেয়ে আমার গ্রামসেবিকার কাজ নেবে। আজ গাঁয়ের ঘরে ঘরে যে চরখা দেখচেন বড়বাবু সে ত শুধু বিপিনদার মেয়ের চেষ্টার ফলে। ও মেয়ে অন্য ছাঁচে গড়া, বড়বাবু, অন্য ছাঁচে গড়া। মণি কাঁচকলাটা করবে, বলিয়া বৃদ্ধ হঠাৎ ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করিয়া ঝট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান করিবার জন্য উদ্যত হইল।

ভুবনবাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কেরামতকে তিনি কালির কথাটা আবার একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, এখনি তার কাছে একবার যেয়ে এখানকার কথা বল না কেরামত। জানি হয়ত সে এখানে আসবে না; তবুও একবার চেষ্টা করে দেখো বুঝলে।

—সে আর আমায় বলতে হবে না বড়বাবু, কংগ্রেসকে জেতাতেই হবে। মণির বিষ দাঁত ভাঙ্গতে হবে—বড় বাড় বেড়েচে!—আচ্ছা আসি বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভুবনবাবু বলিলেন, শুনলে ত শক্তি কেরামতের সব কথাগুলো? এখন থেকে উঠে পড়ে লাগতে হবে।—কিন্তু পঞ্চমী নামে ও মেয়েটি কে? দেখচি সে আসার পর থেকে ওদের পজিসন্ অনেকটা ইমপ্রুভ করেচে।

—মেয়েটি শুনচি মণির পরিচিত। বলতে কইতে পারেও মন্দ না। কী হবে শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝে উঠতে পারচি না। কেরামত ত খুব বলে গেল, কিন্তু আসল কাজ না হ'লে ত সব পণ্ড হয়ে যাবে।

ভুবনবাবু খুবই চিন্তায় পড়িলেন। একে মণিশঙ্করের বিশ্বাসঘাতকতা তার উপর জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় মনোভাব, এই দুই জাতের শত্রুর সঙ্গে তিনি কেমন করিয়া যে লড়িয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। খুব উদ্বেগের সহিত তিনি বলিলেন, সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হয়েছে কী জান, মণি সম্পূর্ণ দাগান voters list টা নিয়ে পালিয়েচে। আবার নোতুন করে সেগুলো

তো তৈরী করতে হবে। কত বড় শয়তানি করে গেল বল তো।

শক্তিপদ বলিল, ও করে মণি কিছুই করতে পারবে না, ভুবনদা। আমার মনে হয় কলির কাছেও একটা দাগান লিষ্ট আছে।

—তা' যদি থাকে তা' হলে ত' ভালই। তা' হ'লে, সেটা আনবার ব্যবস্থা করা দরকার।

—সে আমি নিজে যেয়েই তার কাছ থেকে নিয়ে আসব। তা' ছাড়া একটা কথা কী, কলি যে সব কাজ করে যাচ্ছে তার ফল পাবে কংগ্রেসই—যদিও সে কংগ্রেসের হয়ে কোনো কথাই বলচে না।

—বিরুদ্ধে বলার থেকে কিছু না বলা ঢের ভাল।

—না, না, তা সে কখনই করবে না; এমন কী উগ্রপন্থীদের হয়ে বা তাদের বিরুদ্ধেও কিছু বলবে না, এ আমার ধারণা।

ভুবনবাবুর দুশ্চিন্তা যেন কতকটা উপশমিত হইল। বলিলেন, তাহ'লে ত ভালই হয়।—আচ্ছা শক্তি দেবানন্দর ক' দিন খবর নেই—ওকী বন্ধুর দলে ভিড়ল নাকি?

বলিতে না বলিতে দেবানন্দ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ভীষণ ব্যস্ত, তাহার চোখমুখের উপর দিয়া একটা দারুন উৎকণ্ঠার হালকা আগুন যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ঘরে ঢুকিয়াই সে বলিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, আপনারা সব এখানে দিব্যি বসে বসে গল্প করচেন, আর ওদিকে যে কী সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তার কোনো খবরই নিচ্চেন না—চলুন, চলুন, শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চলুন! দেখে আসবেন। আপনাদের পোষ্টার-টোষ্টার সব নষ্ট করে দিয়েছে ওরা, কংগ্রেসের কুশপুত্তল করে আগুন ধরাচ্ছে।

শক্তিপদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি?

দেবানন্দ দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সত্যি না তো কী ঠাট্টা করচি? একবার দেখে আসবে চল না। যেতে সাহস হচ্চে না বুঝি, লজ্জা করচে?

কথা শুনিয়া ভুবনবাবু স্তম্ভিত হইয়া নীরব রহিলেন।

শক্তিপদ বলিল, লজ্জা করবে কেন, পলিটিকস্ করতে নেমে একটুতেই বিচলিত হয়ে উঠলে চলে না দেবানন্দ।

তবে চল না যাই। এখানে বসে থেকে কী লাভ আছে? এ-সব

মণিদা'র কাজ, যেমন সব তোমরা ওকে একেবারে মাথায় তুলে রেখে দিয়েছিলে!

ভুবনবাবু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, মণিকে কী সেখানে দেখলে নাকি?

—হ্যাঁ দেখেছি—বেইমানটা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল, লজ্জাও করে না!

ভুবনবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, সত্যি তুমি দেখেচো তাকে?

দেবানন্দ দ্রুতস্বরে বলিল, নিশ্চয়ই দেখেছি, ভালভাবেই দেখেছি।

ভুবনবাবু চুপ করিয়া গেলেন।

দেবানন্দ আরও বলিল, ওখানে আরও একজনকে দেখেছি।

শক্তিপদ জিজ্ঞাসা করিল, কাকে দেখেচ?

দেবানন্দ বিকৃত মুখভঙ্গীতে বলিল, না বলাই ভাল; বললে তো আর তোমরা বিশ্বাস করবে না—বলি, বিপিনদার ঐ মিটমিটে শয়তান মেয়েটিকে পণ্ডিতপাড়া থেকে সরিয়ে আনতে পার কী? ঐ মেয়েটাই হচ্চে যত নষ্টের গোড়া—ওকে ভোট ক্যানভাসিঙএ কখনো পাঠাবে না। শুনিয়া ভুবনবাবু অবাক্ হইলেন। ধীরকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন—তুমি কী তাকে ভোটের জন্য কারু আছে বলতে শুনেছ? আমরা তো তাকে কোথাও পাঠাইনি।

দেবানন্দ বলিল, না পাঠালে তাকে পণ্ডিতপাড়ায় কী করতে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে শুনি; অথচ ওর চোখের সামনেই ত' 'জনসেবক' পুড়িয়ে ছাই ক'রল একটা টু শব্দ পর্যন্ত ক'রল না, করবে কেন? বুঝেচি, বুঝেচি—ছ্যাঃ কংগ্রেসের বদনাম—মণিদা দিন দুপুরে নিজের চোখে যা দেখচে তার পরে··· যাক্‌গে, আমি কিছু বলতে চাই না। বন্ধুর সঙ্গে ওর অত কিসের খাতির শুনি? যত সব বাউরি ছুঁড়িদের বেলেল্লাগিরি। বলিয়া দেবানন্দ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

ভুবনবাবু একেবারে স্তম্ভিত,—দেবানন্দ যে এত দূর নামিয়া যাইতে পারে ইহা তিনি ইতিপূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নারী-পুরুষের চরিত্রের ওই দিকটা লইয়া তিনি নিজে তো যেন কোনো দিনই কোনোরূপ অরুচিকর আলাপ আলোচনা করেনই না, এমন কি অপরকেও এ বিষয়ে কখনো কোনো কথা উত্থাপন করিবার সুযোগ বা প্রশ্রয় দেন না। তাই দেবানন্দের ওই জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। অবশ্য

মুখে তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না শুধু ভ্রূকুটির দ্বারা নীরব রুদ্ধ ভাষায় তিরস্কার করিয়া গেলেন এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন, যদি কিছু কাজ ক'রবার ইচ্ছা থাকে ত' করে যাও দেবানন্দ, অবান্তর কথার উত্থাপন কর না—আচ্ছা বলিয়া তিনি কিছু সংখ্যক কংগ্রেসকর্মী সঙ্গে লইয়া দেবানন্দের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, চল, দেখে আসি ব্যাপারটা কী।

ছাব্বিশ

নির্বাচনের মাত্র আর সাত দিন বাকি।

পণ্ডিতমশাই বৈঠকখানা ঘরের দাওয়ার একধারে বসিয়া খবর কাগজ পড়িতেছেন। কলি আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে পুষ্কর এবং আরও অনেকে রহিয়াছে। পণ্ডিতমশাই পুষ্করের আপাদমস্তক গভীর কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে সস্নেহকণ্ঠে কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও, এনারই কথা বোধ হয় কেরামত সেদিন বলছিল আমাকে। কলি পেলব ওষ্ঠাধরে একটা সলজ্জ মৃদু হাসির রেখা টানিয়া পুষ্করের শ্রদ্ধাবনত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম কর। এ অঞ্চলের মধ্যে বলতে গেলে এঁর মতো পণ্ডিত খুব কমই আছেন। ব্রাহ্মণ, কিন্তু জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকেই ইনি ভালবাসেন। এমন উদার প্রকৃতির মানুষ বড় একটা দেখিনি। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর বলতে গেলে মূর্ত্ত প্রতীক ইনি।

পুষ্কর নত হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে পণ্ডিতম'শাইকে প্রণাম করিল। কলিও সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিল।

পণ্ডিতমশাই সস্নেহে উভয়ের মাথার উপর হাত রাখিয়া হাসিতে হাসিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক বাবা; ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুণ।

উহাদের দেখাদেখি রামী রাবেয়া উভয়েই পর পর ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের পদধুলি গ্রহণ করিল। পণ্ডিতমশাই ইহাদের কারোকেই চেনেন না, তাই ইহাদের পরিচয় লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রথমে রামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঃ বেশ মেয়েটি ত। কে মা এ, কোথায় থাকে? কলি বলিল, সাঁওতালদের মেয়ে।

শুনিয়া পণ্ডিতমশাই বিস্ময়ের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, সাঁওতালদের মেয়ে? দেখে মনে হয় না ত, বাঃ বেশ ফুটফুটে চেহারাটি ত—কোথা থেকে পেলি মা একে?

কলি বলিল, ও আমার মামার ওখানে সিউড়িতে থাকত, আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে কাজ করবে বলে'—বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের রোমাঞ্চকর আদ্যান্ত ইতিহাসটুকু বলিয়া গেল। শুনিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের বিস্ময় গভীরতর হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, এত অল্প বয়সে সমাজসেবার কাজে নেমেচে? বলিস কী মা! কত বয়স হবে?—ষোল সতেরো হয়েছে কী? কিন্তু কী সুন্দর মুখখানি! সাঁওতাল বলে' তো মনে হয় না রে।—গ্রামসেবিকা, বাঃ বাঃ চমৎকার।

রামী লজ্জায় জড়সড় হইয়া মুখে আঁচলের খুঁটটা চাপা দিয়া মিটমিট করিয়া হাসিতে লাগিল। কলি তাহার সহাস্য মুখপানে একটিবার তাকাইয়া পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, বয়স ওর ঐ রকমই, কিন্তু কাজ করতে পারবে অতি সুন্দর। কাজই যেন এদের জীবন। সমাজ এদের ঘৃণায় অনাদরে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু এদের ভালবেসে কাছে টেনে নিয়ে এদের মধ্যে কাজের উৎসাহ এনে' দিলে অতি চমৎকার কাজ করতে পারবে এরা। দেখতে পাবেন কী সুন্দর সমাজসেবার কাজ করে এ মেয়ে। এরাই ত' গ্রামসেবিকার কাজ করবে।—আনন্দে ও বাৎসল্যের আতিশয্যে পণ্ডিতমশাই একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রামীর পিঠের উপর ডান হাতখানা রাখিয়া হাস্যমুখে স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন, বড় খুশি হলুম মা তোকে দেখে—তুই আজ সমাজের চোখের ঠুলি খুলে দিলি মা। সমাজ তোদের কাছে টেনে নিক, এই কামনাই করি।

তারপর রাবেয়ার শান্ত বিনম্র ব্রীড়া বিহ্বল লাবণ্যময় তনুদেহটি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিয়া সহসা যেন তনয়াস্নেহে আকুল হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মা-টি কে? একেও কী তোর সাথী করে নিয়েছিস্? এও কী সমাজসেবিকার কাজ নিয়েচে?

কলি হাস্যমুখে বলিল, আমাকে ডেকে সাথী করে নিতে হয়নি পণ্ডিতমশাই, এরা আপনা হতেই এগিয়ে এসেচে সমাজসেবার কাজ করবে বলে। ভূদানযজ্ঞ কী, এবং সর্ব্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী তাও বুঝিয়ে দিয়েচি

এদের। সেবাই ধর্ম, ধর্মই সেবা—প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে আমরা। এ কাজে এরা আনন্দ পেয়েছে, উৎসাহ পেয়েচে।—এ কে জানেন ত? আমাদের কেরামতদার মেয়ে।

এঁ্যা! কেরামতের মেয়ে, বলিস্ কী! বলিয়া পণ্ডিতমশাই ক্ষণকাল বিস্ময়ে নীরব হইয়া গেলেন,—কেরামতের মেয়ে সমাজসেবায় কাজে নামিয়াছে ইহা যেন তাঁহার কল্পনারও বাহিরে। দেখিয়া আনন্দে বুকখানা তাঁহার ফুলিয়া উঠিল। তিনি আর আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, আপন কন্যার ন্যায় রাবেয়াকে কাছে টানিয়া লইয়া ডান হাত দিয়া তাহার চিবুকটা স্পর্শ করিয়া মুখ দিয়া বাৎসল্যের একটা আদরধ্বনি করিয়া বলিলেন, আজ তোকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল মা, আশীর্ব্বাদ করি, তোর মতো মেয়েই আজ বাংলা দেশে দরকার। তুই আজ জাতিধর্ম্মের অনেক উর্দ্ধে। তোকে শ্রদ্ধা করি, স্নেহ করি। তুই হলি গান্ধী আদর্শের আসল রূপ।—ওর আরও একটা মস্তবড় গুণ আছে পণ্ডিতমশাই—ও চরখায় খুব ভাল সুতো কাটতে শিখেচে। মাস দু'য়েকের মধ্যে কী সুন্দর হাত হয়ে গেছে ওর, দেখাবো আপনাকে একদিন ওর নিজের হাতে কাটা সুতো। রামীও খুব ভাল সুতো কাটতে পারে।

পণ্ডিতমশাই বড় খুশি হইলেন শুনিয়া। অপরিসীম ভাববিহ্বলতায় কলির মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, সত্যিকারের সমাজসেবা একেই বলে মা, একেই বলে। উগ্রবাদ আমি এতটুকুও পছন্দ করি না। আমি গান্ধী-বাদে বিশ্বাস করি। বলিতে বলিতে তিনি ছেলে রামহরির কথা তুলিয়া বসিলেন। রামহরি তাঁহার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, ত্যাখ্, ত্যাখ্ রে রামু, ত্যাখ্, দেখে শেখ্, দেখে শেখ্।—ত্যাখ্ দেখি কেমন সুন্দর মেয়ে দুটি, এখন থেকেই কেমন নিজের দেশকে ভালবাসতে শিখেছে!

কলি ইতিমধ্যে রামহরিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, না, রামু ভাল হয়ে গেছে, ও আমায় বলেছে ও রোজ একটু করে চরখায় সুতো কাটচে, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরে সমাজসেবার কাজ করবে। এই তো সেদিনে ওরা সকলে মিলে ও পাড়ার মোড়লদের পুকুর থেকে ভুরুলী (পানা) তুলে পরিষ্কার করল

প'চে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। রাস্তাঘাটও সব পরিষ্কার করচে; রুগীদের সেবাও করচে এরা। ভাল ভাবে পড়াশুনোও করচে রামু।

—যাক্ শুনেও আনন্দ মা, শুনেও আনন্দ, অনেক শান্তি পেলুম মনে, বলিয়া পণ্ডিতমশাই রামহরিকে ডাকিয়া বলিলেন, এই রেমো! এই ভজা! প্রণাম কর্ দিদিকে—না না আপত্তি ক'র না মা, আপত্তি কর না।

কলি উভয়কে বাধা দিয়া বলিল, না না, ছি, আপনি এদের এমন আদেশ করচেন কেন?

দু'জনের কেহই বাধা মানিল না। নীচু হইয়া কলির পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল।

আঃ, রামু, তুমি ভারী দুষ্টু তো! ভজু তুমিও কম নও।

পণ্ডিতমশাই বলিলেন, না ওরা ঠিক করেচে। তোমার কাছে ওদের মাথা নত হ'ক, তা না হলে, তোমার প্রতি, তোমার সেবাআদর্শের প্রতি ওদের সে শ্রদ্ধা আসবে না—বিনয়ই কৈশোরের, যৌবনের ধর্ম্ম। ওদের মানুষ হতে দাও মা, ওরা ঠিকই করেচে।—আচ্ছা এখন উঠলুম একবার ভুবনের বাড়ী যেতে হবে, ডেকে পাঠিয়েছে।

কলি বলিল, আচ্ছা, তাহলে আসি, আমরা আসি।

—আচ্ছা এসো মা, এসো।

সাতাশ

নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় পূর্ব দিগন্ত তখনো উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। পঞ্চমী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া উন্মুক্ত বারান্দাটার এক প্রান্তে স্থিত একটি হাতাওয়ালা চেয়ারের উপর দেহটা যতদূর সম্ভব ছড়াইয়া দিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া দুই পা একটা ছোটো টেবিলের উপর উঠাইয়া রাখিয়া ডান হাতে একখানা আয়না একটু ডান দিক ঘেঁসিয়া তেরছা করিয়া ধরিয়া লইয়া নিজের মুখ দেখিতেছে। রাত্রে নিদ্রার লেশমাত্র আসে নাই, চোখের কোল দু'টা বসিয়া গিয়া কালো পুরু রেখা পড়িয়াছে; রুক্ষ কেশদাম আলুলায়িত।

নিজের চোখ মুখের দিকে তাকাইয়া আজ পঞ্চমীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া

উঠিল,—এই চেহারাটা এই পনর দিনের মধ্যে কী ছিল আর কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ তাহার দুই চোখ ভরিয়া অশ্রু ছাপাইয়া উঠে, বুকখানা বেদনায় ভাঙ্গিয়া যায়,—জীবনে এত ক্লেশ সে ত কখনো সহ্য করে নাই! আজ বার বার তাহার মনের মধ্যে শুধু একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, কেনই বা সে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এপথে আসিয়া পড়িল? আসিবার ত তাহার এতটুকুও প্রয়োজন ছিল না। সে ভুল করিয়াছে, মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। নিজেকে অস্বীকার করিয়া, বিসর্জন দিয়া, নিজেকে রিক্ত করিয়া, তিলে তিলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিরা এইভাবে সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মধ্যে যে সত্যটুকু সে একদিন অদম্য উৎসাহ ও আনন্দের সহিত আবিষ্কার করিয়াছিল, আজ যেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আজ সে নিঃস্ব—যাহার উৎসাহে তাহার উৎসাহ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই দুশ্চর তপস্যায় তাহার এই দেহ, মন ও যৌবনকে সে এতদিন ধরিয়া পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছিল সেই আরাধ্য সেই অভিলষিত দেবতার নিকট আজ সে উপেক্ষিত লাঞ্ছিত। না, সে আজই এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর মুহূর্ত্তকালও তাহার এখানে থাকিতে ভাল লাগিতেছে না। এ দৃশ্য সে কখনো চোখে দেখিতে পারে না,—যে পুষ্করদা'কে সে এতদিন ধরিয়া তাহার সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া, সকল অনুভূতির ও স্বচ্ছ সুমহান কল্পনার ভিতর দিয়া সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছিল আজ সেই পুষ্করদা' একটা ক্রুর নিষ্ঠুর মিথ্যার রূপ ধরিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত জীবনটাকে উপহাস করিয়া যাইতেছে। সে কী নিষ্ঠুর! না তাহার এতটুকুও অপরাধ নাই,—ঐ নারী—ঐ কলঙ্কিনী পিশাচী নারীই তাহাকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে একটা গভীর বেদনাময় উত্তেজনায় তাহার তরুণ তনুর যৌবনের রক্ত ধারা ভিতরে ভিতরে যেন হঠাৎ বীভৎস মূর্ত্তিতে নাচিয়া ফুলিয়া উঠিল। ক্ষণ-কালের মধ্যে সে যেন কেমন হইয়া গেল। হিংসায়, ক্রোধে, উন্মাদনায় ঘৃণায় তাহার নিষ্পিষ্ট হৃদয়ের সমস্তটা যেন দীর্ণ হইয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। অসহনীয়! মনে মনে ভাবিল; আজই কোলকাতার পথে সোজা যাত্রা করিবে। রাজনীতি, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ইহার

কোনটাতেই আজ আর তাহার প্রয়োজন নাই। জীবনে যাহা সে হারাইল, এবং যাহা তাহাকে জীবন ভরিয়া শুধু কাঁদিবার, শুধু বিরহ বেদনা-নলে দগ্ধ হইয়া তিলে তিলে মরিয়া যাওয়ার পথে নিষ্করুণ হৃদয়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, তার কাছে উহাদের কোনোটারই কোনো মূল্য নাই। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া চেহার হইতে উঠিয়া পড়িয়া আবার বিছানায় গিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

একটু পরে সুধাদি আসিয়া তাহার অৰ্দ্ধনগ্ন পিঠের উপর মৃদুভঙ্গিতে একটা আঘাত দিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, কী দিদি, কী হল, এভাবে শুয়ে যে? শরীরটা খারাপ নাকি?

পঞ্চমী ধড়মড় করিরা উঠিয়া পড়িয়া স্রস্ত বসনাঞ্চল দেহের সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া বলিল, না না কিছু হয় নি। আজ একটু সকাল সকাল ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কিনা, তাই আবার শুয়ে পড়েছিলাম।

সুধাদি দরজার একটা পাট বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর একটু আড়াল করিয়া বসিয়া পড়িল; তারপর সিগারেটের টিনটা হইতে একটা সিগারেট বার করিয়া ফস্ করিয়া ধরাইয়া লইয়া বলিল, চোখ মুখের ভাবটা কী রকম কী রকম যেন মনে হচ্চে। ইস্! চোখের কোল দিয়ে কী মোটা কালির দাগ পড়ে গেছে—রাতে নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি বোধ হয়। আয়না দিয়ে মুখটা একবার দেখেচ?

—দেখেচি, ঠিকই ধরেচ দিদি, আশ্চর্য কাল রাতে কী বলবো এক ফোঁটাও ঘুম হয় নি!

সুধাদি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন কী হল?

—কী জানি সারারাত কী রকম যেন একটা অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম।

কেন, এতদিন তো বেশ ঘুম হচ্চিল দেখেচি। হঠাৎ আবার কী হল? —কী ভূতের ভয়-টয় আছে নাকি?

পঞ্চমী একটু হাসিয়া বলিল, না না ভূতের ভয় আবার কী। সাপের

ভয় আছে অবশ্য—তা সে তো মশারি ফেলেই শুই।

—তা হলে কী insomnia হয় নাকি মাঝে মাঝে?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেচ দিদি, মাঝে মাঝে এরকম হয় বটে।

—তাহলে শোবার আগে একটা করে ঘুমের বড়ি খেয়ে শুলে হয়, আমারও এরকম মাঝে মাঝে হয়, একটা করে ঐ বাড় খেয়ে শুয়ে পড়ি রাতে।

—সঙ্গে আছে নাকি, একটা দেবে আমায়?

সুধাদি মিটমিট করিয়া হাসিয়া বলিল, আছে বৈকি, চাই নাকি একটা?

—পেলে মন্দ হয় না।

আচ্ছা, দিচ্ছি একটা বড়ি।

পঞ্চমী থপ্‌ করিয়া তাহার ডান হাতখানা ধরিয়া অত্যন্ত মিনতি করিয়া বলিল, না, আমায় দুটো দাও সুধাদি, এখন একটা খাব, আবার রাতে শোবার আগে একটা। সুধাদি বলিল, কিন্তু এখন খেলে যে ঘুম এসে যাবে। কাজে বেরোবে কী করে?

—না, আমি আজ ঘুমোতে চাই।

সুধাদি' বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, সে কী একটু পরেই তো বঙ্কুবাবু আসবেন, মণিবাবুও আসবেন। কী বলবে তাঁদের?

মুখটা কেমন করিয়া পঞ্চমী বলিল, বলবো, শরীর খারাপ।

সুধাদি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, যত বাজে কথা তোমার। ওঠো হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও, সাতটা বেজে গেছে যে—আজ কোন্ দিকে যাব আমরা?

পঞ্চমী একটা দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল, কোনো দিকেই যাব না, ঘরে বসেই থাকবো। চা-টা খেয়ে দুজনে মিলে বসে গল্প করব।

হাসিটা সুধাদি'র চোখে ঠেকিল.—এ যেন কী রকম কী রকম হাসি। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সব কী কথা বলচ দিদি? একটু পরিহাস করিয়া বলিল, ব্যাপারটা কেমন কেমন ঠেকচে!—এত বৈরাগ্য হঠাৎ?

মুহূর্ত্তের মধ্যে পঞ্চমীর মুখের সে হাসি কোথায় যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর আজ দুই দিন ধরিয়া যে কত কান্না, কত

বেদনা জমিয়া উঠিয়াছে তাহার এক তিলও সুধাদি' জানে না, যদি জানিত তাহা হইলে হয়তো সে এমন নিষ্ঠুর ভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহার মনে ব্যথা দিত না। তাই বিষয়টার আদ্যন্ত তাহার কাছে খুলিয়া বলিবার জন্ম মনটা ভিতরে ভিতরে ছটফট করিয়া উঠিল,—ভালবাসার কথা, বিরহের কথা, বিরহ-মিলনের কথা, ব্যর্থতার কথা, সফলতার কথা কোনো সহৃদয় শ্রোতার কাছে কখনো বা প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া, কখনো বা গভীর বেদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া মন খুলিয়া বলিতে না পারিলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না, আনন্দ পাওয়া যায় না; যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়াও কান্নার শেষ করা যায় না। তাই পঞ্চমী যেন অকস্মাৎ ফাটিয়া পড়িল,—তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সুধাদির বিহ্বলদৃষ্টি মুখের দিকে চাহিয়া প্রচণ্ড আবেগের ভরে তাহার ডান হাতখানা দুই মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, সুধাদি, জীবনে এ একটা মস্ত বড় ভুল করেচি।

স্তম্ভিত হইয়া সুধাদি জিজ্ঞাসা করিল, কী হল হঠাৎ কাঁদচ কেন? পঞ্চমী আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, এ পথে এসে ভয়ঙ্কর ভুল করেচি দিদি, তাই সে কথা ভেবে ভেবে আজ আমার কান্না পাচ্চে।

সুধাদির কৌতূহল হইল: জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ পথে কী আসার ইচ্ছে ছিল না?

একটা ঢোক গিলিয়া ভাঙ্গা গলায় পঞ্চমী বলিল, এতটুকুও না।

—তবে, এলে যে?

—শুধু জেদের বশে এই কাজে নেমে পড়েচি।

সুধাদির কৌতূহল প্রবলতর হইয়া উঠিল, বলিয়া উঠিল, জেদ!

—হ্যাঁ, শুধু জেদ করেই এই জীবন বেছে নিয়েছিলাম।

—ভালই তো হয়েছে।—তা' হঠাৎ জেদ চাপল কেন?

—সে সব অনেকখানি ইতিহাস, পরে শোনাবো।

—পরে কেন? এখনই বল না শুনি।

—কী আর শুনবে বল, সমস্তটাই একটা tragedy.

—ট্রাজিডি বলেই ত' আরও বেশী করে শোনবার ইচ্ছে হচ্ছে; comedy হ'লে তোমাকে হিংসে করতুম, তখন শোনবার ইচ্ছেটা কম হত—যাক্,

বলে ফেল—গল্পটা কি শুনি।

পঞ্চমীর বুকটা যেন এতক্ষণের পর অনেকটা হালকা হইয়া আসিল—আজ সে প্রাণ ভরিয়া সব কিছু বলিয়া যাইবে, তবুও শান্তি। হঠাৎ কান্নাটা তাহার থামিয়া গেল। সে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। কখনো বা শান্তভাবে, কখনো বা গভীর উত্তেজনা ও আবেগের সহিত সে তাহার বাল্যজীবন অবধি একে একে গত কয়েক দিনের পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়া গেল। তারপর একটু কাল থামিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন অগ্নিস্পৃষ্ট দাহ্য পদার্থের ন্যায় হঠাৎ ফাটিয়া উঠিয়া উপসংহারে কৃষ্ণকলির প্রতি বিষ-স্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া বলিয়া উঠিল, that witch!—ঐ শয়তান হিংসুটে মেয়েটাই আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিল! ওকে খুন করলেও আমার রাগ যায় না, সুধাদি। তাকে এখানে পর্যন্ত ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। উঃ, এ দৃশ্য আর আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পারছি না। বলিতে বলিতে সে এমন দুর্দ্ধর্ষ ভাবে খেপিয়া উঠিল যে, তাহার চোখ মুখের হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন কৃষ্ণকলিকে তখন-তখন হাতের কাছে পাইলেই সে বোধ হয় তাহাকে খুন করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। তাহার ঐ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সুধাদি একেবারে থ' হইয়া গেল। এদিকে আবার তাহার ভয় হইল, কে জানে, তাহার মনের অবস্থা হঠাৎ যেরূপ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে হয়তো বা সে আত্মহত্যাও করিয়া বসিতে পারে, এই ভাবিয়া সে চট করিয়া ঘুমের বড়ির ডিবেটা বিছানার উপর হইতে সরাইয়া লইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। তাহার ঐ কাণ্ড দেখিয়া পঞ্চমী উন্মাদিনীর ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া বলিল, না, না, সে ভয় নেই সুধাদি, সুইসাইড করব না কখনো, সেটুকখানি মনের জোর আমার আছে—এতো ঠুন্‌কো নই আমি।

সুধাদি হাসিয়া বলিল, কথার দ্বারা ত সে রকম মনে হচ্চে না। তবে আমি দেখচি কী, তুমি নিজেকে খুবই দুর্বল করে ফেলেচ। আমি কিন্তু বলব মেয়েটির কোনো দোষ নেই।

পঞ্চমী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, এ কথা তুমি বলতে পারলে সুধাদি? কথাটা সুধাদিকে কিন্তু এতটুকুও ব্যথিত করিয়া তুলিল না বরং কৃষ্ণকলির দিক হইতে ব্যাপারটাকে

লঘু করিয়া ধরিয়া লইয়া, যেন নিক্তিতে মাপিয়া লইয়া সুধাদি হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরে বলিল, পুরুষজাতটাকে আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না দিদি—তারা যৌবনের উন্মাদনার বশে নারীকে ঠিক তার নিজের মূল্য দিয়ে শ্রদ্ধা দেয় না—তারা সব সময়ই নিজের স্বার্থটাই বোঝে,—পশুরও অধম।

আর তাহার কাঁদিবার ক্ষমতা নাই—সুধাদির কথাটা তাহাকে হঠাৎ কঠিনভাবে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট প্রশ্নও জাগিল, তাইত সুধাদি এমন নিষ্ঠুর হইয়া কেন এ কথা বলিল? ইহা কী সুধাদির নিষ্ফল জীবনের বিষময় বেদনাময় ইঙ্গিত, না নিজের জীবনের প্রতি একটা অমায়া না আভিজাত্যের অহমিকা? সমস্তটাই একটা রহস্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, অথচ সোজাসুজি কিছু প্রশ্ন করিতেও ইতস্তত করিতে লাগিল।

তাহার মুখের হাবভাব দেখিয়া সুধাদি হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কী কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে যাচ্ছ না?—তাকে মন থেকে দূর কর দিদি, মনে কর পুষ্করদা'কে কখনো ভালবাসনি।

—এটা কী সম্ভব সুধাদি? তা' যদি পারতুম তাহলে কাল রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতুম না।

সুধাদি ঋজুভঙ্গিতে বলিল, আমি ত' পেরেচি। বলিয়া সে আর নিজেকে অটল করিয়া রাখিতে পারিল না, গর্বিত আহত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি জান, আমি বাপের একমাত্র মেয়ে, আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, বিদ্যা আছে, প্রচুর সম্পদও আছে, আভিজাত্য আছে—কত যুবক আমার এই মনটাকে জয় করবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু এ মন আমি কাউকেই দিই নি, বা দোবোও না, দেহটা ত নয়ই। ও জাতটাকে ঘৃণা করি আম।

—মন থেকে কখনো একথা বলতে পার না, সুধাদি। ভালবাসতে পারা যায় বলেই ঘৃণা করতেও পারা যায়—আমি বলব এ তোমার ব্যর্থ জীবনইতিহাসের পাতা উল্টে যাচ্চ, বলিয়া পঞ্চমী কেমন সুন্দরভাবে হাসিয়া উঠিল।

সুধাদি হাসিটাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমাকে এখনো চেনোনি দিদি, যাকে ভালবাসবো তাকে পায়ের তলায় রাখব।—ওদের ত' ঐ একটাই চিন্তা।

—তাহলে তুমি কোনো দিন কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারবে না। শান্ত কণ্ঠে সুধাদি বলিল, প্রয়োজন নেই। যাক্, অনেক বাজে কথা হল।

—না, বাজে কথা নয়, কাজের কথাই হল। ভালবাসাকে শ্রদ্ধা দেবার সুযোগ তোমার কোনো দিন হয়নি বলেই তাই এ কথা বলচ, সুধাদি।

সুধাদি এতক্ষণের পর হঠাৎ যেন একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আমার বিশ্বাস সে তোমায় কোনো দিন হৃদয়টা দেয়নি। কথাটা পঞ্চমীর বুকের ভিতর গিয়া যেন তীরের মত বিঁধিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, ও কথা ব'ল না সুধাদি, ও কথা ব'ল না, বরং আমাকে একটা পিস্তল যোগাড় করে দিতে পার ত উপকার হয়—পারবে দিতে, বল?

সুধাদি হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তোমার দেখচি মাথা খারাপ হয়েছে। সুইসাইড করতে চাও? কত বড় মূর্খ তুমি।

—না খুন করতে চাই।

এইবার সুধাদি চমকিয়া উঠিল। পঞ্চমীর মুখের দিকে তাকাইয়া সত্যিই সে যেন একটু বিব্রত, শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চমীর মুখের চেহারাটাও যেন একটা খুনী আসামীর মুখের চেহারার মতো ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে সুধাদি প্রশ্ন করিল, কাকে খুন করবে শুনি? পাগলের মতো কথা বলচ।

—না, না, আমার এতটুকু মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়নি। বলিয়া অত্যন্ত কাতরধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি সুধাদি' আমায় একটা পিস্তল জোগাড় করে দাও, দাও সুধাদি'।

—বাজে কথা বল' না দিদি। অনেক বেলা হয়েচে, চল মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। এলেই ত আবার দুটোতে মিলে আড্ডা বসাবে। আঃ, ব্লাউজটা পাল্টে নাও, কী বিচ্ছিরি দেখাচ্চে। বুকের কাছটা ছিঁড়ল কী করে?

—আরে বাপু বসো বসো, আর পলিটিক্স ভাল লাগে না এখন। এই ত, এখন এলে একটু পরেই ত আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। ততক্ষণ দুটো কথা বলি।—আচ্ছা সুধাদি আমার কথা নয় বাদ দাও। বলি, তুমি এই নোংরা পলিটিক্সএ এলে কেন বল' ত'? তোমার ত' কোনো কিছুরই

অভাব নেই। জীবনটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পার।

সুধাদি একটু হাসিয়া বলিল, এটা আমার সখ।

—এ বড় বিচ্ছিরি রকমের সখ, দেখচি—আমার বাপের এত পয়সা থাকলে আমি জীবনটাকে শুধু ভোগের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে নিয়ে যেতুম। তুমি শুধু পায়ের তলায় রাখতে; আর আমি হ'লে, পুরুষ জাতটাকে দু'হাঁটু দিয়ে চেপে-ধরে পশু কোরে রাখতুম।

—সেটা ত হাতের পাঁচ রয়েইচে। তবুও একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত'। জীবনে আনন্দ চাই।

—এর নাম তোমার আনন্দ। আমি ত' ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি, মস্ত বড় ভুল করে ফেলেচি। একা একা এ তপস্যা ভাল লাগে না, দুজন হলে তবু কিছুটা চলে। লেনিনের জীবনীটা বার বার পড়ে যেতে হয়।

—না দিদি বেশ আছ।—তোমার থেকে আমি ঠকেচি বেশী। পঞ্চমী শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সুধাদি'র মুখপানে তাকাইয়া দেখে তাহার চোখ মুখের আর সে চেহারা নাই—যেন তার ভিতর দিয়া আগুন ছুটিয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কী বল্লে সুধাদি'?

—একবার ঠকেচি আর ঠকতে চাই না। scoundrelটা বিলেতে পালিয়ে যেয়ে বসে আছে। আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়ে চলে গেছে। আজ তারই জন্যে শুধু আমার এই দশা। ওঃ! এত বড় rascal, একসঙ্গে পড়তুম আমরা এম, এ ক্লাশে। ওই তো প্রথম আমার মাথায় উগ্রবাদ ঢুকিয়ে দিলে, humanity-র বক্তৃতা দিলে, লেলিন আর ষ্ট্যালিনের জীবনী পড়তে দিলে। কত আদর্শের কথা, কত কাব্যময় জীবনের ছবি, আমার নিষ্পাপ মনের সামনে তুলে ধরল। বড় ভাল লাগল তাকে। একটা intellectual friendshipএর ভেতর দিয়ে দুজনের জীবনকে গড়ে তুলবো বলে কত আশা ছিল। সত্যি করে ভালবেসেছিলাম তাকে, কিন্তু কী হয়ে গেল! মধুর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল, জানতুম না—পরে বুঝলুম সে আমায় ভালবাসতে আসেনি, এসেছিল শুধু······বলিতে বলিতে সুধাদি হঠাৎ যেন আগুন হইয়া উঠিল, সরোষে বলিয়া উঠিল, আজ মনে হয় তাকে সামনে পেলে গুলি করে

মাস্নি। না, না, তুমি ও' মেয়েটাকে অপরাধী কর না দিদি, ভুল হবে, ভুল হবে।

—না, এতটুকুও ভুল হবে না, সুধাদি'।

—আমি বলচি, এটা ভুল হবে তোমার দিদি—ভালবাসা কখনো কেড়ে নেওয়া যায় না। নিষ্ঠুর হ'য়ো না দিদি, নিষ্ঠুর হ'য়ো না।

আমি অত কিছু শুনতে চাই না, তুমি আমাকে একটা পিস্তল যোগাড় করে দাও দিদি—দেবে কিনা বল?

প্রদীপবাবুকেও বল, উনি পারবেন। বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুধাদি অন্য কথা তুলিয়া বলিল, কটা বাজে খেয়াল আছে? এই এসে পড়ল বলে। আহা, বঙ্কুবাবুর জন্যে কষ্টে হয়—শুধু আমাদের জন্যেই হেরে যাবে বেচারা।

—আমাদের জন্য নয়, এটা তোমার ভুল কথা।

—যাক্‌গে, ও নিয়ে আর কথার দরকার নেই। এখন ওঠো কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও। চা-টা খেয়ে নিয়ে—ওরা আসবার আগেই—আমরা বেরিয়ে পড়ি, বলিয়া সুধাদি আর কথা বাড়াইল না। পাশের ঘরে কাপড় জামা ছাড়িতে চলিয়া গেল।

আঠাশ

ঠিক বাহির হইবার মুখে বঙ্কু ও মণিশঙ্করের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

বঙ্কু একটু হাসিয়া পঞ্চমীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী, শরীরটা খারাপ বুঝি? মুখটা কেমন শুক্‌নো শুকনো দেখাচ্চে। সত্যি কথাটা পঞ্চমীর বেশ ভাল লাগিল; ঠিক সেইভাবে হাসিটা ফিরাইয়া দিয়া সেও হাসিয়া বলিল, না না, ও কিছু না—রাত্তিরে একটু জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল—দুটো A.P.C. বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম, ভালই আছি, শরীরটা এখন ঝর্‌ ঝরে বোধ হচ্চে।

বঙ্কু বলিল, আজ তাহলে না বেরোলেই পারতেন। সত্যি, একটা

রাতে আপনার চেহারাটা কী ভীষণ কাবু দেখাচ্চে। না না, এ বেলাটা একটু rest নিয়ে নিন।

সুধাদি বলিল, তাই কী হয় বঙ্কুবাবু? যে কাজের ভার দিয়েছেন তা' আমাদের শেষ করে তুলতেই হবে। শেষ দিকটায় কাজে ঢিলে দিলে সব সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মণিশঙ্কর মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তা' যা' বলেচেন মিস্ দাস। এরই ভেতোর ওরা পণ্ডিতপাড়ার অনেক ভোট ভাঙ্গিয়ে নিয়েচে। সুধাদি' বলিল, অত সোজা নয় মণিবাবু। আজকাল ভোট কারো পকেটে থাকে না, সব লোকই চালাক হয়ে গেছে। আমরাও ভোট ভাঙ্গাতে জানি।—চলুন, আসুন আজ পণ্ডিতপাড়ার দিকেই যাব।

তাহাই হইল। কথায় কথায় তাহারা পণ্ডিতপাড়ার দিকেই চলিল। বঙ্কু বলিল, মিস্ দাস খুব দামী কথাই বলেচেন, মণিদা, আজকাল সত্যিই ভোট কোনো লোকেরই কনট্রোলে নেই। বাপ ছেলেই তাই একমত হয়ে ভোট দিচ্চে না বাইরের লোকের কথা ত' যেন বাদ। সুতরাং, মণিদা তুমি অনর্থক ভয় পাচ্চ।

মণিশঙ্কর তবুও আশ্বস্ত হইতে পারিল না। কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কোথায়, এবং তাহা যে কী ভাবে এবং কোন্ প্রণালীতে গণশক্তির মনের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে কাজ করিয়া যাইতেছে তাহার কিছুটা খবর মণিশঙ্কর রাখে। রবিরশ্মিপায়ী উদ্ভিদ যেমন করিয়া নীরবে দিনের পর দিন সূর্য্যালোক আহরণ করিয়া করিয়া সঞ্জীবনশক্তি লাভ করিয়া পল্লবে, কুসুমে, ফলে আপনার জীবন সার্থক করিয়া তুলে তেমনি করিয়া গণশক্তি কংগ্রেস-আদর্শের সঞ্জীবনশক্তিতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অভঙ্গুর মেরুদণ্ড লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ইহা কে না জানে? তাই মণিশঙ্করের সংশয় গভীরতর আকার ধারণ করিল। সুধাদি'র মুখপানে চাহিয়া সে বলিল, আপনি বলচেন বটে মিস্ দাস, কিন্তু আমি দেখচি বঙ্কুর পক্ষে ভোট পাওয়া তেমন সোজা হবে না—কংগ্রেস দস্তর মতো ফাইট দেবে। রোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, ঐ শয়তান মেয়েটাই সব সর্বনাশ করলে। ভূদান যজ্ঞের নাম নিয়ে স্রেফ্ কংগ্রেসের হয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্চে—আরে বাবা ভূদানযজ্ঞ মানেই ত' গান্ধীবাদ,

গান্ধীবাদ মানে সর্ব্বোদয় সমাজগঠন। এ সব চালাকি বুঝলেন, এ সব চালাকি বুঝলেন মিস্ দাস। ভূদানযজ্ঞ তো একটা মুখোশ!

শুনিয়া পঞ্চমীর সর্ব্ব শরীর আগুন হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ নাগিনীর ন্যায় সে ফোঁস করিয়া উঠিল, সব চালাকি ভেঙ্গে দোবো, দেখিয়ে দোবো মজাটা —বঙ্কুবাবু আপনি এতটুকুও ঘাবড়াবেন না। আপনাকে জেতাবই জেতাব। ধ্বংস করে দোবো গান্ধীবাদ, পুড়িয়ে ছাই করে দোবো চরখা আর ঐ 'জনসেবক' কাগজ! বলিয়াই একটা বড় অর্জ্জুনগাছ দেখিতে পাইয়া তাহার নীচে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—চলিতে চলিতে কথা হয় না, বলার আবেগটাও যেন ঠেকা খাইতে খাইতে পথহারা হইয়া যায়।

বাঃ, কী সুন্দর কথা বলিয়া গেল। অপূর্ব্ব! বঙ্কু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, বিধাতা, তুমি নিষ্ঠুর হইলেও উদার, তমিস্রার পশ্চাতেও তুমি জ্যোতিকে রাখিয়া দিয়াছ,—যাহাকে কাঁদাইবার ক্ষমতা দিয়াছ তাহাকে হাসাইবারও ক্ষমতা দিয়াছ। কিন্তু তাহার তো আর হাসিবার ক্ষমতা নাই,—কান্নার ভিতর দিয়া তাহার সমস্ত হাসিকে সে তো ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ সে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। পঞ্চমী সেটা শুধু এক পলক ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া লইয়া স্মিতমুখে বলিল, কী হল, একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন বুঝি? আপনি মনে জোর করুন, ভয় পাবেন না। আপনার হার মানে আমাদেরও হার—এটা আপনি জানবেন, বঙ্কুবাবু।

বঙ্কুর ঘোর কাটিয়া গেল। পঞ্চমীর মুখের দিকে না তাকাইয়া শুধু মণিশঙ্করের দিকে চাহিয়া সে বলিল, এরা সব কথা জানেন না বলেই তাই ও' কথা বলচেন—কী বল মণিদা'? মণিশঙ্কর পঞ্চমীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, ও যে মস্ত বড় ভুল করে ফেলেচে কিনা তাই বার বার সন্দেহ আসচে ওর মনে। আমাদের পার্টির যাবতীয় ভেতরের খবর ঐ মেয়েটির মারফত ভুবনবাবুর কাছে চলে গেছে। আমি বার বার বারণ করেছিলাম বঙ্কুকে, বিশ্বাস ক'র না, বিশ্বাস ক'র না ও মেয়েকে, কিন্তু আমার কথা ত আর ও শুনল না, এখন পস্তাচ্ছে।

বঙ্কুবাবুর হইয়া নিজেই যেন অনুশোচনা করিয়া রাগের জ্বালায় পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, ইস্, এত বড় একটা ভুল কখনো মানুষে করে!—আপনি

কেন যে তাকে এতটা বিশ্বাস করতে গেলেন?—এ [illegible] প্রতিশোধ, রক্তের ভিতর দিয়ে নিতে পারলেও যেন শেষ হয় না।

বঙ্কু স্তব্ধ হইয়া নিশ্চলের মতো এক দিকে দাঁড়াইয়া শুধু দুই ভ্রূ একবার কুঞ্চিত করিল,—মুহূর্ত্তের মধ্যে সে যেন একেবারে পাষাণ হইয়া উঠিল।

সুধাদি বলিয়া উঠিলেন, এ শয়তানির উচিত শিক্ষা আপনাকে দিতেই হবে বঙ্কুবাবু। আপনি ভয়ঙ্কর weak minded, অবশ্য আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

পঞ্চমী বলিয়া উঠিল, উনি দমে গেলেও আমরা ওনাকে কিছুতেই দমতে দোবো না, বলিয়া বঙ্কুর মুখপানে চাহিয়া একটা ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, প্রয়োজন হলে এ হাত রক্তের দাগেও কলুষিত করতে পারি, বঙ্কুবাবু।

কথাটা যেন মণিশঙ্করকে চুম্বকের শক্তিতে টানিয়া ধরিল। মনে মনে ভাবিল, তাইতো ঠিক তাহার নিজের মনের কথাটাই যেন বলিয়া দিল, তাই পঞ্চমীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করি, মিস্ গাঙ্গুলী। জিততে আমাদের হবেই, যে করে' হোক।

সুধাদিও যেন বেশ তাতিয়া উঠিয়াছেন। তিনিও দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেচেন মণিবাবু, জিততে আমাদের হবেই, যে করে, হোক।—কী বঙ্কুবাবু, আপনি চুপ করে আছেন কেন? অবশ্য জানি আপনি চুপ করে থাকবেন, তবুও আপনি কিছু একটা বলুন, শুনি।

বঙ্কু সুধাদির উদ্দীপ্ত মুখচ্ছবির প্রতি শান্তভাবে চাহিয়া বলিল, বুঝি সব, মিস্ দাস; কিন্তু রাতারাতি আমরা কী করে অতটা দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠি, বলুন? কংগ্রেস ধাপ্পাবাজি করচে বুঝচি; কিন্তু তবুও মুখ বুঝে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই বর্ত্তমানে। নির্বাচনটাকে মাটি করা চলে না এবং জিততে আমাদের হবেই।

পঞ্চমী ডান হাতের ঘুষিটা পাকাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আল্‌বত জিতবো আমরা!—চলুন কোথায় যাবেন বলছিলেন, চলুন আজ পণ্ডিতপাড়ার ভেতর দিয়েই ঘুরে আসি।

আবার সকলে হাঁটিয়া চলিল।

পণ্ডিতপাড়ায় আজ আর তাহাদের ঢুকিবার উপায় নাই। অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভূতপূর্ব ঘটনা—হাওয়া আজ উজানে বহিতে সুরু করিয়াছে। যে কংগ্রেসের

কুশপুত্তলের দাহ দেখিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বেও এ পাড়ার লোকেরা তামাশা করিয়া হি হি হি, হো হো, করিয়া হাসাহাসি করিয়াছিল আজ তাহারা জোড়াবলদকে মাথায় তুলিয়া লইয়া নাচানাচি করিতেছে; সকলেরই মুখে ঐ একই কথা, কংগ্রেস ছাড়া আর দ্বিতীয় দল কোথায়? উগ্রপন্থীদের এতটুকুও বিশ্বাস নাই, তাহারা শুধু দলাদলিই জানে।

ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বন্ধুর মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই দিন আগেও যাহারা ত্রিশূলএর পক্ষে ভোট দিবে বলিয়া কথা দিয়াছিল আজ তাহারা তাহাকে দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মণিশঙ্করেরও আর মুখ নাই, সেও অনেকটা দমিয়া গিয়াছে। পঞ্চমী সুধাদির মুখ চুন!—আর তাহাদের সে আস্ফালন নাই।

এমন সময় বিলয় একখানা প্রচারপত্র হাতে করিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, ওঃ ওকে খুন করলেও রাগ যায় না, কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেচে, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ একবার, দ্যাখ্‌, বন্ধু, dangerous মেয়ে,—পড়ে দ্যাখ্‌, পড়ে দ্যাখ্‌, একবার কী লিখেচে। শুনিয়া বন্ধুর বুকখানা ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; রোষে, বেদনায় ঘৃণায় তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন সাড়া দিয়া উঠিল; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাতেও সে অটল,—ক্ষণকালের মধ্যে সে নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া, প্রচারপত্রখানা হাতে লইয়া শুধু একবার চোখ বুলাইয়া গেল—লাইন ধরিয়া ধরিয়া পড়িয়া যাইবার মত সে মনের জোরটা কোথায়? কলি যে সব কিছুই হরণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেছে, তাই সবই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

পঞ্চমীর প্রবল আগ্রহ হইল; সে এক রকম টান দিয়াই প্রচারপত্রখানা বন্ধুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিল। সুধাদি'ও তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া—একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া—পড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কয়েক লাইন পড়িয়া যাইবার পরে উহাদের আর ধৈর্য্য রহিল না। পঞ্চমী নাক সিঁটকাইয়া কুটিল ভ্রূভঙ্গিমায় বলিয়া উঠিল, হুঁ এ আবার পড়ব কী, দূর দূর rubbish, সেই একঘেঁয়ে কথা। বন্ধুবাবু এ আপনার পড়বার মতই নয়! বলিয়া পত্রখানা মণিদার হাতে আগাইয়া দিতে গেল, কিন্তু মণিশঙ্কর রাগের জ্বালায় তাহা স্পর্শই করিল না। সুধাদি' বলিয়া উঠিলেন, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দাও দিদি, আমাদের

ও জিনিস পড়াও পাপ।

—সত্যি, ঠিক বলেচো সুধাদি, দি' ছিঁড়ে ফেলে দি', বলিয়া যেই সে কাগজখানা দুই হাতের আঙুলের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে যাইবে অমনি বঙ্কু হঠাৎ পঞ্চমীর বাঁ-হাতখানা চাপিয়া ধরিয়াই আবার নিমিষকাল মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, ছিঁড়বেন না, দিন ও'টা আমার হাতে দিন বলিয়া একটু হাসিল। পঞ্চমী বঙ্কুর ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কেন বাধা দিলেন কেন, ও দিয়ে আর আমাদের দরকার কী বলুন!

বঙ্কু বলিল, এর উত্তর ত' আমাদের দিতে হবে কেননা ভোটাররা এর জবাব ত' চাইবে আমাদের কাছ থেকে! কী বলব তখন তাদের, বলুন?

পঞ্চমী বলিল, যে ভোটাররা নির্ব্বাচনের শেষ সময় এসব প্রশ্নের জবাব চায় তাদের জবাব দিয়ে কোনো ফল হবে না বঙ্কুবাবু—যারা এখনও কিন্তু-কিন্তু করচে তাদের কথার কোনো মূল্য নেই। এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া মানে উপহসিত হওয়া। যারা সত্যি ক'রে আমাদের পার্টিকে ভালবাসে, আমাদের মতবাদকে আমাদের কথাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, তাদের কাছে আবার উত্তরের কী প্রয়োজন? তারা খেতে পাচ্চে না, পরতে পাচ্চে না, মাথা গোঁজার জায়গা পাচ্চে না শিক্ষা পাচ্চে না চিকিৎসা পাচ্চে না—এর থেকে বড় জবাব আর কী থাকতে পারে বলুন? যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ না বোঝে তাদের না খেতে পেয়ে মরাই ভাল, বঙ্কুবাবু। বলিয়া বঙ্কুর হাতে কাগজখানা অশ্রদ্ধার সহিত ফিরাইয়া দিল।

বঙ্কু শুধু কাগজখানা হাতে করিয়া ধরিয়াই রহিল—একটা লাইনও আর পড়িতে মন সরিতেছে না। মনে মনে ভাবিল, কলি যেন আবার দ্বিতীয় রূপ ধরিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেও ত ঠিক এমনি করিয়া যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়া বার বার তাহাকে পরাজিত করিত। না, ইহার কথার মধ্যে যুক্তি আছে বটে এই ভাবিয়া কাগজখানা সে বিলয়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চমী হাসিয়া বলিল, না না না থাক, আপনি পড়ে দেখুন, বলিয়া আবার বিলয়ের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া সুধাদি'র হাতে দিয়া বলিল, পড়ে দেখো ত' সুধাদি', কী লিখেচে। বলিয়া পথের মাঝে দাঁড়াইয়া পড়িল।

বঙ্কু হাসিয়া বলিল, না না কিছু দরকার নেই মিস্ দাস, মিস গাঙ্গুলী

ঠিকই বলেচেন।

—না থাক না, তাতে কী হয়েছে, পড়েই দেখা যাক না, বেশী সময় ত' লাগবে না, বলিয়া সুধাদি', কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া, পড়িয়া যাইতে লাগিল,—……বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করে দেশময় বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেচে ও গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অংশের কিছুটা আজ বিশেষ ভাবে অবহিত আছেন বলে প্রকৃত সমাজসেবিগণ বিশ্বাস করেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে হ'লে উৎপাদন বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু উৎপাদনের বৃদ্ধি করতে হলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই; এবং যতদিন না আমরা ঐ বিষয়ে বহুলাংশে স্বয়ংসম্পুর্ণ হ'তে সক্ষম হচ্চি ততদিন কিছু অসুবিধা আমাদের ভোগ করতেই হবে। অবশ্য আমাদের দিক থেকে কিছুটা ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করে নিতেই হবে, কেননা ভবিষ্যৎ সন্তানগণ যাতে সুখে ও সমৃদ্ধিতে প্রকৃত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার সুযোগ পায় সেই দিকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য। তা ছাড়া ত্যাগের সংগে সংগে কিছুটা ধৈর্য্যাবলম্বনেরও প্রয়োজন, কেননা রাতারাতি কোনো একটা সামাজিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে যাওয়া যুক্তিবর্হিভূত কাজ হবে। আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দিকে পৌঁছতে হবে। তারপর আরও একটা কথা এই, দ্রুতগতিতে দেশময় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যখন বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয় তখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবী ও কায়শ্রমজীবীদের প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। তাই সমস্যাটির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে গ্রামশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং তৎসহ নূতন কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করার উদ্দেশে কংগ্রেস সরকার কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেচে; এতদসম্পর্কে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা মারফত ক্রমোন্নতির প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

তারপর গ্রামশিল্প হিসাবে কুটিরে কুটিরে খাদি প্রস্তুত ও প্রচলনের উদ্দেশে এবং প্রত্যক্ষভাবে বেকার নারী ও পুরুষদের মধ্যে কর্ম্মসংস্থানের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্চে। এতদুদ্দেশ্যে গান্ধীজী প্রদর্শিত নীতি স্বীকার করে নিয়ে

চলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বার বার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দি' যে, উগ্রপন্থীরা যারা আপনাদের ভ্রান্তপথে চালিত করে নেবার চেষ্টা করছেন তাঁরা শুধু ক্ষমতা লোলুপতার লড়াইয়ে উন্মত্ত হয়ে আছেন। যা' বাস্তব তাকেই তাঁরা উপেক্ষা করে চলেছেন, সুতরাং বর্ত্তমানে গান্ধীজী পরিকল্পিত সমাজনীতি ও অর্থনীতিতেই আপনাদের আস্থাবান হওয়া সমীচীন বলে সমাজসেবিগণ বিশ্বাস করে। ভূদান যজ্ঞের সর্ব্বময় সাফল্যের মধ্য দিয়েই আমাদের অর্থনৈতিক উৎকর্ষতাকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। তবে হ্যাঁ, কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে যদি সাম্যবাদ গড়ে ওঠে তবে তা' দুর্দমনীয়। ভারতের ধর্ম, তার সমাজ, তার ঐতিহ্য, তার সভ্যতা ও তার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, মৌলিকতা, অখণ্ডতা ও প্রাচীনত্বই তার সত্যিকারের সত্বা—তার অন্তর্নিহিত শক্তির অম্লান প্রতীক। সুতরাং ভারত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কাছে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই চলে আসবে। পার্থিব সুখৈশ্বর্য সসীম, কিন্তু অন্তরের শান্তি অনন্ত, তা' অনির্ব্বচনীয়, দুষ্প্রাপ্য, ও সাধনায় সিদ্ধ, তাই ভারত সেই শান্তির আরাধক উপাসক। ভারত অমৃতত্বের সন্ধাতা। সে চায় মুক্তি—সত্যতম মহত্তম মুক্তি—তাই তার অন্তরের নিগূঢ়তম কথা হল, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তাই আপনারা ভারতের সেই সুমহান আদর্শকে তার বৈশিষ্ট্যকে দৃষ্টিপথে রেখে সমাজকল্যাণের পথে অগ্রসর হ'ন। ভারত ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে বিদেশের দ্বারে যাবে না বরং বিদেশের যদি প্রয়োজন হয় তো তারা এ' দেশে আসতে পারে—অমৃতত্বের সন্ধান তারা নিয়ে যাক। তাই বলি, আগে আপনারা আপনাদের নিজের দেশকে জানুন, ভারতকে জানুন, ভারতকে জানতে হলে তার ইতিহাসের, তার সমাজ জীবনের ধারাবাহিকত্বের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করুণ। স্বামীজী, গান্ধীজী ও পণ্ডিতজী ভারতকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন আপনারাও তাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতর দিয়ে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে আমি ব'লব ভারতের এই আধ্যাত্মিক মাটিতে রাশিয়ার বা চীনের বস্তুতান্ত্রিক কোনো তন্ত্রই স্থান পেতে পারে না; উগ্রপন্থীদের এ কেবল ভাববিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।—জয় হিন্দ.

সুধাদি' থামিবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়া গেল—ইহাদের প্রত্যেকের শরীরের রক্ত যেন একসঙ্গে গরম হইয়া উঠিল। মণি-

শঙ্কর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বঙ্কুর স্তম্ভিতদৃষ্টি মুখপানে চাহিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, Dangerous, dangerous woman! বঙ্কু, তুমি তোমার নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেচ······ইস্! এইভাবে betray করল! ওঃ ওকে খুন করলেও যেন রাগ যায় না!

বঙ্কু একেবারে স্তম্ভিত—তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথবীটা যেন ক্ষণ কালের মধ্যে ঘোর অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। ভাবিতে গেলেও তাহার বুকটা ভাঙ্গিয়া যায়,—ওঃ, কলি যে আজ তাহার এতদূর সর্ব্বনাশ করিতে পারে ইহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইতিপূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারে নাই। স্তব্ধ হইয়া সে খানিকক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিশঙ্করের দেখাদেখি পঞ্চমীও যেন এক হিংস্র মৃগীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, সভ্যতার শত্রু—এদের মতো মেয়েদের গুলী করে, আগুনে পুড়িয়ে মারলেও রাগ যায় না! উঃ আপনি কী ভুলই করেচেন বঙ্কুবাবু! কুকুর বেড়ালের মতো এদের থেঁতলে মারা উচিত।

বঙ্কুর মধ্যে এখন আর সে বঙ্কু নাই—ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল, এদের কোনো অপরাধ নেই মিস্ গাঙ্গুলী, অপরাধ আমাদেরই, অপরাধ এই মৃতপ্রায় জাতের।

পঞ্চমী অভিমানদগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাদের আপনি এতো ছোটো করে দেখচেন কেন? আশ্চর্য! আমাদের নিজেদের দোষ এ কথা আপনি কী করে বলচেন?

বঙ্কু বলিল, এ দোষ আমাদেরই কেননা আমরা এখনো পর্যন্ত সত্যিকারের বিদ্রোহী তৈরী করে উঠতে পারি নি। তা' না হলে দেখুন না, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব হাত পা গুটিয়ে বসে আছে—না খেতে পেয়ে মরবে তবুও মুখ দিয়ে একটি রা' পর্যন্ত বেরোবে না। এ জাতের যে কী হবে তাই ভাবি!

সুধাদি আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনি এতে ভয় পাবেন না বা হতাশ হবেন না বঙ্কুবাবু! এমনি করে ধীরে ধীরে দেশ তৈরী হয়ে উঠবে। এ নির্ব্বাচনে হয়তো আমাদের পরাজয় হতে পারে তবুও এই পরাজয়ের ভেতর দিয়ে একটা জিনিস কী পরিস্ফুট হয়ে উঠচে জানেন, কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় মনোভাব, কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজি, কংগ্রেসের নিষ্ঠুর অদূরদর্শিতা। কিন্তু

কংগ্রেসের এ প্রতারণা, এ অবিচার দেশ বেশী দিন সহ্য করবে না। এই যে আজ একটা বলিষ্ঠ বিরোধীদল গড়ে উঠেচে এটা কম আশা ও আনন্দের বিষয় নয়। আপনি ঘাবড়াবেন না বঙ্কুবাবু।

বঙ্কু যেন আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া বলিল, না না ঘাবড়াবো কেন, এতটুকুও ঘাবড়াইনি।

পঞ্চমী চোখ মুখ পাকাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ঘাবড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না, কী বলচ কী সুধাদি'? বলিয়া বঙ্কুর শান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ আপনাকে নিতেই হবে বঙ্কুবাবু। ইলেকসন পণ্ড করে দোবো, কংগ্রেসকে কিছুতেই জিততে দেবো না। দরকার হলে খুন জখমও করতে হতে পারে, আপনি যেন আপত্তি করবেন না তাতে।

মণিশঙ্কর উৎসাহ পাইয়া সরোষে বলিয়া উঠিল, আপত্তি করলেও সে আপত্তি শুনচে কে?

—আঃ মণিদা' মাথা ঠাণ্ডা কর, বলিয়া বঙ্কু মৃগলুব্ধ শার্দুলীদৃষ্টি পঞ্চমীর হিংস্র চেহারাটার পানে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, সামান্য একখানা প্রচার-পত্র পড়ে একটুতেই মাথা গরম করা কী ঠিক হবে মিস্ গাঙ্গুলী? অবশ্য আমি বুঝতে পারচি আপনি আমাদের পার্টিকে এত বেশী রকম ভালবাসেন যে, শুধু তাই নয়, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে, সত্যিকরেই আপনার রাগ হতে পারে। কিন্তু ইলেকসনের মুখে মাথা গরম করে কোনো লাভ ত' নেই মিস্ গাঙ্গুলী। বরং আসুন। চলুন পাড়ার ভেতরে ঢুকে হাওয়টা একটু বুঝে আসা যাক্।

সুধাদিও বলিলেন, বঙ্কুবাবু কথাটা মন্দ বলেন নি দিদি, চল না একবার দেখেই আসি না কেন হাওয়টা কোন দিকে—অবশ্য কোনো লোকটাকেই বিশ্বাস নেই ভোটের ব্যাপারে, ঐ মুখেই বলচে, কাজের বেলা কে যে কী করবে বলা শক্ত। বলিয়া সুধাদি' হাঁটিয়া চলিলেন।

বহুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিয়া শুনিয়া এবং তথ্য সংকলনের পরে আপাতদৃষ্টিতে বুঝা গেল কংগ্রেসএর পক্ষেই অধিকাংশ ভোটার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তবুও বঙ্কু আশা ছাড়িল না—সে এখনো বিশ্বাস করে তাহার সহিত কেহই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

এই ভাবিতে ভাবিতে সে সকলকে লইয়া মুসলমানপাড়ার দিকে চলিল।

উনত্রিশ

আজ নির্ব্বাচনের দিন—গণতন্ত্রের সফলতার দিন। তাই আজ সকাল হইতেই দুই দলেরই মধ্যে একটা প্রচণ্ড কর্ম্মব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পোলিং বুথ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দুই প্রধানের মধ্যে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতাও সুরু হইয়া গেছে। প্রথম দিকটায় বলিতে গেলে ভোটের সংখ্যা একরকম মাথায় মাথায় চলিতেছিল এবং উগ্রপন্থীদের তৎপরতা ও দলের প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য থাকার দরুণ ভোটারগণ তাহাদের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল দেখা গেল জোড়াবলদের পক্ষে ভোটের সংখ্যা ক্রমশঃই আরোহের দিকে উঠিয়া চলিতেছে এবং উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্ন বিরতির পরে অবস্থা অকস্মাৎ কংগ্রেসের অনুকূলে এমনি একটা পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করিয়া বসিল যে, শেষ পর্যন্ত বামপন্থিগণের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করা একটা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল, এমন কী এটাও দেখা গেল যে, বঙ্কুর বহু সমর্থকও প্রকাশ্য ভাবে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভুবন-বাবুর দলের সহিত নির্লজ্জভাবে মিশিয়া গিয়া কংগ্রেসের অনুকূলে ভোট ভাঙ্গাইতে সুরু করিয়া দিল। ফলে শেষের দিকে অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, বঙ্কুর লোকেরা আর ঠাঁইই পাইল না—দলে দলে লোক গিয়া জোড়াবলদের বাক্সতে ভোট দিতে লাগিল। খবর পাইয়া পঞ্চমী সুধাদি' বা মণিশঙ্কর কেহই আর ও-মুখোই হইল না।

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান চিকিৎসক মুমূর্ষু রোগীর ঘরে পদার্পণ করিয়াই দূর হইতে তাহার চোখ মুখের চেহারা দেখিয়া যেমন মুখ বুঝিয়া বাহির হইয়া চলিয়া আসে তেমনি বঙ্কু কয়েকটি কেন্দ্রের দূরে দাঁড়াইয়া তাহার পার্টির কর্ম্মীদের মন-মরা মুখের অবস্থা দেখিয়া বুথ বন্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা আরাম কেদারার উপর শ্রান্ত দেহটা এলাইয়া দিয়া নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। জীবনে

সে এত বড় একটা আঘাত তো কখনো পায় নাই। নির্বাচনে পরাজয়ের বেদনা আজ তাহার কাছে বড় বেদনা নয়; এ বেদনা, এ অনুশোচনা নিতান্তই সাময়িক, নিতান্তই তুচ্ছ, ইহাদের সে এক মুহূর্তেই ভুলিয়া যাইতে পারে এবং ভুলিয়া যাইবেও। কিন্তু যে দুঃখ, যে বক্ষবিদারণ বেদনা আমরণ তাহাকে শুধু কাঁদাইয়া কাঁদাইয়া রিক্ত করিয়া যাইবে সে দুঃখ, সে পরাজয়ের অঙ্কুশ আঘাতের যন্ত্রণা সে কেমন করিয়া ভুলিতে পারিবে! কেমন করিয়াই বা নীরবে সহ্য করিয়া যাইবে,—ইহার চেয়ে বড় দুঃখ, বড় বেদনা যে পৃথিবীতে আর নাই—হৃদয় যেখানে নির্ম্মমভাবে, অসহায় ভাবে প্রবঞ্চিত সেখানে সকল যুক্তিই যে ম্লান হইয়া আসে। আজ কলির সহিত সেই প্রথম দিনের সেই প্রাণ ভরিয়া আলাপের কথাটা তাহার মনে পড়ে—সেই দৃশ্যটা আজও তাহার চোখের সামনে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। শীতের সেই রৌদ্রভরা প্রভাতে শস্যভারে শুইয়া-পড়া ধান ক্ষেতের আলের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া কলি সেদিন কত কথাই না বলিয়া গেল। সে সব কথা মনে হইলে আজ তাহার দুই চক্ষু শুধু জলে ভরিয়া উঠে। শুধু এই কথাই সে ভাবিয়া মরে, কলি যদি আজ কেবলমাত্র একটিবার তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত তাহা হইলে আজিকার এই পরাজয় বিজয়ের এক অপূর্ব্ব অম্লান বৈজয়ন্তী হইয়া সগর্বে উড্ডীন হইয়া তাহাকে এক অনির্ব্বচনীয় হ্লাদ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া কোন এক মধুময় পথে টানিয়া লইয়া গিয়া এক নব জীবনের ভাস্বর সঙ্কেত দিয়া যাইত। কিন্তু হায় রে। আজ নির্জনে বসিয়া কাঁদিবারও যেন তাহার অবসর নাই—এমন কী সে স্বাতন্ত্র্যটুকুও নাই—যেন হাসিমুখেই এই প্রতারণাকে এই পরাভবকে তাহার স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে কোন্ অবসরে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া জল নামিয়া আসিল,—যে বিচ্ছেদবিরহবহ্নি আজ কয়েক দিন ধরিয়া তাহার অন্তরের নিভৃত কক্ষে ধীরে ধীরে রহিয়া রহিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল আজ যেন তাহা সহস্র শিখায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে দগ্ধীভূত করিয়া তুলিল। তবুও এ দহন জ্বালা, এ ব্যর্থতার নিষ্করুণ আঘাত তাহাকে মুখ বুঝিয়াই সহ্য করিয়া যাইতেই হইবে; এ নয়নাশ্রু মুছিয়া ফেলিতেই হইবে। বাঃ, আবার

সে কেমন শক্ত হইয়া উঠিল ; রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া লইল। কিন্তু মনটা ত' মানে না ; আবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিল—এ যেন কঠোর শাস্তি—তাই তাকে সুস্থ করিয়া লইবার জন্য হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পঞ্চমী ও সুধাদি' আসিয়া উপস্থিত হইল।

পঞ্চমী ঘরে প্রবেশ করিয়াই একটা আতসবাজির মতো হঠাৎ বিস্ফোরিত হইয়া বলিয়া উঠিল, প্রত্যেক লোকটাই বেইমান্! প্রত্যেক লোকটাই বেইমান্! ইস্ একেবারে পথে বসিয়ে দিলে! বলিয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটা একটা বিশেষ ভঙ্গীতে নাচাইয়া রাগের ঝাল মিটাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলুম এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা দেশের কোনো লোকটার জন্যে কোনো উপকার করব না, বঙ্কুবাবু!

অপূর্ব্ব, বঙ্কু কী সুন্দর অভিনয় করিয়া গেল—এ যেন সীতাকে বনবাসে দিতে গিয়া পথিমধ্যে শোকাভিভূত লক্ষ্মণের অভিনয়। বঙ্কু মৃদু হাসিয়া বলিল, সামান্য একটা ইলেকসনে হেরে গিয়ে এত বড় একটা নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করে ফেল্‌লেন, মিস্ গাঙ্গুলী। হেরে হয়ত আমি যাবো, কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? আবার দাঁড়াব ; এখন থেকে আবার আপনারা এসে কাজ করবেন। ভোটারদের বিশ্বাস করাও ভুল, না করাও ভুল। পলিটিক্সএ হারজিত আছেই মিস্ গাঙ্গুলী।

সুধাদি' বলিয়া উঠিলেন, নিরক্ষর ভোটারদের কথা নয় বাদ দিন বঙ্কুবাবু, ভাল মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা অবশ্য তাদের অনেকেরই নেই ; কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের এবং আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, আপনার যারা supporter যারা আপনার বন্ধু তারাই বেইমানি করল বেশী।

বঙ্কু দুঃখ চাপিয়া একটা করুণ হাসি হাসিয়া বলিল, জানি ত, কিন্তু উপায় কী ছিল বলুন, কিছু করবার ছিল না মিস্ দাস।

পঞ্চমী একটা মোড়া টানিয়া লইয়া, বঙ্কুর অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়াই, বসিয়া পড়িয়া তাহার মন-মরা মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, করবার যথেষ্টই ছিল বঙ্কুবাবু আপনি কিছুই করেন নি। আপনি যাকে সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস করতেন শুনলুম সে-ই তো আপনাকে ডোবালো। উঃ, রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে যাচ্চে—তাকে ক্ষমা করা যায় না। মেয়েটাকে

খুন করলেও রাগ যায় না। আমার, বলে কী না উগ্রপন্থীদের ভোট দিলে খেতে পাবে না। তোরা কী খেতে দেবার মালিক? scoundrel! সমাজের রক্ত শুষে খাচ্ছিস্, আবার কথা বলিস্! বলিতে বলিতে তাহার রক্ত একেবারে গরম হইয়া উঠিল।

সুধাদি'ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, না না এত বড় প্রতারণা কখনো সহ্য করা যায় না বঙ্কুবাবু। ভূদান যজ্ঞের নাম নিয়ে ধাপ্পাবাজি করে ঐ শয়তান মেয়েটা রীতিমতো আমাদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে চলে গেল, আর আপনি এদিকে চুপ করে বসে রইলেন। ওঃ আপসোসে বুকখানা ভেঙ্গে যাচ্ছে—। সত্যি, আপনার জন্যে কষ্ট হয় বঙ্কুবাবু।

পঞ্চমী বলিল, আমারও কী কম দুঃখ সুধাদি'? কিন্তু রাগে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করচে।

বঙ্কুর হাসি ছাড়া গতি নাই; সে কেবল একটু হাসিল। কিন্তু এ হাসি ত' প্রাণ খুলিয়া হাসি নয়, ইহা যেন তীব্রতম গভীরতম মর্ম্মবেদনার কান্নাকেও ছাড়াইয়া গেল, ইহা যেন নিজেকে কঠিন করিয়া লইবার, নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার হাসি। কিন্তু অন্তর ত' হাসিতে দেয় না—সে যেন বার বার তাহার ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরে, নিভৃত কক্ষ হইতে বলে কান্নার ভিতর দিয়াই হাসিটাকে লুকাইয়া রাখ, শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কান্নাকে মধুর করিয়া তোলো। ভিতরে ভিতরে আবার সে কাঁদিয়া উঠিল; কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে—মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। মাথাটা নীচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া চিবুকটা ধরিয়া চুপ করিয়া পালঙ্কের এক কোণে বসিয়া নিজের এই ছন্নছাড়া জীবনের কথা ভাবিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে মণিশঙ্কর বিলয় এবং আরও অনেকে আসিয়া ঘর ভরিয়া ফেলিল। মণিশঙ্কর নিন্দুক, হিংসুক, চুক্‌লিখোর, স্বার্থপর, সে কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, বরং অন্যের এমন কী তাহার পরম আত্মীয় বা বন্ধুর অনিষ্ট সাধন করিতেও সে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করে না। বঙ্কু যে আজ হারিয়া গেছে ইহাতে তাহার এতটুকুও দুঃখ নাই, লজ্জা নাই, আপসোস নাই—বুকের ভিতরটা তাহার আজ অত্যন্ত হালকা বোধ হইতেছে, ওঃ অনেকটা শান্তি! আবার বঙ্কু যদি আজ জিতিয়া যাইত তাহা হইলে সে যে আজ কী ভাবে ঈর্ষার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া

মণ্ডিত তাহা কল্পনা করাও কঠিন। অবশ্য ভুবনবাবু জিতিয়া যাওয়াতেও সে এতটুকুও খুশি নয়। নারী হৃদয় জয় করিবার বাসনা কাহার চিত্তে নাই? যাহার নাই সে নিষ্ঠুর, সে হৃদয়হীন, সে অমানুষ—আর নয় সে অতিমানব। মণিশঙ্করের মধ্যেও এ বাসনা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু নারীর প্রেম কামনা করিবার মতো সে সাহস, সে মনের দৃঢ়তা ও সে উদারতা-টুকুও তাহার মধ্যে নাই; অথচ ভাগ্যবানের ভাগ্যকে হিংসা করা তাহার স্বভাব, উহাতেই তাহার বড় আনন্দ। এমন কী যে নারীর প্রতি তাহার এতটুকুও আসক্তি নাই তাহাকেও যদি সে, তাহার কোনো প্রেমাস্পদের প্রতি অনুরক্ত হইতে দেখে তাহাতেও তাহার ঈর্ষা হয়, মনটা খাঁ খাঁ করিয়া উঠে। তাই মণিশঙ্করের চরিত্র, তাহার বিচিত্রগতি স্বভাব প্রত্যেকেরই নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া আছে। তাহাকে আজ পর্যন্ত কেহ চিনিতে পারে নাই, পারিবেও না।

ঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কদাকার করিয়া ভিতরে ভিতরে বেশ একটা সোয়াস্তি অনুভব করিয়া বন্ধুর বেদনাজর্জ্জরিত ম্লান মুখটার দিকে তাকাইয়া মণিশঙ্কর বলিয়া উঠিল, ঢের ঢের মুর্খ দেখেছি, তোমার মতো এ রকম মুর্খ দেখিনি, নিজের পায়ে নিজেই আজ কুড়ুল মেরেচ। কেমন? কেমন betray করল দেখলে ত'? ভালই হয়েচে, ঠিক হয়েছে, যেমন বিশ্বাস করতে গিয়েছিলে। বলিয়াই ঝপ্ করিয়া পালঙ্কটার আর এক কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল।

বন্ধু তবুও নীরব রহিল।

দেখাদেখি পঞ্চমীও মণিশঙ্করের কথায় সায় দিয়া বন্ধুর আনত মুখের দিকে এলোমেলো ভাবে তাকইয়া অবজ্ঞামিশ্রিত নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ জাতটাকে আপনি এতটা বিশ্বাস করলেন বন্ধুবাবু! ছিঃ, যারা খ্রীষ্টান মিশনে মানুষ হয়েচে তারা ত' কংগ্রেসের পা-চাটবেই, এটা আপনার বোঝা উচিত ছিল। আপনার মতো এমন একজন intelligent, শুধু ইন্‌টেলিজেণ্ট্ বল্লেও কম বলা হয়, এত বড় একজন sagacious, অর্থাৎ কিনা অতি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ যে এমন একটা মারাত্মক ভুল করে বসবে, এ জিনিস ভাবতেও পারি না বন্ধুবাবু। আজ আমার কত দুঃখ হয় আপনার জন্যে—এমন মানুষ এ-ভাবে প্রতারিত হ'ল। সত্যি, বছর খানেক আগেও যদি আপনার সঙ্গে

আলাপ হ'ত তা' হলে······

গিরিগহ্বরে চাঁদের আলো প্রবেশ করিয়াও যেন করে না, তাহা কেবল বাহির হইতে শুধু চাহিয়াই থাকে,—বঙ্কু যেন ঠিক তেমন অন্ধকার হইয়াই বসিয়া রহিল, সে-আলো কী কোনদিনই তার তমিস্রাচ্ছন্ন মনের আধারে গিয়া প্রবেশ করিবে? হঠাৎ তাহার সে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। পঞ্চমীর মুখ-পানে ঠিক সেভাবে চাহিয়া কথা বলিতে কেনই যেন তাহার লজ্জা আসিয়া গেল। নিজেকে একটু কঠিন করিয়া লইয়া মণিশঙ্করের কুভঙ্গিমামিশ্রিত মুখের চেহারাটার প্রতি একটা শান্ত দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, এ সব কথার কোনো যুক্তি নেই মণিদা'। আমার হিন্দু-মুসলমান ভাইয়েরাই বা কী করল, বল?

উত্তরে পঞ্চমী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, যত নষ্টের গোড়া ত ঐ শয়তান মেয়েটাই। হিন্দুই বলুন আর মুসলমানই বলুন সকলের মাথা খেয়েছে ও-ই, যা' শুনলুম সব। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া বলিল, এটা আমি অবশ্য বুঝতে পারচি যে আপনি এভাবে প্রতারিত হয়েছেন বলেই এ কথা বলচেন বঙ্কুবাবু।

বঙ্কু শান্তকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ প্রতারিত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার দেশের লোক যে আমায় প্রতারণা করল তার জন্য দায়ী কে বলুন? তার জন্য দায়ী ত' আমিই। বলিয়া মাথাটা নীচু করিয়া রহিল।

পঞ্চমীর মনটা যেন একটা মোচড় খাইয়া উঠিল, রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, যাক্ আর আপনাকে বুঝিয়ে পারব না। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি এই যে, আজ যদি আমাদের দলকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে এই জাতের বেই-মানদের উচিত শাস্তি দেওয়ার দরকার, বঙ্কুবাবু।

সঙ্গে সঙ্গে সুধাদি' বলিয়া উঠিলেন, গান্ধীবাদ দুর্বলের ধর্ম্ম, কাপুরুষের ধর্ম্ম, নপুংসকের ধর্ম্ম। দেশে মানুষ চাই; মানুষ চাই, বঙ্কুবাবু। আপনার মতো লোকের উগ্রপন্থীতে যোগ দেওয়া উচিত হয় নি।

বঙ্কুও তবুও নীরব রহিল। শুধু নীরব নয়, ধীর স্থির হইয়া যেমন বসিয়াছিল ঠিক তেমনই বসিয়া রহিল—এমন কী মুখটা তুলিয়াও ইহাদের কাহারও দিকে চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত,—গিরিদেহে পবন যেন বার বার মাথা খুঁড়িয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চমী আবার বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আপনি একবার ভেবে দেখুন ত'

বঙ্কুবাবু, আপনি যে বলচেন এর জন্য দায়ী আপনি নিজে আর আপনার ভোটাররা, এ কথা কী ঠিক? এ কথা আমি মানি না, শুধু আমি কেন, আমরা কেউই মানি না। আচ্ছা বলুন ত, আজ যদি আপনি শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, কারোও সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে, ইলেকসনটা চালিয়ে যেতেন এবং হেরেও যেতেন তাতে কী আপনার এত দুঃখ এত আপসোস, হত? কখনই হত না; তাতে আমাদেরও এত দুঃখ, এত আপসোস্ বা রাগও হ'ত না। কিন্তু আজ আমার ভেতরে যে কী হচ্ছে তা আর আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারচি না, বঙ্কুবাবু—মুখে একেবারে চুনকালি মাখিয়ে দিলে। ইস্! ছি ছি ছি। চোরে চুরি করে নিয়ে গেলে তত দুঃখ, তত আপসোস্ হয় না; কিন্তু যার কাছে বিশ্বাস করে চাবির গোছাটি দিয়ে রেখেচি সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার থেকে বড় দুঃখ, বড় আপসোস, বড় অপমান আর কিছুতে নেই।—আশ্চর্য! আপনি এখনো এ ভাবে মুখ বুঝে বসে আছেন, কথা বলুন। ভুল করেচেন, ভুলের প্রতিশোধ নিন।

বঙ্কু যেন তপ্ত হইয়াও শীতল হইয়া আছে। রক্তের নেশা যে তাহারও নাই এ কথা বলাও ভুল—এ কথা ত' সে একদিন স্পষ্টভাবে কলিকেও বলিয়া ছিল। ইহারা তাহাকে সে ভাবে জানে না বলিয়াই আজ ইহাদের মনের মধ্যে একটা বিরাট সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আজ সে মনে মনে যতবারই ভাবিতেছে সে ভুল করে নাই, ততবারই সে ভাবিতেছে, না, না, সে ভুল করিয়াছে, মস্ত বড় ভুল করিয়াছে, কিন্তু ভুল না করিয়াও যে তাহার উপায় ছিল না—অথচ এ ভুল যে না করে সে যে অতি বড় ভুল করে; এবং ভুলটা না করিবার অনুশোচনায় চির জীবন ধরিয়া তাহাকে শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া রিক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে হয়। ভুলের বেদনার চেয়ে ভুল না করিবার বেদনার তীব্রতা, তাহার গুরুত্ব, তাহার রিক্ততা যে কত অধিকতর, কত অসহনীয় তাহা শুধু তাহারাই উপলব্ধি করিতে পারে যাহারা জীবনে ভুল করিবার সুযোগ পাইয়াছে। অথচ ইহারা যে কী করিয়া এতদুর অসাড় মন হইয়া বার বার তাহার নিস্পিষ্ট মনটাকে লইয়া করুণ ভাবে রগড়াইয়া রগড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে সেটা সে এতটুকুও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে যে কেন ভুল করিয়াছে, কোথায় ভুল করিয়াছে এ সব কথার একবর্ণও ত পঞ্চমী জানে না। বাস্তবিক এই মেয়েটী কী সরল, কী অপূর্ব্ব ইহার চিন্তাশক্তি, কী স্বচ্ছ সুন্দর ইহার যুক্তি-

তর্কের ধারা—সত্যই ইহার মতকে শ্রদ্ধা করিতে আনন্দ হয়, ইচ্ছা হয়। এই ভাবে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু নিজেকে ক্ষণকালের মধ্যে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল, আমাকে আপনাদের জানবার সুযোগ হয়নি বলেই একথা বলচেন। রাজনীতিতে আপোষ চলে না—সততা, উদারতা, কমনীয়তা কিছুই চলে না, এমন কী ক্ষমাও চলে না, মনটাকে পাষাণের মতো ক'রে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা'ও জানি। মানুষ বিশেষে পশুর মতো ব্যবহার করতে হয়, প্রতারণাকে প্রতারণা দিয়ে জব্দ করতে হয়, তা'ও জানি; তা ছাড়া প্রয়োজন হলে রক্ত নেবার নেশা আমার মধ্যেও কম নেই মিস্ গাঙ্গুলী; বুঝলেন মিস দাস। কিন্তু ভোটারদের ত আর ও ভাবে শাস্তি দেওয়া চলে না; তাদের নিজেদের মঙ্গল যদি তা'রা না চায় তাহলে আমি আপনি কী করতে পারি বলুন মিস গাঙ্গুলী; বলিয়া মণিশঙ্করের মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি অনর্থক তাকে দোষ দিচ্চ মণিদা' কিন্তু তার এতটুকুও দোষ নেই, আমি আবার বলব, এ অপরাধ আমার। যাক্‌গে, আর কথা বাড়াব না।—ইস্ এতক্ষণ ধরে বসে রইলেন, এক কাপ চাও খাওয়ানো হল না আপনাদের, ছি ছি, আমার এতটুকুও খেয়াল হয় নি।—তুইই বা কী রকম বিলয়? তুইও তো একটু খেয়াল করলে পারতিস্।

লজ্জা পাইয়া বিলয় চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চমী একটু হাসিয়া বলিল, আবার কেন মিছি মিছি ওসবের ব্যবস্থা করতে গেলেন—চা খাবার আর আমাদের সে মেজাজ নেই এখন, ভাল লাগচে না। যাক্, কাল তাহলে আমাদের ছুটি দিন আমরা চলে যাই। চলুন আমাদের সঙ্গে একবার কলকাতা চলুন দু'এক দিনের জন্য ঘুরে আসবেন, মনটা আপনার বড্ড খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারচি।

—না, না, তাই কী হয়? এখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া চলে না, বরং আপনারা resultটা announced হওয়া পর্যন্ত থেকে গেলে ভাল হয়।

সুধাদি' বলিলেন, আর থেকে লাভ কী বলুন? শুধু মন খারাপ করা ছাড়া আর কিছু নয়। হপ্তাখানেক পরে ত' আবার ঘুরে আসছি আমরা। আমাদের ত' আসতেই হবে। সুতরাং চলুন, আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরবেন।

মণিশঙ্কর হাসিয়া বলিল, আমি ওনাদের সামনের সপ্তাহে এখানে আসতে invite করলাম।

বন্ধু বলিল, তাহলে আমার এখানেও নেমতন্ন রইল। আসতে হবে কিন্তু।

পঞ্চমী হাসিয়া বলিল, তা' বেশ ভালই হল; কিন্তু কী মন নিয়ে যে আসবো তাই ভেবে পাচ্ছি না। সত্যি, আপনার জন্যে ভারী কষ্ট হয় বন্ধুবাবু। নিজেও দুঃখ পেলেন আমাদের মনেও দুঃখ দিলেন। তবে একটা কথা, আবার আপনাকে আমি দাঁড় করাবই। আপনাকে জিততেই হবে।

সুধাদি' হাসিয়া বলিলেন, না দাঁড়ান'র প্রশ্নই ওঠে না—চারটে বছর দেখতে দেখতে বেরিয়ে যাবে—আমরা ইলেকসনের এক বছর আগে থেকেই এখানে এসে কাজ সুরু করে দোবো, আপনি কিছু ভাববেন না বন্ধুবাবু।—আচ্ছা উঠি তাহলে এখন।

বন্ধু হাসিমুখে বলিল, না না উঠবেন কী? বসুন। এই যে চা এসে গেছে; একি? খালি চা নিয়ে এলি কেন, বিলয়?

—না না খালি চা নয়, গরম নিমকি এনেছি, মিষ্টিও এনেছি।

—ভাল করেচিস্।—এই নিন্ আসুন মিস্ গাঙ্গুলী বলিয়া বন্ধু এক কাপ চা নিজের হাতে করিয়া লইয়া পঞ্চমীর হাতের কাছে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, আসুন, নিন। মন খারাপ করবেন না। পঞ্চমী হসিয়া বলিল, তা হয় না বন্ধুবাবু আগে আপনি খান তারপর আমরা নোবো।—নিন্ নিন্ ধরুন—আঃ এতে লজ্জা করবেন না। বন্ধু বলিল—না না, আপনারা আগে নিন্।

পঞ্চমী বলিল, আপনাকে আগে খাইয়ে তবে আমরা খাবো। হাজার হলেও আমরা মেয়েমানুষ।

বন্ধু আর এ উপরোধ এড়াইতে পারিল না। পঞ্চমীর হাত হইতে চা'য়ের কাপটা দুই হাতে ধরিয়া লইয়া মনে মনে বলিয়া উঠিল, হে বিধাতা, তুমি যে কেন এত নিষ্ঠুর বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না—আজ মনে হইতেছে যেন তোমাকেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা উচিত—তোমার কী এতটুকুও হৃদয় নাই, এতটুকুও চোখ নাই? কেন যে তুমি কুসুমে কীট ভরিয়া রাখিয়াছ, কেনই যে তুমি পাষাণের বুকে নদীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, কেনই যে তুমি পয়োধি গর্ভে অমূল্য রত্নরাজি লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা আজও পর্যন্ত জানিতে দিলে না; শুধু এইটুকুই শিখাইয়া দিয়াছ, কুসুমে কীট থাকিলেও তাহাকে ভালবাসিয়া যাইবে—জীবনে এত বড় মাধুর্য আর কিছুতে নাই—ভালবাসা, সত্যই অমরলোকের বস্তু। ভাবিতে ভাবিতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

সুধাদি সেটা লক্ষ্য করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, কী আশ্চর্য, যা' হবার তা'ত' হয়েই গেছে, আর আপসোস করে কী হবে ?

পঞ্চমী একটু হাসিয়া বলিল, সাত দিন বাদে ঘুরে আসি, আপনার সব আপসোস মিটে যাবে বন্ধুবাবু। এখন চা-টা খেতে আরম্ভ করুন, আমরাও খাই। বলিয়া পঞ্চমী একখানা গরম নিমকি গালে পুরিয়া লইয়া কুড়মুড় করিয়া চিবাইতে আরম্ভ করিল।

সুধাদিও একখানা নিমকি হাতে লইয়া বন্ধুর হাস্যোদ্দীপ্ত মুখপানে একটিবার তাকাইয়া মণিশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কী বলেন মণিবাবু; পৃথিবীতে যারা ভুলতে পারে না তাদের মতো দুর্বল আর নেই। মণিশঙ্কর একটু হাসিয়া বলিল, খুব খাঁটি কথা বলচেন মিস দাস।—কিন্তু ও তো গোড়াতেই ভুল করেচে কিনা—যাক্‌গে। চলুন আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুধাদি বলিলেন, আর এই একটা রাত তো, বলিয়া চা সিপ্‌ করিতে লাগিলেন।

ত্রিশ

কয়েক দিন পরের কথা। নির্বাচনের ফল বাহির হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সাত হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতিয়াছে; স্বতন্ত্রপ্রার্থীর টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আজ কেরামতের বাড়ী বিরাট এক ভোজ লাগিয়াছে। একটা কবিগানের আসরও বসিয়াছে। আহারান্তে ভুবনবাবু ও পণ্ডিত-মশাই গানের আসরে গিয়া কিছুক্ষণ বসিলেন। ইতিমধ্যে দুই কবিয়ালে জোর লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে, আসর বেশ জমিয়াও উঠিয়াছে—জমিবেই ত'! কেননা, একদিকে বিখ্যাত কবিয়াল জসিমুদ্দিন, আর একদিকে ভৈরব। তা'ছাড়া গানের বিষয় বস্তুটাও অভিনব—গান্ধীবাদ আর উগ্রবাদ। জসি-মুদ্দিনের মৌলিক রচনা—শুনিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইল। ভুবনবাবু ও পণ্ডিতমশাই উভয়ে তাহার কবি-প্রতিভার ভূয়সী প্রশস্তি করিয়া তাহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এদিকে রাত ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়, অথচ আসর একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু ভুবনবাবু আর অধিক সময় অতিবাহন করিতে

পারিলেন না, শক্তিপদকে সঙ্গে লইয়া তিনি আসর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতমশাই আরও কিছু সময় থাকিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনিও উঠি উঠি করিয়া আসনে বসিয়া বার বার উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিলেন, শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গা লণ্ঠনটা হাতে লইয়া কলি, পুষ্কর, রামী, রামহরি ও ভজহরিকে সঙ্গে করিয়া তিনিও আসর ত্যাগ করিলেন।

মরা কোপাই-এর একূলে ওকূলে রাত্রির অতন্দ্র অন্ধকার ক্রমশই যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। একূলের অদূরে একটা বিস্তীর্ণ বৃক্ষবিরল প্রান্তর; প্রান্তরটা অতিক্রম করিয়া গিয়া ছোটো একটা আম-তেঁতুলের ঘন সন্নিবিষ্ট কুঞ্জবন আর মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপ ঝাড়; সেই বনরেখার পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ। সেই পথটা ধরিয়াই সকলে তাহারা হাঁটিয়া চলিয়াছে। পুষ্কর কলির পাশাপাশি হইয়াই চলিতেছে—তাহার যে বড় সাপের ভয়। গা'টাও ছম্ ছম্ করিতেছে, কিন্তু লজ্জায় কলিকে সে-কথা সে বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। কলি তাহার দেহের আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী, ভয় করচে, নাকি ? ও রকম করে হাঁটছ কেন ?

—আমার বড্ড সাপের ভয়।

কলি ধপ্ করিয়া পুষ্করের মুখের উপর আলগার উপর একটা থাবা মারিয়া বলিয়া উঠিল, ছি, রাত্তিরে ও নামটা করতে নেই, যত সব অলুক্ষুণে কথা।
—কেন, করলে কী হয় ? তোমার যত বাজে কথা। ধর, আমায় যদি এখন সাপে কামড়ায় তাহলে তুমি কী করবে তখন ? কলি একটু হাসিয়া আবার তাহার মুখের উপর একটা থাবা মারিয়া তাহাকে দেহের সঙ্গে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, বালাই তোমায় কেন কামড়াবে, আমায় কামড়াক্। চল, মুখটি বুজে, ধীরে ধীরে হেঁটে চল তো দেখি এখন। দুষ্টুমি ক'রো না। বলিয়াই হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। পাশেই একটা গভীর ঝোপ; সেই ঝোপটার ভিতর হইতে হঠাৎ খস্ খস্ মস্ মস্ শব্দ ভাসিয়া উঠিল। একটু কাল সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া, যে যেখানে ছিল সেই জায়গাতেই ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কলি আড়ষ্ট কণ্ঠে পুষ্করকে ডাকিয়া বলিল, টর্চটা একবার তোমার ডান দিকে ঘোরাও তো—একটা বড় খলিস্ (গোখুরা) বোধ হয়। একটু আমার বাঁ পাশে এসো।

পুষ্কর একটু সরিয়া গিয়া টর্চটা ঘোরাইতে না ঘোরাইতেই গুড়ুম্ গুড়ুম্

গুড়ুম্ করিয়া স্তব্ধ বনানীর হৃৎপিণ্ড মন্থন করিয়া পর পর তিনটা বিরাট শব্দ উত্থিত হইল; প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পুষ্করেরই বুকে গিয়া বিঁধিল—পঞ্চমীর কাঁচা হাত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি দুইটার মধ্যে একটাতে বিদ্ধ হইল সজল, অপরটা শুধু হাওয়াতেই মিশাইয়া গেল,—বিলয়ও ভুল করিল।

সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া সকলে একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; পণ্ডিত-মশাই ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে অনেক দূর হইতে ছুটিয়া আসিলেন; একে জঙ্গলের অন্ধকার তাহার উপর তিনি কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চোখেও অন্ধকার দেখিতেছেন। প্রথমটা তিনি কে কোথায় আছে ঠাহর করিতে পারিলেন না অথচ কলি ও রামী উভয়ের কান্নার শব্দ শুনিতেছেন। টর্চটা তাহার সম্মুখেই পড়িয়া আছে কিন্তু সেটাকে হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া জ্বালাইতে পারিতেছে না—বিহ্বলতায় সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, দাঁতে দাঁত লাগিয়া আসিতেছে। ক্ষণকালের জন্য তিনি একটা ছোটো ঋজুকায় আমগাছ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর, নিচু হইয়া টর্চটা তুলিয়া লইয়া কম্পমান অঙ্গুলি দিয়া কোনো রকমে বোতামটি টিপিয়া, তার উজ্জ্বল আলোকে যে করুণ ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তার শরীরের রক্ত হিম হইয়া উঠিল,—পুষ্করের রক্তাপ্লুত বক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কলির সে কী করুণ ক্রন্দন; সজলকে জড়াইয়া লইয়া রামীর সে কী ব্যাকুলিত আর্তনাদ! পণ্ডিতমশাই একেবারে স্তম্ভিত! ভাঙ্গাগলায় রামহরিকে ডাকিয়া বলিলেন, শীগ্‌গির একবার কেরামতের বাড়ী চলে যা' রেমো, আমার শরীর কাঁপছে, বলিতে বলিতে তিনি সংবিত হারাইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

একত্রিশ

পরের দিন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ লোক মুখে মুখে আশপাশের সমস্ত গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। খবরটা দুই দলেরই লোকের মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতে লাগিল এবং সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনেক আসামীই একসঙ্গে ধরা পড়িল।

পঞ্চমী, সুধাদি', বঙ্কু, মণিশঙ্কর, বিলয় সকলেই ধরা পড়িল। মিসেস্

গাঙ্গুলী ও প্রদীপবাবু তাহারা একদিন পরে ধরা পড়িলেন এবং তাহাদের লইয়া পুলিসের খুব ব্যাপক একটা অনুসন্ধানও চলিল, যদিও শেষ পর্যন্ত মিসেস গাঙ্গুলী অব্যাহতি পাইলেন।

এদিকে পুলিশ আসিয়া যখন কৃষ্ণকলিকে এজাহার দিবার জন্য অনুরোধ করিল তখন সে একরকম কোনও কথাই বলিল না, শুধু একটা কথা বলিতে গিয়া রুদ্ধ বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিল। ভুবনবাবু বলিলেন, তোমার ষ্টেটমেন্টের ওপর এই মামলার অনেক কিছু জিনিস নির্ভর করচে মা, তুমি কিছু ঘটনা অন্তত বল। কলি তবুও নীরব রহিল। ভৈরব নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সে উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, সর্বনাশ কর না দিদিভাই, সর্বনাশ কর না, সব কিছু বলে ফেল, শালাদের ধরে ধরে ফাঁসি দিতে হবে। বলিয়া সে অযাচিত ভাবে অনেক কিছু কথা বলিতে বলিতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। কেরামত সজল নয়নে কলির মুখের দিকে তাকাইয়া একটু ব্যবধানে দাঁড়াইয়া ছিল। সেও আর ধৈর্য ধরিতে পারিল না, অকস্মাৎ একটা অগ্নেয়াস্ত্রের মতো বিস্ফোরিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি ? ভাবছিস কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? ওরে বলে দে, বলে দে খুকী! সব কিছু বলে দে। আর ওদের ওপর মায়া করিস কেন! তাহলে আমাদের সকলের যে বিপদ হবে। উঃ! পাষণ্ড! বেইমান! শালা মণি তোকে ফাঁসি দোবো! বিচার চাই, বিচার চাই বড়বাবু, বিচার চাই, দেখো পয়সার জোরে যেন দুই একটা বেরিয়ে না যায়। বলিতে বলিতে সে বিকৃত মুখভঙ্গিতে দারোগাবাবুর মুখের উপর একটা বিহ্বল দৃষ্টি ফেলিয়া কঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইহাদের এইরূপ প্রকাশ্য উক্তিতে দারোগাবাবুর কৌতূহল ধীরে ধীরে বেশ প্রবল হইয়া উঠিল এবং সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন; অবশ্য তিনি ইহাও মনে মনে বুঝিলেন যে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এত বড় একটা লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিকট হইতে রাজপক্ষে মামলা বিষয়ে খুব বিশেষ একটা সাহায্য লাভ করা খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার ; তবুও তাঁহার কর্তব্য তিনি করিয়া গেলেন, ভুবনবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক, অবশ্য কিছুটা যদিও আমি আন্দাজ করতে পারচি এদের দুজনের কথা থেকে! কিন্তু তবুও উনি নিজে কিছু না বল্‌লে আমাদের

পক্ষে কেশটা খাড়া করা একটু শক্ত হচ্ছে।

ভুবনবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, তা ত' বটেই; বুঝতে পারচি সবই। কিন্তু মেয়েটির মনের অবস্থা এখন যে রকম এতে করে জোর করে কোনো রকম ষ্টেটমেণ্ট নিতে যাওয়া সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

দারোগাবাবু বলিলেন, হ্যাঁ তা তো বুঝতেই পারচি, বলিয়া অত্যন্ত নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, শুনুন, একটু বাইরে আসুন, খুব private কথা আছে বলিয়া ভুবনবাবুকে একটু নিরালা জায়গায় লইয়া গিয়া চুপি চুপি একটু বিনয় করিয়া বলিলেন, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আমি বলবো, অবশ্য I may be wrong, আমার সন্দেহ হচ্ছে, of course with apology—আমি বলচি, ব্যাপারটা কিন্তু যতদূর শুনে, দেখে, মনে হচ্ছে একটু রহস্যজনক।

ভুবনবাবু দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তার মানে?

—মনে হচ্ছে, এটা একটা political murder নয়।

ভুবনবাবু অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ, তাই তিনি বেশী কিছু কথা না বলিয়া শুধু এই কথাই বলিলেন, আগে investigation complete করুন, তারপর অন্য কথা। বলিয়া তিনি পুনরায় কলির কাছে আসিয়া বলিলেন, দারোগাবাবু তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইচেন মা, যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার। কলি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার এ বিষয়ে কিছু বলবার নেই কাকাবাবু। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে চাই না। গান্ধীজীর ও যীশুর বাণীই আমি মনে মনে স্মরণ করি। মানুষের পাপকে খণ্ডাতে হবে অনুতাপের ভেতোর দিয়ে! ক্ষমা! শুধু ক্ষমা দিয়ে, শুধু ভালবাসা দিয়ে মানুষের পাপকে, অন্যায়কে ভুলতে হবে। বিচারের ভার বিধাতার ওপর।··· যে গেছে সে তো চিরকালের মতোই গেছে; প্রতিশোধ নিষ্প্রয়োজন। কোপাই নদীর মেয়ে আমি। এর দুই কূলের প্রতিটি ধূলিকণা আমার স্বর্গলোক, আমার জীবনের কর্মক্ষেত্র। তাই, যে কাজের ভার আমি নিয়েছি এখন থেকে শুধু তাই নিয়েই থাকবো। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

দারোগাবাবু ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া তখনকার মতো সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিপিন শক্ত লোক ; তবুও তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল ; ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভুবনবাবুকে কাছে ডাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, এদের সকলকে ক্ষমা ক'রে দাও বড়বাবু। হিংসার দ্বারা হিংসা মেটে না। সবই তাঁরই ইচ্ছা ; বিচারের ভার তাঁরই ওপর দিয়ে দাও বড়বাবু। বলিতে বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজ ভুবনবাবুও গভীর ভাবে বিচলিত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার দুই চক্ষু বাষ্পকুল হইয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, আমরা ক্ষমা করলেও আইন তো তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না বিপিন। সেখানে আমাদের কিছু করবার নেই। বহিতে বলিতে মুখে রুমাল চাপা দিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শক্তিপদও কাঁদিয়া ফেলিল।

মামলা সুরু হইয়া গেল। কিন্তু রাজপক্ষে সাক্ষী পাওয়া খুবই কঠিন হইয়া উঠিল, কেননা ফৌজদারী মামলায় সহজে কেহই বড় একটা সাক্ষী দিতে চাহে না, সুতরাং সরকার পক্ষ বেশ মুস্কিলেই পড়িল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রাজপক্ষের আইনজীবিগণ আসামীদের মধ্য হইতে একজন approver খাড়া করাইবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত জুটিয়াও গেল একজন —মণিশঙ্কর আত্মসমর্পণ করিল! তাহার সহায়তা পাইয়া সরকার পক্ষ মামলাটাকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া তুলিল। কিন্তু এদিকে যে আবার আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়া গেল, পঞ্চমীর মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল।

অবশ্য মামলা সুরু হইবার কিছুদিন পূর্ব হইতেই পঞ্চমীর মুখের হাব-ভাবে এবং কথাবার্তায় একটা এলোমেলো ও অসংযত ভাব লক্ষ্য করিয়া রাজপক্ষের অনুসন্ধায়িগণ একটা ভবিষদ্বাণীও করিয়াছিলেন। সত্যই তাহারা ভুল করে নাই ; কেননা ঘটনার পরের দিন রাত্রি হইতেই পঞ্চমী ঐ হত্যাকাণ্ডের কথা বার বার ভাবিতে ভাবিতে কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল, দুঃখে, অনুশোচনায়, ঘৃণায়, হিংসায়, নিজের উপর তাহার একটা ধিক্কার আসিয়া গিয়াছিল। বার বার তাহার মনের মধ্যে শুধু একটা কথাই জাগিয়া উঠিতেছিল, হায় রে, সে এত বড় একটা ভুল করিয়া ফেলিল,—যাহাকে সে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল সে তো মরে নাই, সে যে আজও বাঁচিয়া আছে। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন তাহার মানসিক বিকৃতি দেখা দিল। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিল।

সুতরাং তাহার মামলা ওখানেই শেষ হইয়া গেল। অবশ্য আইন তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না। বিচারে তার প্রতি দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু উন্মাদ আসামীর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা; তাই সরকারের ব্যয়ে তাহাকে উন্মাদ-আরোগ্য-নিকেতনে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য পাঠান হইল। বিলয় নিজের হাতে খুন করিয়াছিল বলিয়া—যদিও সম্পূর্ণ ভাবে ভুলক্রমে—তাহার প্রতিও দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। এদিকে সুধাদি' ভাবিয়াছিলেন—প্রদীপবাবুকে পথে বসাইয়া—তিনি বুঝি শুধু টাকা ও তদ্বিরের জোরে নিষ্কৃতি পাইবেন, কিন্তু টাকা তো কথা বলিল না! সুতরাং দুষ্কৃতকারীকে সহায়তা করিবার অপরাধে (কেননা, পঞ্চমীকে প্রদীপবাবু মারফৎই সে পিস্তল যোগাড় করিয়া দিয়াছিল) অর্থাৎ abetmentএর অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাভোগের আদেশ হইল। প্রদীপবাবুও একই ধরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সুধাদির মতোই লঘু দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কেবল মণিশঙ্কর বাঁচিয়া গেল; অথচ সেই তো প্রধান ষড়যন্ত্রকারী! বঙ্কুর কোনোও অপরাধ নাই অথচ শুধু মণিশঙ্করের মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে বিচারক তাহাকে ষড়যন্ত্রকারীর নামমাত্র সহায়ক গণ্য করিয়া তাহার প্রতি দুই বৎসরের লঘু দণ্ডের আদেশ বহাল করিলেন।

আজ কোপাই নদীকে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, কোপাই! তোমার এই আবাল্য-পরিচিতা তোমারই কূলে কূলে লালিতা পালিতা কন্যাটির জন্য, কণ্বমুনিকন্যাবিরহবিধুরা তপোবনের ন্যায় তুমিও কী দু' ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিবে না? সে যে তোমারি দুহিতা!